রূপের হাটে বিকিকিনি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী . কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৮

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীশ্যামল কান্তি বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক
রমা প্রিণ্টার্স, ৬৩এ হরি ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পরিমল গোস্বামী

পরমপূজনীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

রূপের হাটে বিকিকিনি

দুটি প্রতীক্ষার কারণে

লিডার বটে পিন্টিদা

পিন্টিদার গপ্পো

অপরিচিতের মুখ

খনির নতুন মণি

সিকেপিকেটিকে

আরো একজন

মেঘের মিনার

নিষিদ্ধ বই

হীরামঞ্জিল

বাসকশয়ন

পুরুষোত্তম

আনন্দরূপ

দিনকাল

[illegible]

উপন্যাসে এ-যাবত কোনো ভূমিকা লেখার প্রয়োজন হয়নি। এও ভূমিকা না বলে কৈফিয়তই বলা যেতে পারে। আমার 'অগ্নিমিতা' উপন্যাসখানি পাঠকের স্মরণে আছে কিনা জানি না। উপন্যাসখানি আমার প্রিয় গ্রন্থের একটি, নানা কারণে দীর্ঘদিন এটি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রকাশক শ্রীমান সুধাংশুর আগ্রহে ওই উপন্যাসটিই নতুন নামে এবং নতুন কলেবরে উপস্থিত। 'অগ্নিমিতা'র প্রকাশ নিয়ে অনেক দিনের অনেক অহেতুক দুর্যোগ, অপগত সেই কারণেই এই নাম পরিবর্তনের দুর্বলতা।

[illegible]

সতীনাশার থান।

যেখানে আলো সেইখানে ছায়া। আলো বিনা ছায়া নেই, ছায়া বিনা আলো নেই। পুণ্যস্থানের আলোক-ধাঁধার গভীরে ডুব দাও, ছায়া খোঁজ। পাবে। পুণ্যের প্রবাহ যত জোরালো, ছায়ার ধারাটি ততখানি প্রবল দেখবে। সমুদ্র-মন্থনে আগে অমৃত পরে বিষ উঠেছিল। কিন্তু আগে বিষ পরে অমৃত ওঠার নজির নেই কী? ছায়া থেকে আলোয় যাত্রার নজির নেই?

অনেক আছে।

কুরুক্ষেত্রে এখন আর রক্তের গন্ধ পাবে না, ধর্মের গন্ধ পাবে। অশোক-বনে রাবণের পঙ্কিল প্রমোদলীলার স্রোত নিশ্চিহ্ন। তার ওপর সীতার আসন বিছানো দেখবে। গৌতম-আশ্রমে ইন্দ্রিয়াসক্ত বাসবের ক্ষণ-সহচরী ঋষি-পত্নীর কলঙ্কের দাগ মুছে গেছে। সেখানে শুধু শুচিশুভ্র পাষাণী অহল্যার সহস্র বছরের তপোনিঃশ্বাস কানের ভিতর দিয়ে বুকে এসে লাগবে। ছায়ার উৎস ধরে আলোয় পৌঁছানোর অনেক নজির আছে এমন। তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্ধকার থেকে আমায় আলোয় নিয়ে যাও। আলো থেকে আলোয় নয়।

সতীনাশার থানও স্থান মাহাত্ম্য পেয়েছে।

এই স্থান মাহাত্ম্যের কথা কে কবে কখন প্রথম রটনা করেছিল কালের পলেস্তারা সরিয়ে তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয় আর। মাহাত্ম্যটাই স্থানীয় লোকের মনের তলায় কিংবদন্তী হয়ে আছে বংশ বংশ ধরে। শুধু স্থানীয় লোক কেন, আশপাশের গ্রাম শহর গঞ্জের লোকেরাও এই থান-প্রসঙ্গে আধা ভয় আধা আবেগ মেশানো এক ধরনের বিশ্বাস লালন করে আসছে।

কালের ঘায়ে এখানকার সেই সমৃদ্ধির আস্ত কঙ্কালটাও ঠাওর করা শক্ত এখন। তার অনেক নিশ্চিহ্ন, আর অনেক ভেঙে-চুরে কঙ্কালের হাড়ের মতোই ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। সেই হাড় কুড়িয়ে পুরাতত্ত্ববিদরা সমৃদ্ধির রূপটা দেখতে চেষ্টা করছে এখন।

এখানে এলে দুই একজন অতিবৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। নতুন কালের গাছে তারা পতনোন্মুখ শুকনো পাতার মতো ঝুলছে এখনো।

ওই পোড়া কুঁড়েগুলো অমন ঘেরাও করে রাখা হয়েছে কেন গো? ওখানে অত ফুলই বা কেন? ও কোন্ জায়গা?

থানের নিগ্রহ কোপের ভয়ে মনে মনে প্রণাম সেরে বুড়ো জবাব দেবে, জায়গা নয় গো বাবুমশায়রা, উটি থান—সতীনাশার থান।

কথা বলার রসদ জোগাতে পারলে ওই থানের গল্প সে-ই বলবে। ওই বয়সী যে-ক'টি বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হবে, সবাই উনিশ-বিশ সেই একই কাহিনী পুষছে বুকের মধ্যে। কিন্তু শহুরে তৎপরতার যুগে দুধের থেকে ক্ষীরটুকু শুধু পান করার রীতি। কাহিনী শোনার অত ধৈর্য না থাকাই স্বাভাবিক।

গল্প থাক, গল্প তো আছেই—ওটি যে থান তা বুঝলে কেমন করে, ওটি থান হল কেমন করে?

অর্থাৎ গল্পের শেষটা বলো শুধু, থান মাহাত্ম্যের বিশ্বাসটা তোমাদের মনে এলো কেমন করে তাই বলো।

কাল-জরায় জবুথবু বুড়ো সংক্ষিপ্তসার মানে না, রিপোর্টিং জানে না। তোমাদের শহুরে তাড়ায় তার হকচকিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ফলে আবোলতাবোল উক্তি শুনতে হবে কিছু। কিন্তু তারই মধ্যে দুই একটা কথা কানের ভিতর দিয়ে বুকের মধ্যে চমক লাগাবে। কান খাড়া হবে তোমাদের। চমকই তো চাইছ।

—থানের কথা আবার বলে দেবে কে গো বাবুমশায়রা, থানের কথা থানের বাতাসে ফেরে। থানের অধিষ্ঠাত্রী থানের মর্ম বুঝিয়ে দেন—

অধিষ্ঠাতা নয়, অধিষ্ঠাত্রী। অধিষ্ঠাত্রীটি কে?

নাম ধরতে আছে কী? পোড়া বটের ফাঁকেও তো সন্ধ্যার ছায়া নামেনি এখনো। দিনমানে নাম নিতে দোষ নেই। নির্ভয়ে নাম নিলে পুণ্যি হয় বরং। সেই অধিষ্ঠাত্রীর নামও একটা ছিল বইকি। মেয়ের নাম। সেই নাম স্বাহা গো বাবুমশায়রা, স্বাহা!

স্বাহা! স্বাহা তো আগুন, অগ্নির সহচরী!

আগুনের মিতা স্বাহা। স্বাহা বিনা আগুনের দাহিকা শক্তি নেই। সপ্ত-ঋষি মিলে একবার অগ্নিযজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু অগ্নি-ঠাকুর যজ্ঞ গ্রহণ করবেন কি, সাত সাতটি ঋষিপত্নী দেখে নিজেই তখন বাসনার আগুনে চনমনিয়ে জ্বলছেন। দিব্যাঙ্গনা ঋষি-পত্নীরা হাতের মোয়া নন, কাজেই মনের দুঃখে বনে গমন করতে হয়েছিল কামার্ত অগ্নি-ঠাকুরকে। স্বাহা তখন ছয়বার ছয়-ঋষিপত্নীর রূপ ধরে অগ্নিদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

মনের আনন্দে অগ্নি-ঠাকুর ছয়বার ছয় ঋষি-পত্নীরূপিণী স্বাহার সঙ্গে বিহারে মগ্ন।

কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে গেল সাতবারের বার। বশিষ্ঠের দামিনী-বরণী অরুন্ধতীর তপঃপ্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপটি ধারণ করে উঠতে পারেননি। না পারার ফলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কারণ অন্য ঋষিরা নিজের নিজের পত্নীদের সন্দেহ করেছিলেন। আসল ব্যাপার প্রকাশ হতে স্বাহার দাবী বোঝা গিয়েছিল। আগুনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকতে চান তিনি। স্কন্দদেবের বরে দাবী তাঁর মিটেছে। স্বাহা উচ্চারণ ভিন্ন অগ্নি কোন হোমীয় দ্রব্য গ্রহণে অপারক।

—এ সেই স্বাহা নয় গো বাবুমশায়রা, কিন্তু সেই রকমটি। ছয়বার ঋষি-পত্নীর মূর্তি দেখেও স্বয়ং অগ্নি-ঠাকুর চিনতে পারেননি স্বাহাকে। এই থানের স্বাহাও অনেকবার অনেক মূর্তি ধবেছিল, কেউ তাকে চেনেনি। যখন যেমন দেখেছে তখন তেমন ভেবেছে। কিন্তু আসলে এই স্বাহাও আগুনের মিতিন গো বাবুমশায়রা, অবিচ্ছেদ্য মিতিন—আগুনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছেন। শীতের শেষে এসো, মাঝ বসন্তে এসো, পোড়ো বটের ওধারে বনজোড়া পলাশের আগুন লাগা রঙে মানব-কন্তে স্বাহাকে দেখতে পাবে। দক্ষকন্যা স্বাহা নয়, পরাণ চাটুজ্জের আগুনপানা মেয়ে স্বাহা। সেই স্বাহা নয়, সেই রকমটি।

এবারে আর কাহিনীর গতি রোধ করা যাবে না। শুধু সার কথাটি শোনার জন্য বুড়োকে আর তাড়া দিতে মন সরবে না তোমাদের। এমনি করেই ওই থান ঘিরে একটা যুগের কথা পরিপুষ্ট হয়ে আছে। গোটা গ্রামটা তিলে তিলে বুড়িয়ে বুড়িয়ে শেষে চোখ বুজেছে। কিন্তু তারও আবার সৎকার হয়নি ভালো করে। এখানে সেখানে হাড়গোড় ছড়িয়ে থাকার মতো সাবেক দিনের কিছু কিছু জীর্ণ চিহ্ন চোখে পড়বে। তবে তাও বেশি দিন আর পড়বে না, প্রকৃতি তার নিয়মের নামাবলী ছড়িয়ে বসছে একটু একটু করে—নিশ্চিহ্নতার আস্তরণ পড়ছে। কিন্তু এরই মধ্যে ওই কাহিনীর ধারাটি মাটির নিচের ধারার মতো নতুন যুগের তলা দিয়ে শ্রুতির পথ ধরে তরতরিয়ে বইছে।

অসময়ে এলে গা ছম ছম করে, চোখে পীড়া দেয়। বাঁশ পাতায় ঘেরা এক সারি পোড়ো ঘর। ঘর বলা ভুল হল, ঘর একটাও নেই। খানিক দূরে দূরে ঘরের এক-একটা উঁচু পাকা ভিত। তার ওপর ঘর-পোড়া চাল, বাঁশ, আর থামের ধ্বংসাবশেষ। একটা নয়, প্রায় আট দশটা ঘর-পোড়া ভিত এমন। সামনের ভিতের পিছনেই মস্ত আধ-পোড়া বটগাছ একটা। গাছটা বসত-এলাকার মধ্যেই ছিল এককালে, এখন তার ঝুরি আর শিকড়-বাকড় গিয়ে মিশেছে পিছনের ওই বনের গাছ-গাছড়ার সঙ্গে। তাই

দেখেই যেন পলাশ আর শিরীষ গাছগুলোর মুখ ভার। কিন্তু বসন্তের সমাগমে তারা ওই বটের পরোয়া করে না একটুও। বসন্তে এই গোটা থানেরই রূপ আলাদা।

কিন্তু বসন্তের কথা থাক, বসন্ত ক'দিনেরই বা।

শিরীষ পলাশেব পরেই ঘন ফল-বন আর নিম-বন। আম জাম জামরুল কলা কামরাঙার জঙ্গল। গাছে ফল ধরে, সেই ফল বেশিরভাগই মাটিতে ঝরে। দুরন্ত ছেলেরা দল বেঁধে মাঝে-মধ্যে ফলের লোভে বনে হানা দেয় বটে, কিন্তু সামনের দিক দিয়ে ঢোকে না, পিছন দিয়ে আসে। দূর থেকে হাত-জোড় করে থানেব উদ্দেশে প্রণাম জানায়। অর্থাৎ, লোভে পড়ে এসেছি, অপরাধ নিওনা গো মা।

বেড়ার একধারে খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোট বাগানের মতো একটা। প্রথম ভিতটার বরাবর সেই বাগানের সামনেই একটা অশোক গাছ। কিন্তু অসময়ে এলে অমন যে পুণ্য বৃক্ষ অশোক, তাবও শোক থমথমে। আরো ছোট বড গাছ আছে বাগানে, মাধবীলতা চাঁপা জুঁই বেল ডালিম। অসময়ে তারাও বিরস। দিনের বেলাতেও তখন নেহাত দায়ে না ঠেকলে এই এলাকার ধারে কাছে কেউ আসে না। রাতের বেলায় অনেক দূরেব পথিকও নাকি জঙ্গলে শেয়াল বন-শূকরের দাঁতা-দাঁতি হানা-হানি শোনে, নিমপাখির নিম-নিম ডাক শোনে, হুতম পেঁচার হুমো-হুমি শোনে। কোনটাই শুভ নয়।

দূরে মরা সরস্বতীর চড়া। সেই চড়া ধরে অনেকটা গেলে শ্মশান। গোয়ালফেলানীব শ্মশান। বিপরীত দিকে অনেক দূরে গঙ্গার কাছাকাছি আব একটা শ্মশান আছে। কিন্তু এদিককার লোকেরা এই শ্মশানেই আসে। যেতে আসতে থানের উদ্দেশে কেউ হাত জুড়ে কেউ বা মনে মনে প্রণাম জানায়।

কিন্তু দায়ে ঠেকে শুধু প্রণাম জানাবার উদ্দেশেই দিন দুপুরে এখানে আসে কেউ কেউ। মেয়ে-পুরুষ দুই-ই। আরজি নিয়ে আসে। থানের ছাই কপালে মাথায় ঠেকিয়ে মনের বাসনাটি আউড়ে যায়। দয়িত দয়িতার মিলনের সকল বাধা সকল বিঘ্ন সকল মুশকিলের আসান এই থানের ছাই। বাধা বিঘ্ন ছাই হবে, দূর হবে। কিন্তু প্রত্যাশা কুটিল হলে কলুষ হলে ফল হবে না। ফল বরং বিপরীত হতে পারে তখন। যে স্ত্রী স্বামীর মন পেল না, কোন প্রাজ্ঞ বৃদ্ধার গোপন পরামর্শে বিশ্বস্ত জনকে সঙ্গে নিয়ে সে হয়ত চুপিচুপি এসে থানের ছাই মাথায় নিয়ে যায়। হতাশ তরুণ প্রেমিকেরা গোপনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। এ-রকম অনেক আসে। যথার্থই ফল কেউ পেয়েছে কি না তার নজির বা প্রমাণ হাতের নাগালের মধ্যে। অনেক প্রমাণ, অনেক নজির।

তার মধ্যে হাতের পাঁচ ছুটো গল্প তো স্থানীয় অধিবাসীদের যে কেউ গড়গড়িয়ে

বলে দেবে! শ্রোতা নতুন আগন্তুক হলে বহুবার বলা গল্পের মধ্যেও নতুন উত্তেজনার রসদ পায় তারা। নতুন রোমাঞ্চ দেখা দেয়। পুরুষেরা হারু জোয়ারদারের নজিরটাই অলৌকিক উপকরণে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জলজ্যান্ত করে তুলতে উদ্দীপনা বোধ করে বেশি। বিবৃতির কোথাও এতটুকু ছাড় হয়ে গেলে আর একজন তক্ষুণি শুধরে দেবে সেটা, স্মরণ করিয়ে দেবে। পুরনো আখ্যানে নতুন রঙ চড়লে আপত্তি নেই, কিন্তু ছাড় বরদাস্ত হবে না। থান মাহাত্ম্যের বচন ছাড় পড়লে পাপ।

—ওলাইচণ্ডীর 'আধ-কোশ' উত্তরে ব্রাহ্মণ-পাড়া ছাড়িয়ে জঙ্গলভরা সেই যে বেড়া-দেওয়া বসতির চিহ্ন—সেটাই তো হারু জোয়ারদারের বসতি। শহরে দালালি করে নতুন বড়লোক হয়েছিল ছোকরা। পাখনা গজিয়েছিল। বিলাসে গলা ডুবিয়ে দিয়েছিল। উঠতি বয়েস থেকেই স্বভাব-চরিত্তির মন্দ ছিল। কিন্তু মন্দ ঘরের পরে টান ছিল না ছোকরার। যেখানে পয়সা ছড়ালেই ফুর্তি মেলে সেখানে যেতে মন উঠত না। লোভ শুধু গেরস্ত ঘরের বউ ঝিয়ারীদের ওপর। কোথায় কোন্ মেয়ে বউ ভাই ভাশুর বা দেওরের গলগ্রহ সেই হদিস ছোকরার নখ-দর্পণে। সে-সব জায়গায় গিয়ে সে টোপ ফেলত, টাকা ছড়াত।

লোভের যম লোভ। এই লোভেই কাল হল।

ছোকরার নজর পাখা মেলে উঁচিয়ে উঠতে লাগল দিনকে দিন।

শহরের এক ডাকসাইটে বড়লোকের বাড়ির অন্দরে চোখ গেল। সেই থেকে আহার নিদ্রাও ঘুচে গেল। হারু জোয়ারদারের ইয়ার-বকশীরা পর্যন্ত সভয়ে সেই অন্দর থেকে মন ফেরাতে চেষ্টা করেছে তার। কিন্তু নিয়তির টান ঠেকায় কে?

সেই অন্দরে ছিল এক সোমত্ত বয়সের বাল-বিধবা। রূপ কেমন ছিল কেউ জানে না—এ গাঁয়ে স্বচক্ষে আর কে দেখেছে তাকে? তবে মেয়ে-ভুলানো হারু জোয়ারদারের নিজেরই ভীমরতি দেখে সেই রূপের জোয়ার কল্পনা করা কি আর কঠিন! কাজেই ওটা ধরেই নাও বাবু তোমরা। ভাই-ভাশুরের গলগ্রহ ছিল না সেই মেয়ে, বাপের ঘরে বাস করত। ধর্ম-কর্ম করত মেয়ে, পূজা-আর্চা না করে জল মুখে তুলত না।

হারু জোয়ারদার একবার তাকে দেখা অবধি হাতে প্রাণটি নিয়ে কতবার কত ছলে সেই বাড়িতে ঢুকেছে ঠিক নেই। দেখেও ছটফটিয়ে মরেছে না দেখেও ছটফটিয়ে মরেছে। শেষে প্রাণ যখন আর বাঁচে না, বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে এই সতীনাশার থানে এসেছিল সঙ্কল্প করে পুজো দিতে। পুজো দিয়েছিল। প্রত্যাশার কথা শুনিয়েছিল থানে এসে, সঙ্কল্প আউড়েছিল।

তারপর সাতটা দিনের মধ্যে সেই পাপ সঙ্কল্পের দণ্ড মিলেছে। এক সকালে দেখা

গেছে শ্বাস বন্ধ হয়ে নিজের ঘরে হারু জোয়ারদার মরে পড়ে আছে। আগের দিন বার-সন্ধ্যায় কেউ কেউ নাকি খিড়কি দিয়ে ঘোমটা-টানা বউ ঢুকতে দেখেছে ওই বাড়িতে। উনি থানের অধিষ্ঠাত্রী ছাড়া আর কে? আর কে হতে পারেন?

ওদিকে পাপ-দৃষ্টি অঙ্গে লেগেছে বলে সেই মেয়েটাও রেহাই পায়নি। তিন দিন না যেতে ওলাইচণ্ডী টেনে নিয়েছে তাকে।

থানের অধিষ্ঠাত্রীর কোপ যেমন করুণাও তেমনি। তাঁর করুণার প্রসঙ্গে দেবীপুরের সতীনাথ ঘোষালের বিবাহিতা সতী-কুলমণি রমণীটির আখ্যান এখানকার প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকদের মুখে জমে ভালো। ব্রত-কথা বলা বা শোনার মতো করে জাগ্রত অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে দু'হাত জুড়ে নবাগতা পড়শিনী বা আত্মীয়ার কাছে থান মাহাত্ম্যের গল্প করে তারা।—ঘোষালের মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে কেচ্ছার কথা পাঁচ গাঁয়ের বাতাসে ফিরত। কিন্তু তেমন সতীই এসেছিল ঘোষালের ঘরে। কেবল একটা ঝি সঙ্গে করে সতীলক্ষ্মী পাল্কীতে চেপে ভর-সন্ধ্যেবেলায় ওই সতীনাশার থানে এসে হাজির একদিন। পুজো দিয়ে দু'হাত জোড় করে বলেছিল, মিনসেটাকে আস্ত হোক, সিকিখানা করে হোক—আমার কাছে ফিরিয়ে দাও গো মা। না যদি দাও তোমার এই পোড়া দাওয়ায় এই পোড়া কপাল কুটে সব শেষ করে দিয়ে যাব।···এরপর ক'টা দিন আর? শরীরের একদিকে পক্ষাঘাত হয়ে বরাবরকার মতো ঘরের কোণে স্ত্রীর আঁচলের তলায় এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অমন জবরদস্ত লোকটাকে। শুধু কি এই, তারপর ওই ক'পুরুষ ধরে তো ওই ঘোষাল বংশে মেয়েদের রাজত্ব—পুরুষেরা সব ভেড়ার মতো শান্ত, ঠাণ্ডা।

এমন গল্প অনেক আছে। প্রমাণ বা নজিরের অভাব নেই। থান বা স্থান মাহাত্ম্য বুদ্ধি বস্তুটার বিচার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে না। বিশ্বাসের আসল উৎস অন্তস্তলের বিশ্বাস-প্রবণতা: সেই প্রবণতার অভাব সচরাচর দেখা যায় না।

তবু প্রমাণ চাই? নজির চাই?

সময়ে এসো, প্রমাণ মিলবে নজির চোখে পড়বে। অন্ধকারের মতো ওই ভুতুড়ে বনের রঙ বদলাবে যখন, তখন এসো। গাছের পাতায় পাতায় সবুজের বন্যা নামবে যখন, তখন এসে কান পেতে শুনো আর কারো আসার পায়ের শব্দ শুনতে পাও কি না। বিদায়ী পলাশের সঙ্গে ফিকে-সবুজ নতুন-শিরীষের কানাকানি হবে যখন, তখন এসে কান পেতে দাঁড়িও আর চোখ মেলে দেখো। ভরা বসন্তে নিমফল আর অশোকের গন্ধে ভরপুর বাতাস যখন নিজের ভারে মত্ত-মদির, তখন এসে ঘ্রাণ নিয়ে দেখো—আর কারো গায়ের গন্ধ পাও কি না। অতোয় কাজ কি, শুধু ওই অঙ্গনা-প্রিয় অশোক গাছটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়? বসন্ত-সখার পাঁচ-পাঁচটি ফুল-শরের

কোন্ ফুলটি অন্যতম? অশোক নয়? সেই অশোকের পুষ্পিত যৌবন আসে কখন? আসে কেমন করে? শাস্ত্র পড়নি? সৌষ্ঠবশালিনী দিব্যাঙ্গনা যুবতীর পায়ের স্পর্শ না পেলে অশোক ফোটে? স্থানের অধিষ্ঠাত্রীর শুভাগমন হয় বলেই ফোটে।

দূর থেকে ঘন বনের সামনে ফুল-ভরা টকটকে অশোক গাছটাকে দেখায় এক মাথা ঘন-চুল-ছাওয়া রমণী-ললাটের এক থোপা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের মতো।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে সেখানে আরো আসে কেউ।

কোথা থেকে আসে তারা একেবারে সঠিক করে বলতে পারবে না কেউ। এসে আলো জ্বেলে ফুল দিয়ে থানের ছাই মাথায় নিয়ে কোথায় আবার চলে যায়, সাধারণ জন-মানব তাও ভালো করে জানে না। তারা দল বেঁধে আসে। কাছ থেকে, দূর থেকে, অনেক দূর থেকেও নাকি। কোন দল রেলে, কোন দল নৌকায়। কেউ গরুর গাড়িতে, কেউ বা ঘোড়ার গাড়িতে।

স্থানীয় লোক যারা দূর থেকে দেখে, তারা এদের একটা পরিচয়ই জানে শুধু। জানেও না, শোনে।

তারা বারবনিতা।

দুই

জায়গার নাম চুনিগ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দারা বলে চুনি-গাঁ।

লক্ষ্য করে দেখলে নামের একটা তাৎপর্য চোখে পড়তে পারে। শহরের স্টেশন থেকেই গ্রামের পথ লাল খোয়া-বিছানো। খোয়া কাঁকর মাটি সবই টকটকে লাল। ভাঙা বাড়িগুলোর ছোট ইটগুলির পর্যন্ত সিঁদুরে রঙ। সেই লাল রাস্তা সোজা গেছে গ্রামের দিকে।

দু'ধারে বন-তুলসীর ঘন ঝোপ। ঝোপগুলির ওপরেও লালচে ধুলোর আস্তরণ। সবুজ মাঠের ঘাস তুললে দেখা যাবে তলায় লাল মাটি আর মটর-কড়াইয়ের মতো লাল কাঁকর। রাস্তার দু'পাশে খানিক দূরে দূরে অতিকায় এক-একটা জংলা বট। ওগুলো যেন স্তব্ধতার মন্ত্রে মূক, কালের প্রহরী এক-একটা। ওতেও সবুজের আভা গিয়ে লালচে ছোপ পড়েছে এক ধরনের। এলোমেলোভাবে বটের ঝুরি নেমেছে চারপাশে। কোটরে কোটরে পেঁচার আস্তানা।

গ্রামে ঢুকতে হলে প্রথমেই ঠ্যাঙাড়ে ঢিপি পেরুতে হবে। তখন রেলপথ ছিল না। এটাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র সদর রাস্তা। ওই ঢিপিটাও মস্ত একটা বটের নিচে। এই ঠ্যাঙাড়ে ঢিপির গল্প শুনতে বসলে এখনো গায়ে কাঁটা দেবে। গল্প শোনার পর এখানকার গুমোট গম্ভীর আবহাওয়ায় এসে দাঁড়ালে অতিরঞ্জনের সংশয় মনে জাগবে না। গা ছমছম করবে। অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ সেই ঠ্যাঙাড়েদের নৃশংসতার এমন সব গল্প ফেঁদে বসবে যা শুনলে মনে হবে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে তারা। হঠাৎ এক-একসময় সন্দেহ হবে, এদেরই কারো কারো বার্ধক্যজীর্ণ চামড়ার রেখায় রেখায় সেই নৃশংসতার কাহিনী লেখা আছে বুঝি।

ভরা পূর্ণিমার রাতেও বটের ছায়ায় ওই ঢিপিটা দুর্ভেদ্য অন্ধকারের স্তূপের মতো দেখায়। ঢিপিটার ওপর জ্ঞাতসারে এখনো কেউ গিয়ে দাঁড়ায় না। বিশ্বাস, ঢিপির লালমাটি নররক্তে লাল হয়ে আছে, আর ওটা খুঁড়লে এখনো অনেক করোটি-কঙ্কালের অবশিষ্ট বেরিয়ে আসবে।

তার কিছুদূরে আর একটা বটের নিচে ডাকাতে কালীর থান। ওখানে নাকি রক্তচক্ষু এক মহাকায় তান্ত্রিক শব-সাধনা করতেন। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে যোগসাধনা করতেন তিনি। জনশ্রুতি, অমাবস্যার রাতে ওখানে একাধিক নর-বলিও সম্পন্ন

হয়েছে। বলি সংগ্রহ করত ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা। তারা ডাকাতি করতে বেরুতো এই ডাকাতে কালীর থান স্পর্শ করে।

আরো কিছুদূর এগোলে গাঁয়ের চিহ্ন চোখে পড়বে। পথটা আরো সরু হয়ে গেছে। চারদিকে বুক সমান আটিশ্বরী গাছ আর বিষকাটারির ঘন জঙ্গলে বেশিদূর চোখ চলে না এখন। কোথাও বেশ বড়সড় বাঁশবন—তার নিচে স্যাঁতসেঁতে ছায়ায় বাঘ-ভেরেণ্ডা কুকসিমে ছাগবঁটির ছোট বড় গাছগুলো অবাধে বেড়ে চলেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ ভগ্নস্তূপের মতো সৌধ-কঙ্কাল চোখে পড়বে এক-একটা। এক কালে ওগুলো চকমিলানো দালান ছিল বোঝা যায়।

গাঁয়ের মাঝামাঝি বিশাল পুকুর একটা, বহুকালের পুরনো জলাশয়। নাম রাজদীঘি। এই রাজদীঘি নিয়েও অনেক গল্প আর অনেক কিংবদন্তী শাখায় প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে আছে। দীঘির জলের কাজল কালো রঙ এখনো। জোয়ান সাঁতারুরও দীঘির এমাথা-ওমাথা করতে কালঘাম ছোটে। হিন্দু যুগের কোন এক বিখ্যাত রাজা নাকি স্বপ্নাদেশে খনন করিয়েছিলেন এই দীঘি। কমলাদেবী পর পর ক'রাত পদার্পণ করেছিলেন নিদ্রিত রাজার ঘরে। ঘুমের মধ্যেই রাজা কথাবার্তা কইতেন তাঁর সঙ্গে। দেবীর কিছু আরজি ছিল। সেটাই তিনি জানাতে আসতেন রাজার কাছে। রাজা প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু সকাল হলেই আবার ভুলে যেতেন। রাতের স্বপ্ন দিনে মনে থাকত না। তবু দেবী আসেন, অনুযোগ করেন, অভিযোগ করেন।

একদিন ঘুমঘোরে রাজা দেখেন তৃষ্ণার্ত দেবী ফিরে যাচ্ছেন তাঁর প্রাসাদের সমুখ দিয়ে। রাজা বারবার আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন তাঁকে, মা গো আমি যে তোমার জন্যে জল নিয়ে বসে আছি।

কমলা ফিরে তাকালেন। রাজা সন্ত্রাসে দেখলেন তৃষ্ণার দাহনে দেবী-অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তাঁর সেই যাতনা রাজারও বক্ষে এসে স্পর্শ করছে। দেবী ইশারায় ডাকলেন রাজাকে, এসো। রাজা অনুসরণ করলেন। তারপর স্বয়ং দেবীই এখানে স্থান নির্দেশ করে দিলেন। বললেন, এইখানে। রাজা সেখানেই বসে পড়ে মাটি সরাতে লাগলেন, মাটি খুঁড়তে লাগলেন। যত খোঁড়েন ততো বিস্ময়। যত খোঁড়েন ততো সোনাদানা মোহর বেরোয়। ঘড়া ঘড়া মোহর, কিন্তু সেই সোনাদানা মোহর সব গলে গলে অমৃত হয়ে যাচ্ছে। আর কমলা হাসছেন। তাঁর তৃষ্ণা মিটেছে। এক পা দু'পা করে সেই অমৃত সরোবরের মধ্যে প্রবেশ করছেন তিনি।

পরদিন রাজার খোঁজে বেরিয়ে সভাসদজন অবাক। রাজা এখানকার সেই জলা-জংলার মধ্যে পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। কখন এসেছেন, কেমন করে এসেছেন,

কেউ জানে না। রাজা নাকি তারপর রাজসভার সব কাজ স্থগিত রেখে এই দীঘি খনন করিয়েছিলেন।

স্থানীয় লোকের বিশ্বাস দীঘির জলের নিচে ঘড়া ঘড়া মোহর আছে।

মুসলমান আক্রমণের সময় সেই রাজমহিষী ময়ুরপঙ্খী নাও সাজিয়ে এই জলে বিহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আদেশে শতচ্ছিদ্র করা ছিল সেই ময়ুরপঙ্খী নাও। মান রক্ষার জন্য রাজমহিষী নাওসুদ্ধ রাজদীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই দীঘির চারদিকে রাতের গভীরে কখনো-সখনো কচি ছেলের কান্না শোনা যায়। অনেক বুড়োবুড়ী বলে তারা শুনেছে। এখনো নাকি শোনা যায়। কদাচিৎ কখনো। কেউ কেউ বলে, দীঘিকে চিরকাল জলবতী করে রাখার জন্য এখানে শিশুতর্পণ করা হয়েছিল। সেই শিশু কাঁদে। কিন্তু আশপাশের বুড়োবুড়ীরা ঘাড় নাড়বে। তারা বলবে তা নয়। যে শিশু কাঁদে সে সেই শিশু নয়। সে আর একজন। ওই সতীনাশার থানেরই একজন। সে চাঁদের হাসি-ধোয়া দু'বছরের বাড়বাড়ন্ত শিশু একটি। সেই শিশু কাঁদে।

দীঘির পরে কৈবর্তদের নিবাস ছাড়িয়ে কাহারপাড়া পেরিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া। সেখানেও এক অতি প্রাচীন বটগাছের নিচে আছে একটা থান। ওলাইচণ্ডীর থান। কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যে থেকে তিন দিন মস্ত মেলা বসত এখানে। আশে-পাশের গ্রাম শহরের লোকেরা এই তিনটি দিন ভেঙে পড়ত এখানে। এই মেলায় অনেক কেনা বেচা হত। অনেক রঙ্গরস হত, অনেক স্ফূর্তির বান ডাকতো। বুড়ো-বুড়ীদের সেই মেলার কথা মনে হলে চোখে জল আসে এখনো। একটা বিলুপ্ত স্মৃতি বুকের মধ্যে মমতা দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে তারা।

ব্রাহ্মণপাড়ার শেষপ্রান্তে মজা সরস্বতী। মজাও বলা যায় না এখন। নদীর একটা শুকনো হদিস মেলে শুধু। কেউ ভাবতেও পারবে না এই সরস্বতীর বুকের ওপর দিয়ে বড় বড় বাণিজ্যতরী দেশ বিদেশ চষে এসেছে। মরা সরস্বতীর চড়া ছেড়ে কিছুটা ভিতর দিকে এগোলে সতীনাশার থান। তখন থান ছিল না এটা, অতগুলো ভিটেও ছিল না। চারদিকের ফাঁকার মধ্যে একটা ঘর ছিল মাত্র।

সবাই বলত পরাণ চাটুজ্জের ডেরা।

গোপনে বলত গেঁজেল চাটুজ্জের কুঁড়ে। চাটুজ্জেকে সমীহ করত সকলে, ভয় করত। উঁচু-নিচু ধনী-দরিদ্র সকলেই। কারণ পরাণ চাটুজ্জের সম্বন্ধে অনেক গুজব ছিল গাঁয়ে। তার গাঁজা খাওয়ার গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরত। নিরাপদ

গোপনে কেউ কেউ রসিকতাও করত, শিবের দুয়ারে নন্দী ভৃঙ্গীর একজন ছিল নিশ্চয় পরাণ চাটুজ্জে, শাপভ্রষ্ট হয়ে ধরায় এসেছে।

কিন্তু আসল ভয়ের হেতু বোধহয় লোকটার এই নির্জন বাস। গ্রামবাসীরা সন্দেহ করত পরাণ চাটুজ্জে নিজেই মস্ত একটা ঠ্যাঙাড়ে দলের সর্দার। কেউ বলত, তা নয়, অমাবস্যার গহন আঁধারে গোয়ালফেলানীর শ্মশানে বিচরণ করে পরাণ চাটুজ্জে। কোন শবদেহ পেলে তার ওপর চেপে বসে গাঁজা খায়। এই জন্যই লোকটার অত দুরন্ত সাহস।

যেমন রোগা তেমনি ঢ্যাঙা ছিল পরাণ চাটুজ্জে। তার মূর্তিটি এখনো মুখে মুখে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে গাঁয়ের বুড়োরা। পাকানো পাকানো চেহারা, টকটকে ফর্সা ছিল গায়ের রঙ, শেষের দিকে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। তেমনি নাক মুখ চোখ। গাঁজার ধোঁয়ায় চোখ দুটো করমচার মতো টকটকে লাল দেখাত সব সময়। চোখের শিরা পর্যন্ত আলগা রক্ত-রেখার মতো দেখাত।

যে সময়ের কাহিনী, সে-সময় সরস্বতীর যৌবন-তরঙ্গে টান ধরেছে। চুনিগাঁয়ের সমৃদ্ধির চুনি-আভা গেছে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, খুব বেশি প্রাচীন কথা নয়। খুঁজলে সেদিনের দু'পাঁচজন শিশু বা বালককে এখনো বার্ধক্যের জরা সরিয়ে টেনে তোলা চলে। কায়েমী ইংরেজ শাসন সেটা। পারিপার্শ্বিক ফরাসী শাসনের হামলাও মাঝে-সাজে সামলাতে হয়। গঙ্গার ধার দিয়ে রেলপথ বসে গেছে। যানবাহন বেড়েছে, লোক চলাচল বেড়েছে, ফলে লোকের নিরাপত্তা বোধও বেড়েছে কিছু। ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রব কিছুটা কমেছে। ইংরেজের নুন খাওয়া দারোগা-পুলিসের একচ্ছত্র প্রতিপত্তির যুগ সেটা। জীবনযাত্রা নীরস লাগলে তারা মাঝে-মধ্যে গ্রামে এসে হানা দেয়। বাইরের লোকের অন্তঃপুরে হানা দেবার মতো গ্রামের মধ্যে একটা সচকিত ভাব দেখা যায় তখন। অভিজাত গ্রামবাসীরা প্রায়ই বাগানের ফল অথবা পুকুরের পাকা-মাছ ভেট পাঠায় তাদের কাছে। থানা-পুলিসের লোকেরা এই রকম কোন না কোন গাঁয়েরই ছেলে। অনেক বাড়ির হাঁড়ির খবর রাখে তারা। ফলে ভালো জিনিসটি তাদের চোখে গোপন রাখা সহজ নয় খুব। আধা গেরস্ত ঘরের দুই একটা মেয়ে পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছে এই গাঁ থেকে। নিখোঁজ হয়ে কোথায় গেছে বা যায় তা যে কেউ জানে না এমন নয়। জানলেও তা নিয়ে লাফালাফি করবে এমন বুকের পাটা কার। ঘর-দোর বাস্তুভিটে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে কতক্ষণ? তাছাড়া গাঁয়ের মুরুব্বী পুরুষদের সঙ্গে রীতিমত হৃদ্যতা আছে যখন, দারোগা-পুলিসের ভয়টা কাকে?

ধর্মের ধারার মধ্যে বেশ একটা গোঁজামিল এসে গেছে সেই সময়। গাঁয়ের সীমানায় মুসলমান বসতি গড়ে উঠছিল। দুই একটা মসজিদও উঠেছে। কারণে অকারণে

তারা দল বাঁধে, জোট পাকায়। সকলেই তারা হিন্দু ছিল একসময়ে। সংস্কারের চাকার তলায় পড়ে মুসলমান হয়েছে। ফলে রাগটা হিন্দুদের ওপরেই তাদের সব থেকে বেশি। এদিকে গাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণরাও কম প্রতিপত্তিশালী নয়। তাদের ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে আছে। ব্রাহ্মণ ছাড়াও এধার ওধারে আরো অনেক জাত মাথা উঁচিয়ে আছে। এরই মধ্যে আবার বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবের আখড়ার সংখ্যাও কম নয়। গাঁয়ের মধ্যে এক-চক্কর ঘুরলে তন্ত্রসাধকও চোখে পড়বে কিছু। কিন্তু এত ভাগাভাগি সত্বেও সহ-অবস্থানের সহিষ্ণুতায় বড় দরের গোলযোগ কিছু দেখা যেত না। সকলের পালা-পার্বণ উৎসবে সকলেরই কৌতূহল এবং আগ্রহ দেখা যেত। এমন কি গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে মুসলমান পরব পর্যন্ত দেখতে যেত। সকল উৎসবের মধ্যেই আনন্দ আহরণটা ছিল মূল লক্ষ্য। তাই মেলাতেও যেমন ভিড়, গাজন-চড়কের উৎসবেও তেমনি, আবার বসন্ত পূর্ণিমা আর ঝুলনেও তাই।

প্রতিপত্তিটা তখন ধর্মগত মুরুব্বিয়ানার ওপর নির্ভর করত না আদৌ। নির্ভর করত ব্যক্তিগত দৌলত আর ঐশ্বর্যের ওপর, নির্ভর করত ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের ওপর, আর নির্ভর করত ব্যক্তিগত পৌরুষের ওপর।

সেই শক্তি সামর্থ্য ঐশ্বর্য আর দৌলত ছিল হালদার মশাইয়ের।

সেই পৌরুষ ছিল নন্দিনীর বাবা মুকুন্দ গোস্বামীর।

আর, সেই শক্তি সামর্থ্য না, ঐশ্বর্য দৌলত না, অথবা সেই পৌরুষও না—অথচ কিছু একটা ছিল পরাণ চাটুজ্জের।

তিনজনেই পরিচিত ব্যক্তি গাঁয়ের মধ্যে, তিন জনকেই সমীহ করে চলত গাঁয়ের লোক।

শক্ত সমর্থ, গৌরবর্ণ পুরুষ মুকুন্দ গোস্বামী। ব্রাহ্মণ। কিন্তু নিজেকে চালাতেন বৈষ্ণব বলে। কবে থেকে বৈষ্ণব হয়েছেন, কবে দীক্ষিত হয়েছেন কেউ জানে না। ব্রাহ্মণ-পাড়ায় বাস করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরাও খুব সুনজরে দেখতেন না তাঁকে। তাঁর বাড়িতে গান বাজনার আড্ডাটা চক্ষুশূল ছিল সকলের। সেই গান-বাজনার ছুতো ধরে পাঁচ রকমের লোক আসত বাড়িতে। অথচ বাড়িতে অমন একটা সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে। লোক কেন যে অত গোসাঁইজীর বাড়ি বলতে অজ্ঞান পাড়া প্রতিবেশীরা সেটা ভালো করেই জানে। ফুল আছে, মধু আছে, অথচ মৌমাছি গুনগুনিয়ে আসবে না? খুব আসবে।

কিন্তু সামনাসামনি কেউ বিশেষ কিছু বলত না মুকুন্দ গোস্বামীকে। বলতে সাহস করত না। তার মতো লোক পাড়ার একটা বল-ভরসাও বটে। তা ছাড়া হালদার বাড়ির বড় কর্তা স্বয়ং যেখানে গান শুনতে আসেন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছ'দিন, সেখানে

কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে বলবে কিছু। গোস্বামীর সমবয়সী সূর্যনাথ হালদার, পঞ্চাশের কিছু নিচেই হবে বয়স। সমবয়সী হলেও গোস্বামী দাদা ডাকতেন তাঁকে। গান শুনতে শুনতে প্রৌঢ় সূর্যনাথ হালদারের সমস্ত সৌর তেজ যেন গলে গলে পড়ত। চোখ বুজে বিভোর হয়ে গান শুনতেন তিনি, অত বড় দেহটা ভাবের আবেগে বেতের মতো দুলত। নন্দিনীর খোঁজে মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকাতেন। সেই তাকানোর অর্থ সকলের জানা। অর্থাৎ তামাক চাই। নন্দিনী তামাক সেজে দিয়ে যেত। না-দিয়ে আর যেতে পারত না কোথাও, তাঁর সস্নেহ ইঙ্গিতে কাছেই বসে থাকতে হত। মাঝে মাঝে তাকেও গান গাইতে বলতেন হালদারমশাই। তখন সব থেকে খুশি হত বোধহয় পরাণ চাটুজ্জে। পরাণ চাটুজ্জের তখন বয়স বেশি নয়, কিন্তু খোলের হাত পাকা। আর গাঁজায় দম দেবার ব্যাপারেও বেশ একটি সুনাম অর্জন করেছে সেই বয়সেই।

পরাণ চাটুজ্জে একাই খোল বাজিয়ে নয় আসরের। তার থেকেও পাকা-হাত প্রবীণ বাজিয়ে আছে। কিন্তু নন্দিনী গাইতে বসলেই বাজানোর বরাদ্দটা যেন তারই একচেটে। কাউকে বলেও দিতে হবে না। এতক্ষণ যার হাতের চাঁটিতে খোল জমজমিয়ে উঠেছিল, নিজে থেকেই সে সরে গিয়ে পরাণ চাটুজ্জের জন্য জায়গা করে দেবে। সূর্যনাথবাবু হয়ত বাধা দেন এক-আধ সময়, তুমি উঠলে কেন হে, বেশ তো বাজাচ্ছিলে, তুমিই বাজাও না?

জবাবে খোল-বাজিয়েকে বিড় বিড় করে বলতে শোনা যাবে, না পরাণই বাজাক।

একমাত্র খোলে যদি তখন নন্দিনীর বাবা বসে থাকেন, তিনিই শুধু ওঠেন না, নয় তো আর সকলেই পরাণ চাটুজ্জেকে জায়গা করে দেয়।

নন্দিনী গাইতে বসলে বিশেষ করে আর একজনও খুশি হয়। সে থানার ছোট দারোগা মহিম তরফদার। নিয়মিত আগন্তুকদের মধ্যে সেও একজন। বয়সে পরাণ চাটুজ্জের থেকে বড় কিছু। জবরদস্ত দারোগা হিসেবে নামডাকও আছে। পরাণের সঙ্গে তার প্রচ্ছন্ন রেষারেষি সকলেই জানে। দারোগারা তখন হর্তাকর্তা বিধাতা।

অথচ, সেই বিধাতা-সদৃশ প্রবল প্রতাপ পুরুষও পরাণের মতো মানুষকে দু'চারটে রুলের ঘায়ে সজুত করে দেয় না কেন—সেটাও অনেকের বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের ফলেও পরাণ চাটুজ্জেকে তেমন ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ।

আর মুকুন্দ গোস্বামীর পিছনে লাগা? গাঁয়ের ডাকসাইটে পুরুষগুলোকে অবলীলাক্রমে বাড়ির খোঁয়াড়ে এনে ঢোকাতে পারেন যে মানুষ, তাঁকে শত হাত দূর থেকে প্রণাম। ভরা শীতেও গায়ে কেউ জামা দেখেনি মুকুন্দ গোস্বামীর। গরমে মোটা কাপড়ের ওপর একটা পাতলা চাদর জড়াতেন গায়ে, শীতে মোটা চাদর

একখানা। মাইলের পর মাইল খড়ম ঠকঠকিয়ে চলতেন। তাঁর খড়মের শব্দ আর গানের গুনগুন্ ভিন গাঁয়ের লোকেরাও চিনত।

নন্দিনীর গানের সুনাম যত না ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল রূপের খ্যাতি। কিন্তু আসরে যারা আসত তারা তার গানের সঙ্গে রূপের এক অরূপ যোগের মহিমায় অভিভূত হয়ে থাকত। চোখ বুজে হেলে দুলে নন্দিনী গাইত :

"নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল···"

পরাণ চাটুজ্জে হাঁটু মুড়ে খোলের ওপর চেপে বসতে চাইত যেন। আ-হা আ-হা রব উঠত চারদিক থেকে। সূর্য হালদার দুলতে দুলতে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। মহিম দারোগার দুই চোখে তৃষ্ণার যাতনা ফুটে উঠত।

"তোমারে জিনিয়া লব,
আপন হৃদয়ে থোব
নতুবা হইব তোমার দাসী"···

এই দাসীটির জোর কোথায় স্বয়ং দাসীই তা জানত যেন। নন্দিনী জানত। কখনো এমনি এক-একটা আখরের মুখে চোখ মেলে তাকাতো সে। পরাণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেত। দুই এক লহমার চাউনিতে পরাণের বাজনার উদ্দামে যেন পক্ষাঘাত ধরিয়ে দিতে চাইত। কিন্তু আরো বহু জোড়া চোখ তাকে ছেঁকে আছে দেখেই আবারও চোখ বুজত সে।

"সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম,
যে পরের প্রেম করে গো ··"

সংগীত রসিকদের গালে যেন চড় পড়ত একটা করে।

রূপ অনেক মেয়ের আছে, গানও অনেক মেয়ে গায়। এক জনের মধ্যে এই দুইয়ের যোগটাই বেশি দেখা যায় না। রূপ যার আছে সে রূপ নিয়ে অন্তঃপুরেই থাকে। গান যে মেয়ে গায় সে বড় জোর ঠাকুর ঘরে বসে নাম-কীর্তন করে দুই-একটা। কিন্তু চুনিগ্রামের মতো এ-রকম আসরানুষ্ঠানের নজির আর কোথাও ছিল না। ফলে ভিন-গাঁ থেকেও অনেক গানের ভক্ত আসত। সকলের জন্যই মুকুন্দ গোস্বামীর ঘর খোলা।

রূপের সঙ্গে রটনা মিশলে লোকের কৌতূহল জোরালো হয় অনেক বেশি। নন্দিনীকে নিয়ে গৃহস্থ বউ-ঝিদের মধ্যে রটনা কম হত না। অনেক সময়েই বাপের সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা যেত তাকে। মুকুন্দ গোস্বামী নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন,

মেয়েকে একা বাড়ি ফেলে রেখে দূরে কোথাও যেতেন না বড়। যেখানে যেতেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরও কারণ আবিষ্কার করতে বেগ পেতে হত না কারো। ভদ্রলোক গান আর আসর নিয়ে যতই মেতে থাকুন, নির্বোধ নন। যে খাল কেটে বসে আছেন, দুই একটা কুমীর যে এসে যেতে পারে সেই জ্ঞান তাঁর আছে। ব্রাহ্মণের ঘরে সতের-আঠারো বছরের অমন রূপসী মেয়ে অবিবাহিত থাকলে গ্রামসুদ্ধ টি-টি পড়ে যেত। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা একঘরে করত তাকে। কিন্তু মুকুন্দ গোস্বামীর জোরের প্রসঙ্গ আগেই বলা হয়েছে। তার ওপর লোকটার প্রকৃতিও অদ্ভুত ধরনের। কেউ কিছু বলতে এলে হেসে বলবেন, তিনি ব্রাহ্মণ নন। কোন বৈষ্ণবের সঙ্গে মেয়েকে জুড়ে দেবার কথা উঠলে বলবেন, সেই আশাতেই তো ফাঁদ পেতে বসে আছি, একটা-আধটা রত্ন যদি ছেঁকে তুলতে পারি—কিন্তু কোন ঝিনুকে মুক্তো দেখিনে। শুধু বাঁদরেরাই আসছে।

এ-সব কথা গোপন থাকে না। যারা আসে তাদের অনেকেরই মুখ ভার হয়। শুধু সূর্য হালদারমশাই হাসেন খুব। বলেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ হে, বড় খাঁটি কথাটি বলেছ। যেদিকে তাকাই গণ্ডা গণ্ডা বাঁদর।

কিন্তু লোকের মুখও চাপা থাকে না তা বলে। এমন এক অসম্ভব কাণ্ডর কিছু না কিছু হদিস তারা খুঁজে বার করবেই। একটা না একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করবেই। কেউ বলে, বিয়ে নন্দিনীর অনেক কালই হয়ে গেছে। দূরের শহরে মাসির বাড়িতে মানুষ জন্ম থেকে। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখছে মাত্র বছর পাঁচ-ছয়। কাজেই রটনার ফাঁকগুলো ঢেকে দেওয়া অনেক সহজ। মাসি নাকি গৌরীদান করেছিলেন নন্দিনীকে এক ঘাটের বুড়োর কাছে। বুড়ো মরেছে। মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়ার ফিকিরে মাসির সঙ্গে ঝগড়া করে বাপ মেয়ে নিয়ে এসেছে। এখন নিজের নিজের ছেলেদের সামলেসুমলে রাখা দায়।

কারো বা ধারণা, শ্বশুর ঘরে ঠাঁই মেলেনি নন্দিনীর, ওই বারো বছরের মেয়ের ওপরেই চোখ ছিল অনেকের। দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়ে মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছিল তিন-চারদিন। শেষে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ত্রিবেণীর চড়ায় পাওয়া যায় একদিন। বাপ খবর পেয়ে মেয়ে নিয়ে আসে।

কারো কারো আবিষ্কার আরো সরস। বিয়ে-থা নন্দিনীর হয়নি মোটে, হবেও না বাপ বেঁচে থাকতে। কত দূর দূর জায়গা থেকে আসর বসানোর আমন্ত্রণ আসে গোস্বামীর কাছে। সেই সব আসর থেকে গোস্বামী কি শুধু হাতে ফেরেন নাকি? নোটের তাড়া নিয়ে ফেরেন। তারা বলে, এত আদর কেন গোস্বামীর, ঘন ঘন এত ডাকই বা আসে কেন চারদিক থেকে? আদর ওই মেয়ের জন্য, ডাক আসে ওই

নন্দিনীর জন্য। মেয়ে না থাকলে বাপের পসারে চড়া পড়বে দু'দিনের মধ্যে। কেউ ডাকবে না, কেউ খোঁজও করবে না। পসার নয় তো কি, তোমার আমার জানার বাইরে অজানা থাকতে নেই কিছু? গোপন থাকতে নেই? তারা কি আর ঢেঁড়া দিয়ে পসারের কথা প্রচার করে বেড়াবে? ওটা ধরে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়।

এই ধরে নেওয়া বুঝে নেওয়াগুলো নন্দিনী ভালো করেই জানে। মেয়েটা বাইরে গম্ভীর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের আনন্দে নিজে ভরপুর। কোন কথা কানে এলে জোড়া ভুরু কুঁচকে নিজের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করে নেয়। সাহসও দুর্জয়। হাতের কাছে পেলে স্থির গম্ভীর মুখে যে-কোন রটনাকারীণীকে পাঁচকথা শুনিয়ে আসতে পারে। এমনিতে মুখরা নয়, বরং স্বল্পভাষিণী। কিন্তু মুখ একবার খুললে সে-মুখের ধারও বড় কম নয়। আবার রাগ চলে গেলে ঘরে বসে এক-একসময় নিজের মনেই হেসে সারা সে। ভ্রূ কুঁচকে ভাবে সত্যিই বাবার ইচ্ছেটা কি! কোন চিন্তা ভাবনা নেই, তোড়জোড় নেই, চেষ্টাচরিত্র নেই। এভাবে কোন্ রাজপুত্তুর জামাই আসবে তাঁর মেয়েকে নিতে। আটবছর বয়সে এক ঘাটের মড়ার সঙ্গে মাসি বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল এটাও ঠিক, বারো বছরে দু'জন ছোকরা সাঁঝের আঁধারে তাকে টেনে হিঁচড়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল, তাও ঠিক। কিন্তু অজ্ঞান নন্দিনী হয়নি, অজ্ঞান বোধহয় ওই তারাই হয়েছিল। দাঁতে করে দু'জনেরই গায়ের মাংস ছিঁড়ে এনেছিল নন্দিনী। রক্তে চান করে উঠেছিল তারা, আর নন্দিনীর সমস্ত মুখ রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। মানুষের রক্তের এমন স্বাদ হয় নন্দিনী জানত না, সাতদিন মুখে ভাত রোচেনি তার।

এরপর বাপকে ডেকে মাসি বিদেয় করেছেন বোনঝিকে। আর নিজের কাছে রাখতে সাহস করেননি। কোন্ এক জ্যোতিষী নাকি গণনা করে বলেছেন, এ মেয়ের ওপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ অনেক ঝড় ঝাপটা যাবে। অতএব এই মেয়ে রেখে নিমিত্তের ভাগী কে হবে! পাড়া-পড়শিনীদের শেষের সংশয়ও ভিত্তিহীন নয় একেবারে। আসরের আমন্ত্রণ এলে বাবা ওকেও সঙ্গে নিয়ে যান বইকি। শুধু নিয়ে যান না, তাকেও গান গাইতে হয়। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সকলে। বাবা তার সত্যিকারের গুণী, কিন্তু গুণের কদর ক'জন করতে পারে। ফলে আগ্রহটা ওর প্রতিই বেশি দেখা যায় সকলের। নন্দিনী সেটা বেশ উপলব্ধি করতে পারে, এর সবটাই যে শুধু গানের দরুন নন তাও বেশ ভালো করেই জানে। কিন্তু বাবাকে তা বলে কারো কাছ থেকে টাকা নিতে দেখেনি কখনো। কু-রটনা যারা করে, বাবার ভিতরটি যদি তারা ভালোভাবে জানত, তাঁর পা ছেড়ে আর তাহলে নড়তে চাইত না।

কিন্তু সত্যিই বাবা ওকে নিয়ে করবেন কি শেষ পর্যন্ত? এদিক থেকে তাঁর ঘুম

ভেঙেছে বলেও তো মনে হয় না। যারা আসে এখানে তাদের মুখগুলো এক একসময় চোখের ওপর ভাসে নন্দিনীর। কিন্তু কোন একটা মুখও মনের তলায় উঁকিঝুকি দেয় না। দিলেও একটা গ্লানি, একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করে। ছোট দারোগা মহিম তরফদারের মুখখানা যেন শেয়ালের মুখ। কেন যে আসতে দেয় বাবা। তার চাউনিতে পর্যন্ত কি রকম একটা অশুচি ভাব। চোখাচোখি হলে গা ঘিন ঘিন করে। ঘরে বউ আছে, বাচ্চা ছেলেও আছে একটা শুনেছে, তবু লোভ দেখ! লোভের মুখে আগুন। লোকটা সুবিধের নয় একটুও, নন্দিনী মুখ দেখেই বলে দিতে পারে। ফাঁক পেলে ঠিক থাবা বসাতো, দারোগার অসাধ্য কর্ম কি আছে! পারে না বোধহয় সুধিয় জ্যাঠার ভয়ে।

সুধিয় জ্যাঠা ওকে কম টাকা খাওয়ায় না নিশ্চয়। সুধিয় জ্যাঠা ভালোই বাসে নন্দিনীকে। খুব ভালোবাসে। নন্দিনীর সমস্ত মুখে চাপা কৌতুক টসটসিয়ে ওঠে। গান শুনে সুধিয় জ্যাঠা ভাবে বিভোর হয়ে যায়, ওকে সামনে বসিয়ে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। সেই হাতের মাংস খুবলে তুলতে ইচ্ছে করে নন্দিনীর এক-একদিন, হাত মুচরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। একে বাপের বয়সী, তায় ঘরে অমন সতী-সাধ্বী বউ, একটু যদি পাপের ভয় থাকত। পুরুষ জাতটা লোভে লোভেই গেল।

আর একটা মুখও চোখে ভাসে, আর সেটাও বিরক্তির কারণ। নন্দিনী পরাণ চাটুজ্জে বলে না, মনে মনে বলে গেঁজেল চাটুজ্জে। বাজায় ভালো বলেই অত আশকারা। আর ছোট দারোগা যে এ-পর্যন্ত কোনরকম বাড়াবাড়ি করেনি তাও খানিকটা ওই গেঁজেলের ভয়েই বোধ হয়। ভয় কেন সেটা অবশ্য নন্দিনীও ভালো করে জানে না, তবু সেই রকমই মনে হয় তার। দু'জনের মধ্যে একটা গোপন রেষারেষির আভাস পায় সে। সেটা যে তারই কারণে সে-সম্বন্ধে নন্দিনীর একটুও সংশয় নেই। আর লোকটার দুর্জয় সাহস তো নিজের চোখেই অনেকদিন দেখেছে। আড়ালে আবডালে পরাণ চাটুজ্জে কথা বলার সুযোগ খোঁজে সব সময়, সরে যেতে চাইলে হাত ধরে আটকে রাখে পর্যন্ত। একবার নিজের হাতসুদ্ধ ওর হাতটা দরজার খিলেনে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা টেনে দিয়েছিল। নিজের হাতেও অবশ্য লেগেছিল একটু, কিন্তু ওই গেঁজেলের হাত থেঁতলে গিয়েছিল একেবারে। একমাস খোল বাজানো বন্ধ ছিল। কিন্তু বেহায়ার লজ্জা যদি থাকত, মুখের দিকে চেয়ে তারপরেও হেসেছে নির্লজ্জের মতো। লোকটা সামনে এসে দাঁড়ালে পর্যন্ত গাঁজার গন্ধ নাকে আসে নন্দিনীর।

না, বুকের তলায় লালন করার মত একটা মুখও উঁকিঝুকি দেয় না। ভুরু কুঁচকে তবু তেমনি একটা মুখ স্মরণ করতে গিয়ে হেসে ফেলে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে নন্দিনী:

"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে..."

কিন্তু পরাণ চাটুজ্জের তৃষ্ণার জ্বালা অনুমান করতে পারলে নন্দিনীর গলায় গান আসত না। ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে ওদিকে, আভাসে-ইঙ্গিতে সেটা উপলব্ধি করতে পারলেও চিন্তার কারণ হয়নি আদৌ। এই ধকল তো বারো বছর বয়েস থেকেই তাকে প্রতিরোধ করে আসতে হচ্ছে। নন্দিনীর আত্মপ্রত্যয় বেড়েছে বরং। কিন্তু রূপচুরির সিঁদেল চোরই নন্দিনী দেখেছে এ-পর্যন্ত, দস্যু দেখেনি।

গান সেদিন জমেছিল খুব। খোলটাকে সেদিন অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছিল পরাণ চাটুজ্জে, বার বার নন্দিনীকে উসকে দিচ্ছিল। নিপুণ খোল বাজিয়ে সেটা অনায়াসেই পারে। সেদিন বোধহয় গাঁজার দম মাত্রা ছাড়িয়েছিল, ফলে বাজনার রেষারেষিতেও মাত্রাজ্ঞান ছিল না। বার বার যেন একটা বিপাকের মধ্যে ফেলে দিতে চেষ্টা করছিল নন্দিনীকে। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতোই নন্দিনী বার বার ছোবল মেরেছে। মেরে মেরে ঘায়েল করেছে শেষ পর্যন্ত। বাহবা বাহবা রবে গানের আসর মাতোয়ারা। গান শেষ হতে পরাণ চাটুজ্জে খোল ছেড়ে ধুঁকছিল। তার বুকের মধ্যে ধারালো বিদ্বেষের দৃষ্টি আমূল বিদ্ধ করে নন্দিনী উঠে দাঁড়িয়েছিল। দুই হাত প্রসারিত করে তাকে কাছে আসতে আহ্বান করেছিলেন সূর্য হালদার। একটা জৈব তাড়না উপচে উঠছিল মহিম তরফদারের চোখে। মুকুন্দ গোস্বামী শুধু চোখ বুজে বসেছিলেন।

নন্দিনী আর তিলার্ধ সেখানে অবস্থান না করে ধীর গম্ভীর মুখে পাশের ঘরে চলে এসেছিল।

খানিক বাদে দোর গোড়ায় গলা শোনা গেল, একটু জল দেবে গো, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

পরাণ চাটুজ্জের গলা।

এই ছলাকলাও নতুন নয়, নন্দিনী অনেকদিন ভিতর থেকে সাড়া দিয়েছে, কুয়োতলায় খাওগে যাও। মেজাজ বেশি অপ্রসন্ন থাকলে বলেছে, কলসীসুদ্ধ বার করে দিচ্ছি, দড়িও আছে এক গোছ—একেবারে বেঁধেছেঁদে সরস্বতীতে ডুবে আশ মিটিয়ে জল খাওগে যাও। অবশ্য জল যে দেয়না কোনদিন তাও না, বেশিরভাগ দিনই দেয়, ঘরে বাতাসা-টাতাসা থাকলে তাও এনে দেয় সেই সঙ্গে। পরাণ চাটুজ্জে বাতাসা চিবিয়ে জল খায়।

আজ পরাণ চাটুজ্জের গলার স্বরটাও ভারী, আর নন্দিনীর মেজাজ-পত্রও খুব সুবিধের নয়। ওর ভিতরের নারী প্রবৃত্তিটাকে স্থূলভাবে সজাগ করে দিয়েছে লোকটা। গলা শোনামাত্র ঘটি হাতে সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শুধু জলই। উঠোনে দাঁড়িয়ে নন্দিনী জল ঢালল দুই আঁজলা। সেই জল বেশির ভাগই হাতের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে তাও দেখল। পরাণ চাটুজ্জের নিজের হাত দুটো মুখের কাছে বটে, চোখ দুটো ওর মুখের ওপর। তৃষ্ণা কণ্ঠে নয়, তৃষ্ণা চোখে।

চাপা রোষে নন্দিনী বলল, জল খাবে তো খাও, নইলে সব জল মাথায় ঢালব।

ফিসফিস করে পরাণ চ্যাটুজ্জে বলল, হাঁ কি না আজ সাফ কথা শুনব, আমাকে বিয়ে করবি কি না?

নন্দিনীও তেমনি অস্ফুট আক্রোশে জবাব দিল, কেন গলায় দড়ি জুটবে না আমার? বেশ কষে দু'ছিলিম গাঁজা টানো গে যাও, সর্বতাপ জুড়িয়ে যাবে।

হাতের জল ফেলে দিয়ে খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরল পরাণ চাটুজ্জে। বললে, মাইরি বলছি নন্দিনী, তোকে পেলে গাঁজা খাওয়াও ছেড়ে দেব আমি, তিন সত্যি করে বলছি, তুই কথা দে।

গাঁজার গন্ধ নাকে আসছিল নন্দিনীর, সাহস দেখে সর্বাঙ্গ রি-রি করছিল রাগে। আজ গাঁজার মাত্রা ছাড়িয়েছে, নন্দিনী খোল বাজানো দেখেই বুঝেছিল।

প্রাণে ভয়ডর থাকে তো হাত ছাড়ো বলছি।

কিন্তু ভয়ডর আপাতত আছে বলে মনে হল না। হাত ধরেই নন্দিনীকে দাওয়া থেকে নামিয়ে কাছে টানতে চেষ্টা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঘটিটা কপাল ঘেঁষে মাথার ওপর বেজে উঠল ঠক করে। আস্তে নয় সজোরে। অস্ফুট কাতরোক্তি করে হাত ছেড়ে দিল পরাণ চাটুজ্জে। নন্দিনী নিজের ঘরে না ঢুকে ঘটি রেখে আসরের দিকে চলে গেল। জ্বালা জুড়িয়েছে খানিকটা।

পরদিন সন্ধ্যায় সকলের আগে এসে উপস্থিত পরাণ চাটুজ্জে। রোজই যে আসর বসে তা নয়। আসর বসবে বলেও আসেনি। এসেছে নন্দিনীর বাবা মুকুন্দ গোস্বামীর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা আছে, তাঁর কাছে নিবেদন আছে একটা।

মুকুন্দ গোস্বামী নিবেদন শুনলেন। তার আগে নন্দিনী উঠে চলে গেল। গেল না, দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে কান পাতল। ফলে নিবেদনটা সেও শুনল। শুনে গা জ্বলে গেল আরও। সাহস দেখে তাজ্জব। আড়ালে দাঁড়িয়ে চার আঙুল ভেঙচি কাটল সে। তারপর বাবার গলা কানে আসতে কান পাতল আবার।

মুকুন্দ গোস্বামী ভাবলেন খানিক। তারপর বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে তো দিতেই হবে। আর বিয়ে যখন দিতেই হবে ছেলেও একটা দরকারই বটে। পরাণ চাটুজ্জে নিজেকে যে সেই ছেলে ভাবছে সেটা খুব আনন্দের কথা, খুশির কথা। কিন্তু তার আগে ছোটখাটো একটা কাজ করে দিতে হবে পরাণ চাটুজ্জেকে। আকাশের ওই চাঁদটাকে পেড়ে এনে দিতে হবে তাঁর হাতে। এক ছিলিম দু'ছিলিমে না হোক, পাঁচ সাত ছিলিমের পর সেটা খুব শক্ত হবে না পরাণ চাটুজ্জের পক্ষে।

পরাণ চাটুজ্জে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে তারপর। মুখখানা একবার দেখার লোভ হয়েছিল নন্দিনীর। দেখা গেল না। হাসি সামলাতে না পেরে নন্দিনী মুখে শাড়ির

আঁচল গুঁজে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়েছিল। বাবারে বাবারে বাবা—বাবা পারেও। গোড়ার ভণিতা শুনে তো নন্দিনীর ভয় ধরে গিয়েছিল।

কিন্তু লোকটাকে সঠিক চিনলে নন্দিনী অত হাসত না।

পরদিনই আবার এলো পরাণ চাটুজ্জে। এলো দুপুরে। বাড়িতে তখন তার বাবাও নেই। জেনেই এসেছে বোধহয়। কে এসেছে জানলে দরজা খুলত না। ঘুমের আমেজ এসেছিল একটু, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভেবেছিল বাবাই হবে।

তাই দরজা খুলেছিল। খুলে আর বন্ধ করার অবকাশ হয়নি। ওর মতলব বুঝেই লোকটা চট করে ভিতরে সেঁধিয়েছে। নন্দিনীর রাগ যত হচ্ছে, তেমনি অসহায়ও বোধ করছে।

নীরস প্রশ্ন করল, এ সময় কি মনে করে?

পরাণ চাটুজ্জে দুই চোখে একবার যেন সর্বাঙ্গ লেহন করে নিল তার। বলল, তোর বাবা আমার থেকেও বড় গাঁজাখোর, বিয়ের আগে চাঁদ ধরতে বলে দিলে আমায়—গুরুজনের আপ্তবাক্য, আমি দিনে দুপুরে মাটির চাঁদ ধরতে বেরিয়েছি, চাঁদ তাঁকে দেখিয়ে ছাড়ব।

নন্দিনী গর্জে উঠতে চেষ্টা করল, তুমি ঘর ছেড়ে এক্ষুণি বেরুবে কি না।

চোখ দেখাস না, পরাণ চাটুজ্জে চোখের গরমে ডরায় না। তুই আমার ঘরে আসবি কি না বল্, এলে আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দেব কথা দিচ্ছি।

নন্দিনী ক্রোধে ব্যঙ্গ করে উঠল, শুধু গাঁজা কেন, যে বাড় বেড়েছ পরাণটাই ছাড়তে হবে। লক্ষ্মী ছেলের মতো এখন উঠবে তো ওঠো, নয়ত পাড়ার লোক ডেকে তোমায় শায়েস্তা করব আমি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় লোকটার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল তাকে। ওই রোগা রোগা হাতে এত জোর কল্পনা করেনি। সাঁড়াশীর মত হাত দুটো যেন নিঃশেষে গ্রাস করছে তাকে। লোকটার বুকের ওপর তার হাড় পাঁজর সুদ্ধ যেন মটমটিয়ে ভাঙবে এবার। নন্দিনীর এতটুকু বাধা দেবার ক্ষমতা নেই পর্যন্ত, গোটা দেহ অবশ। অস্ফুট শব্দ বার করতে চেষ্টা করল একটা মুখ দিয়ে, তাও পারা গেল না। হিংস্র আক্রমণে দুই অধর দীর্ণ-বিদীর্ণ হবার উপক্রম।

সর্বাঙ্গে কি যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে নন্দিনীর, প্রলয়-আলোড়ন একটা। দেহ অবশ হয়ে আসছে আরো। সমর্পণ ছাড়া গতি নেই আর, শান্তি নেই। আপনা থেকেই-দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে।

খট খট খড়মের আওয়াজ বাইরে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সজাগ হল নন্দিনী। কালঘুমে পেয়েছিল তাকে, হঠাৎই সেই

ঘুম ভাঙল যেন। আচমকা এক ঝটকায় হাত তিনেক দূরে ছিটকে পড়ল লোকটা। ত্রস্ত বেশবাস ঠিক না করেই দৌড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল নন্দিনী। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, বাবা—

মুকুন্দ গোস্বামী বিমূঢ়, হতভম্ব। তাঁর সঙ্গে পাড়ার আরো দুটি লোক। উঠোনে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করার জন্য মুকুন্দ গোস্বামী তাদের ডেকে এনেছিলেন। তাদের একজনের হাতে কাটারি, অন্য জনের হাতে ফালি বাঁশের গোছা।

মুকুন্দ গোস্বামী ঘর থেকে পরাণ চাটুজ্জেকে হিড়-হিড় করে টেনে উঠোনে এনে দাঁড় করালেন। তারপর পা থেকে খড়ম খুলে সর্বাঙ্গ দাগড়া দাগড়া করে দিলেন। পরাণ চাটুজ্জের গায়ে জোর কম নয়, বাধা দিতে পারত, পালাতেও পারত। কিন্তু কেন কিছুই পারল না সেটাই বিস্ময়। পড়ে পড়ে মার খেল শুধু। অমানুষিক মার। অন্য দু'জন দেখল চেয়ে চেয়ে। কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে নন্দিনীও দেখল। মারতে মারতে নিজেই শ্রান্ত হয়ে পড়লেন মুকুন্দ গোস্বামী। শেষে খড়ম ফেলে ঘাড় ধরে তাকে বার করে দিয়ে শান্ত মুখে উঠোনের বেড়া বাঁধতে বসলেন।

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা গোপন থাকল না। পরাণ চাটুজ্জে নির্জীবের মতো এমন মারাত্মক মার খেয়েছে, চাক্ষুষ দেখলেও বিশ্বাস করা সহজ নয়। এক মুখ থেকে আর এক মুখে, শেষে সারা গাঁয়ে ছড়ালো খবরটা। দলে দলে লোক আসতে লাগল খবরটার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে। কিন্তু মুকুন্দ গোসাঁই নির্বাক, আর নন্দিনী একেবারে ঘরের মধ্যে।

অতঃপর শুভার্থীজনের শলাপরামর্শ।

সূর্য হালদার বললেন, কাজটা খুব ভালো হল না হে, কোথা দিয়ে কি হয় কে জানে …খুব বেশি মারধর করেছ শুনলাম। আবার বাপ হয়ে ধৃষ্টতা বরদাস্তই বা করা যায় কি করে, উচিত শিক্ষাই দিয়েছ। তা হলেও দুর্জন দুর্জনই, একটু সাবধানে থাকা দরকার। কিন্তু তোমার যা গোঁ, তুমি তো ভিটে ছেড়ে নড়বে না, এক কাজ করো—মেয়েটাকেই না-হয় দিন কতকের জন্য আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও। তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক। আদরেও থাকবে, আর নিশ্চিন্দিও। ওখানে টুঁ-টা করতে গেলে টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে আসতে কতক্ষণ।

সূর্য হালদারের হাতে লেঠেল আছে একদল সবাই জানে। এদের দেখার সুযোগ হয়নি কারো কখনো, তবু কি করে যেন জানে সবাই। ফলে হালদার মশাইয়ের সামান্য ভ্রূকুটির জোরটাও কম নয় এই গাঁয়ে। স্নেহভাজন মুকুন্দ গোস্বামীর নিরাপত্তার জন্য দু'চারজন লোককে তাঁর বাড়ির আশে-পাশে পাহারায় বসানোর কথাটা একবারও মনে হল না তাঁর। কেন মনে হল না হালদার মশাই-ই জানেন।

মুকুন্দ গোস্বামী হেসে জবাব দিলেন, দরকার হলে আপনি তো আছেনই। এটুকুই যথেষ্ট আর কিছু করার দরকার হবে না।

হালদারমশাই জোর দিয়ে বললেন, না সে কোন কাজের কথা নয়, ইজ্জত একবার গেলে আর ফেরে না, মেয়েটাকে তুমি আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও, ওর জ্যাঠাইমা বার বার করে আমাকে বলে দিয়েছে, শুনে পর্যন্ত ছটফট করছে।

দেখি—

কিন্তু এই দেখার অর্থ যে শুধুই নিষ্ক্রিয় বসে থাকা হালদারমশাই সেটা বেশ ভালো করেই জানেন। অবুঝপনা দেখে কিছুটা বিরক্ত আর কিছুটা চিন্তিত মুখে গাত্রোত্থান করলেন।

সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল সরস্বতীর ধার ধরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সন্ধ্যা পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ভিতর দিয়ে পা চালালেন। সামনে পরাণ চাটুজ্জের ভিটে।

পরাণ আছ নাকি হে? আমি হালদার জ্যাঠা।

পরাণ চাটুজ্জে বেরিয়ে এলো। গায়ে একটা চাদর জড়ানো।

শুয়ে ছিলে বুঝি? আবার ওঠালুম তোমাকে, চলো ভিতরে গিয়ে বসি।

পরাণের আগে আগেই ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি। মেঝেতে মাদুর বিছানো ছিল একটা, তার ওপর বসে পড়লেন। তারপর গভীর উদ্বেগে তাকালেন তার দিকে।— কি ব্যাপার হে, এমন মারটা খেলে কেন? ইস্ কপালটা পর্যন্ত যে ফুলে আছে—জ্বর-টর হয়নি তো? দেখি—

দেখা হল না। পরাণের অসহিষ্ণু মূর্তির দিকে চেয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন।—বোসো তুমি বোসো, তোমার জ্যাঠাইমা সেই কাল থেকে ঠেলছে, ছেলেটাকে আধমরা করেছে শুনেছি, দেখে এসো একবার কি হল। ছেলেবেলা থেকে দেখছে, মায়া মমতা যাবে কোথায়।...তা কি করেছিলে তুমি, ভালোবেসে মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, এই তো? এর বেশি কিছু তো নয়, তা বলে এমন আসুরিক মারের কথা তো শুনিনি কখনো, মেয়েটাকে তো তুই একটা না একটা ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দিবি, না কি—

আরো কিছুক্ষণ বসতেন হয়ত, বসতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু গাঁজাখোরের পাথরের মতো মুখে চোখ দুটো যে-ভাবে জ্বলছে, আর বেশিক্ষণ অবস্থান সমীচীন বোধ করলেন না তিনি।

ওদিকে ছোট দারোগা মহিম তরফদার হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত মুকুন্দ গোস্বামীর কাছে। খবর শোনার জন্য নয়, বেশ ফাঁপানো খবরই কানে গেছে তার।

গোসাঁইয়ের কাছে আবেদন, তিনি ছোট্ট একটা নালিশ করলেই লোকটাকে বাকি

জীবনের মতো সজুত করে দেবার ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। পরের কেস্ তারাই সাজাবে, গোড়ায় নালিশ একটা দরকার। অবশ্য নালিশ ছাড়াও লোকটাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেতে পারে, তবে নালিশ একটা পেলে আরো জোরদার হয়। প্রথমে ছ'মাস হাসপাতালে কাটিয়ে তারপর ছ'বছর জেলের ঘানি টেনে বাইরে বেরুবে যখন, পায়ের নিচে আর মাটি পাবে না।

মুকুন্দ গোস্বামী চুপচাপ শুনলেন। শুনেও চুপচাপ তামাক টানলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, তোমরা নিজের চরকায় তেল দাও গে বাবারা, আমার ঝুঁকি আমি সামলাতে পারব।

মহিম তরফদার নেহাত এই গাঁয়ের ছেলে বলে দারোগা কাকে বলে কেউ টের পেল না এখন পর্যন্ত। সেই জন্যই খেদ তার, সেই জন্যই ক্ষোভ। সবাই খুড়ো জ্যাঠা হয়ে বসে আছে, দারোগার দাপট জানে না। কিন্তু সেটা জানানোর লোভ একেবারে ছাড়তে পারল না মহিম তরফদার। গোস্বামীর অনুপস্থিতিতে এক বিকেলে নন্দিনীকে বোঝাতে বসল। শত্রু নিষ্কণ্টক হওয়াই ভালো। কি হয়েছিল সেদিন নন্দিনী যদি শুধু বলে যায় সে ডায়রীতে লিখে নেবে। তারপর চিরকালের মত লোকটাকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়ার ব্যবস্থা সে-ই করবে।

নন্দিনী বলল সে-তো খুব ভালো কথা, সেও তাই চায়। কিন্তু বলবে কখন, সে যে অনেক কথা, অনেক ঘটনা।

কাল দুপুরে আসব?

এলে তো ভালোই হয়, নন্দিনীর মুখে শঙ্কার ছায়া, কিন্তু বাবার যে কি হয়েছে, বাবার জন্যেই ভয়—

কেন, ভয় কেন?

সেদিন থেকে বাবার প্রতিজ্ঞা, একা কাউকে আমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলেই খড়ম পেটা করে একেবারে খুন করে ফেলে তারপর জেলে যাবে, ফাঁসী যাবে। খুন করবেই করবে, তা সে ভালো লোকই হোক আর মন্দ লোকই হোক, ভালো কথাই বলতে আসুক আর মন্দ কথাই বলতে আসুক। বাবার আসার সময় হল, এখন উঠলে ভালো হয়—

আশ্চর্য, এতবড় একটা ব্যাপার আস্তে আস্তে মিইয়েই গেল। মুকুন্দ গোস্বামীকে শুধু আরো একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগল সকলে। ভয়ের কারণ যে মানুষ, সে আপাতত নির্জীব একেবারে। পরের ছ'মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে পরাণ চাটুজ্জেকে পা বাড়াতেও দেখেনি কেউ। সকলে বলাবলি করেছে, পরাণ চাটুজ্জের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে মুকুন্দ গোস্বামী, বিষ দাঁত উপড়ে দিয়েছে।

পরাণ চাটুজ্জে এই গাঁয়ে বাস করে কি করে না তাও টের পাওয়া যায় না।

ছ'মাস বাদে হঠাৎ এক নতুন দুর্বিপাকে গাঁয়ের শান্তি ভঙ্গ হল একদিন। হঠাৎই যেন বিস্মিত বিভ্রান্ত বিমূঢ় সকলে।

কোজাগরী পূর্ণিমার মেলা চলছে তখন। মেলার এই তিনটে দিন মত্ত মাতাল হয়ে ওঠে চুনিগ্রামের বাতাস পর্যন্ত। ক'দিন আগে থেকেই আশ-পাশের গ্রাম শহর গঞ্জ থেকে পসরা নিয়ে লোক আসতে থাকে।

মেলার আগে নন্দিনী গিয়েছিল মাসির বাড়ি। শেষের দিন বাপের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরছিল। পথে কি একটা কাজে আটকে গিয়েছিলেন মুকুন্দ গোস্বামী। ফলে গাঁয়ের পথ ধরতেই সন্ধ্যা। গোসাঁইয়ের ভয় ডর বলতে কিছু নেই, অনেক রাত বিরেতেও এমনি খড়ম খটখটিয়ে এ-রাস্তা পারাপার করেন তিনি।

গুন্‌গুনিয়ে গানের একটা চরণ ভাঁজতে ভাঁজতে হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছেন। মেয়েটা মাঝে মাঝে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। ডাকাতে কালীর থানের কাছটা অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশে বটের ঝুরি নামার ফলে বরাবরই অন্ধকার এই জায়গাটুকু। মেয়ের জন্যে মুকুন্দ গোস্বামী গতি শ্লথ করলেন।

হঠাৎ বাতাস-কাটা শাঁ শাঁ আওয়াজ একটা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন মুকুন্দ গোস্বামী। নন্দিনী কিছু ভালো করে বোঝবার আগেই অন্ধকার ফুঁড়ে যেন প্রেতের মতো দৌড়ে এলো গোটাকতক লোক। হাতে লাঠিসোঁটা, সর্বাঙ্গে বিভীষিকার উল্কি পরানো।

নন্দিনীর চোখের সামনে, হ্যাঁ, নন্দিনীর একেবারে চোখের সামনে খাঁড়ার মত করে দু'হাতে পাকানো লাঠি উঁচালো একজন। নন্দিনী চোখ বোজারও অবকাশ পেল না, সেই লাঠি এসে পড়ল তার বাবার মাথার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা দু'ফাঁক।

আসল কাজের সমাধা করে ঠ্যাঙাড়েরা ঝুঁকে পড়ল। বামাল কিছু নেই। কিন্তু যে আছে তার দিকে চোখ পড়তে নগ্ন উল্লাসে লাফিয়ে উঠল তারা। নন্দিনী দাঁড়িয়েছিল, দেখছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল না। এদেরই মধ্যে সব থেকে ষণ্ডা গোছের একজন টপ করে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল, নন্দিনীর বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই।

কিন্তু খানিকটা এগিয়ে ঠ্যাঙাড়েরা দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। অদূরে জনাকতক লোক এগিয়ে আসছে বোঝা যায়। একজনের হাতে হারিকেন, অন্য ক'জনের হাতে-কাঁধে মেলার বোঝা কিছু কিছু।

লোক ক'টিও টের পেয়েছে সামনে দাঁড়িয়ে কারা। তারা থেমে গেছে। হারিকেন হাতে লোকটা হাঁক দিল, কে? কে ওখানে?

এদিক থেকে জবাব গেল, তোমাদের যম।

যমের খোঁজেই ঘুরছিলাম, দাঁড়া দেখি কেমন যম। বলতে বলতে হারিকেন হাতে লোকটাই দৌড়ে এলো প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা ফেলে শুধু লাঠি হাতে অন্য ক'জনও।

নন্দিনীকে আগেই কাঁধ থেকে নামিয়েছিল ষণ্ডা ঠ্যাঙাড়েটা। কিন্তু তখনো হুঁস নেই তার, নইলে হারিকেন হাতে লোকটার গলার আওয়াজ চেনা লাগতো। বেগতিক দেখে ঠ্যাঙাড়েরা নিমেষে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল।

হারিকেনের আলো ফেলে নন্দিনীর মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল যে লোকটা, সে পরাণ চাটুজ্জে।

অন্য ক'জনও তারই পরিচিত লোকই হবে বোধ হয়, মেলার কেনাকাটা সেরে জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

পরাণ চাটুজ্জে ধীর গম্ভীর।

নন্দিনীকে ধরে তুলল। সঙ্গীদের লণ্ঠন নিয়ে সামনের দিকে এগোতে ইশারা করল। নন্দিনীকে ধরে পায়ে পায়ে সেও এগোলো।

তারপর সকলেই থামল এক জায়গায় এসে।

যেখানে মুকুন্দ গোস্বামীর নিষ্প্রাণ অসাড় দেহটা রক্তে ভাসছে, সেইখানে।

দেহ বহন করে পরাণ চাটুজ্জের কুটিরে এনে নামানো হল যখন, তখন মাঝরাত্রি। দূরে দূরে উৎসব-ভাঙা মেলার আলো জ্বলছে তখনো। কিন্তু জন-মানব জেগে নেই। তাছাড়া তারা এসেছে সরস্বতীর ধার ধরে, কেউ টেরও পায়নি কতবড় অঘটন ঘটে গেল।

টের পেল পরদিন ভোর না হতে। শেষ রাতে ছোট দারোগার কাছে লোক পাঠালো পরাণ চাটুজ্জে। তখন জানাজানি। দলে দলে লোক ভেঙে আসতে লাগল পরাণ চাটুজ্জের ভিটেয়। পুলিস এলো আর এলো ছোট দারোগা মহিমা তরফদার।

সে আসাতে সুবিধে খানিকটা হল, অসুবিধেও। দারোগা পুলিস দেখলে গাঁয়ের লোক সাধারণত দশ-বিশ হাত তফাতে সরে যায়। দারোগার এক হুমকিতে সব ঠাণ্ডা। কিন্তু দারোগাটি অত্যন্ত চেনাজানা বলেই এক্ষেত্রে লোক ঠেকানো দায়। আবার সুবিধেও হল এই জন্যে যে, নন্দিনীর শোক অনুমান করে তদন্তের জন্য মুকুন্দ গোস্বামীর দেহ টানা হেঁচড়ার দায়টা সে-ই বাঁচিয়ে দিল। তখনকার দিনে দারোগার প্রতাপ সেই রকমই। তাছাড়া ঠ্যাঙাড়ে লোক মেরেছে, বেশি কিছু করারই বা আছে কি। মাসে দু'মাসে অমন একটা দুটো খুন-জখম জলভাত ব্যাপার। লোকটি মুকুন্দ গোসাঁই বলে, আর মুকুন্দ গোসাঁই নন্দিনীর বাবা বলে যা একটু সোরগোল।

পরাণ চাটুজ্জে আর তার সঙ্গীদের বিবৃতি লিখে নিয়ে মহিম তরফদার চেষ্টা করল

নন্দিনীর বক্তব্য লিখে নিতে। কিন্তু নির্বাক মূর্তির মতো বসে আছে নন্দিনী। একটি কথাও বলানো গেল না। সূর্য হালদার তরফদারের কানে কানে বললেন, মিথ্যে কষ্ট দিও না, দেখছ না হুঁস নেই।

ফলে আপাতত এই কষ্ট থেকেও তাকে রেহাই দিল ছোট দারোগা। দেহ সৎকারের হুকুম দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে মুকুন্দ গোস্বামীর দেহ নিয়ে সকলে চলল গোয়াল-ফেলানীর শ্মশানে। নন্দিনীকে ধরে নিয়ে চললেন সূর্য হালদার। যেতে যেতে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার এক বর্ণও যে কানে যায়নি তাও উপলব্ধি করলেন।

দাহ-কার্য সমাধা হতে হতে বিকেল।

শ্মশানযাত্রীরা সরস্বতীর জলে ডুব দিয়ে উঠল একে একে। নন্দিনীকেও ধরে ডুব দেওয়ানো হল। নন্দিনী স্তব্ধ, নির্বাক, নিশ্চেতন তখনো। হাতে ধরে তাকে যা করানো হয়েছে বা হচ্ছে সে তাই করেছে বা করছে। আর সেটা করিয়েছেন সূর্য হালদার অথবা বুড়ো ভটচায্ বামুন।

দাহ-স্নান সমাধা হতেই শ্মশানযাত্রীরা হতভম্ব হঠাৎ। সকলের চোখের সামনে শান্ত ঠাণ্ডা মুখে এগিয়ে এসে এবারে নন্দিনীর হাত ধরল পরাণ চাটুজ্জে! এক হাতে হাত ধরল, অন্য হাত তার পিঠে। সকলে হাঁ করে দেখল, পরাণ চাটুজ্জে তার নিজের ঘরের দিকেই নিয়ে চলেছে নন্দিনীকে। মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল সকলে। প্রৌঢ় সূর্য হালদার হতভম্ব। কেউ কেউ পরাণ চাটুজ্জের কুটির পর্যন্ত অনুসরণ করল, কেউ বা শ্মশান থেকেই ঘরের পথ ধরল।

ঘরের পথ সূর্য হালদারও ধরলেন।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে দেখা গেল একখানা ঢাকা পালকি চলেছে পরাণ চাটুজ্জের কুঁড়ের দিকে। এ পালকি সকলেই চেনে। হালদার গৃহিণীর পালকি। এই পুণ্যবতী মহিলাটিকে গাঁয়ের উঁচু নিচু সকলে জানে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

কিন্তু এই পালকিতে আপাতত নেই কেউ। হালদার গৃহিণীর শূন্য পালকি চলেছে পরাণ চাটুজ্জের কুঁড়ের দিকে। পিছনে সূর্য হালদার।

ঘরের সামনে পালকি থামল। তখনো পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়িয়ে সেখানে নিজেরাই জটলা করছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একজন ভিতরে গিয়ে পরাণ চাটুজ্জেকে খবর দিতে সে বেরিয়ে এলো।

সূর্য হালদার বললেন, তুমি ছেলের কাজ করেছ বাবা, যা করেছ তার তুলনা নেই··· তবু সর্বনাশ যা হবার তাতো হয়েই গেল। তোমার জ্যাঠাইমা পালকি পাঠিয়ে দিলেন, অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজেই আসতে চেয়েছিলেন, আমিই দিলুম না আসতে। মেয়েটাকে নিয়ে যাই, বাপ গেছে, মায়ের কোল পেলে জুড়োবে একটু।

পরাণ চাটুজ্জে ঠাণ্ডা জবাব দিল নন্দিনী আপাতত কোথাও যাবে না বলেছে।

কে বলেছে? হালদার মশাইয়ের কানে যেন ভালো করে ঢোকেনি কথাটা।

নন্দিনী বলেছে।

কি বলেছে?

কোথাও যাবে না।

কোথাও যাবে না তো থাকবে কোথায়? এখানে?

হ্যাঁ।

কিন্তু, ইয়ে—সেটা কি ভালো দেখাবে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে, অথচ তুমি তো সে-রকম নও। হালদার মশায়েরই সংকট যেন।—আচ্ছা, আমি না হয় একবার বলে কয়ে দেখি মেয়েটাকে।

অনুচ্চ কঠিন-স্বরে পরাণ চাটুজ্জে বলল, নন্দিনী ঘুমোচ্ছে, আপনি এখন বাড়ি যান।

ধীর পায়ে সে ভিতরে ঢুকে গেল আবার। হালদারমশাই বিমূঢ় মুখে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে পালকি বেহারাদের ইশারায় ফিরে যেতে বলে পায়ে পায়ে প্রস্থান করলেন।

শ্মশানেই ছোঁড়াটার হাবভাব মতিগতি লক্ষ্য করেছিলেন হালদারমশাই। খুব স্বাভাবিক লাগছিল না। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে বার করে এনে ছোঁড়াটার ঘর-দোর পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা না করে কোন কাজ করেন না হালদারমশাই। তাই ভাবতে ভাবতে ফিরে চলেছেন তিনি। কিছু যেন ভাবনার আছে, খুব জোরদার কিছু।

রাত্রি।

পরাণ চাটুজ্জে মিছে কথা বলেছিল। নন্দিনী এখানে থাকবে বলেনি। নন্দিনী কোন কথাই বলেনি।

নন্দিনী ঘুমোয়ওনি।

নন্দিনী বসেছিল মূর্তির মতো। নির্বাক নিস্পন্দ বাহ্যজ্ঞানরহিত।

নির্বাক পরাণ চাটুজ্জেও।

ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। এক গেলাস দুধ গরম করে নন্দিনীর সামনে ধরল সে। তারপর এই প্রথম কোমল গলায় বলল, খেয়ে নাও।

নন্দিনীর সাড়াশব্দ নেই, কোনো অনুভূতিও না। বসেই আছে।

দুধের গেলাসটা তার মুখের কাছে ধরল পরাণ চাটুজ্জে, তারপর মাথাটা কাছে টেনে এনে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল। নন্দিনী এবারে দুধটা খেল। পরাণ চাটুজ্জে খানিকটা জলও খাইয়ে দিল তেমনি করে।

এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরল নন্দিনীর, হুঁস ফিরল। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সে। দেখতে দেখতে ধারালো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দুই চোখের দৃষ্টি।

হাতের গেলাসটা কোণের দিকে সরিয়ে রাখতে রাখতে পরাণ চাটুজ্জে জিজ্ঞাসা করল, কী··· ?

জবাব নেই। নন্দিনী চেয়ে আছে। দেখছে। এ-চাউনি অনুভূতিশূন্য আত্ম-বিস্মৃত চাউনি নয়। স্থির, কঠিন।

এই লোকটার হাতে দুধ খেয়েছে তাও এই প্রথম খেয়াল হল বোধহয়। গলায় আঙুল ঢুকিয়ে উগরে দিতে চেষ্টা করল যা খেয়েছে। পরাণ চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত টেনে নামালো মুখ থেকে। ধমকের সুরে বলল, ও কি হচ্ছে !

নন্দিনী যোঝাযুঝি করল না একটুও। হাত নামালো। চেয়ে আছে। দেখছে। দুর্বোধ্য চাউনি নয়, থমথমে কঠিন। নিষ্পলক।

কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ···।

তারপর এই প্রথম বাকস্ফূরণ হল তার। তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কঠিন। কথা নয়, একটা ছুরির ফলা যেন এসে বিঁধল পরাণ চাটুজ্জের বুকে।

আমার বাবাকে মেরে ফেললে তুমি ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিষম চমকে উঠল পরাণ চ্যাটুজ্জে। নিজের অগোচরেই চিৎকার করে উঠল প্রায়, কি হয়েছে ? কি বললি ?

অনুচ্চ ধীর কণ্ঠে নন্দিনী আবার বলল, আমার বাবাকে একেবারে মেরে ফেললে তুমি ?

পরাণ চাটুজ্জে সোজা হয়ে বসল। নিষ্পলক চেয়ে আছে সেও। মুখের সব ক'টা রেখা কঠিন হয়ে উঠছে একটু একটু করে। নির্মম শুব্ধতা। ক্রুর ব্যাধের নিশ্চল প্রতীক্ষা।

তেমনি মৃদু কঠোর কণ্ঠে নন্দিনী বলল, এর প্রতিশোধ আমি নেব।

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তুর মতোই পরাণ চাটুজ্জে ঝাঁপিয়ে পড়ল রমণী দেহের ওপর। একটা মৃত্যুর প্রলেপে যে পশুবৃত্তি স্তিমিত সংযত ছিল এতক্ষণ, তার ঘোর কেটে গেল। পায়ের ঠেলায় হারিকেনটা ছিটকে গিয়ে পড়ল সাত আট হাত দূরে, দুই একবার দপদপিয়ে নিবে গেল সেটা। অন্ধকারের পশু আলো বরদাস্ত করে না।

নন্দিনী একটু কাতরোক্তি করল না, একটু বাধা দিল না, একটু যুঝল না। এর

নাম সমর্পণ নয়, দুরূহ বাধার মতো প্রকৃতি নির্বাক, নিঃসাড়। সেই ক্ষোভে পুরুষের ক্ষমাহীন নির্দয় নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী দাহ।

পরপর চার পাঁচ দিন পরাণ চাটুজ্জেকে কেউ ঘর ছেড়ে নড়তে দেখেনি। সকাল সন্ধ্যা দাওয়ায় বসে পাহারা দেয়। সেই মূর্তির দিকে চেয়ে কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না কেউ। নন্দিনীর খবর করতে এসেছে অনেকে, এসেও প্রায় চুপচাপই ফিরে গেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে পরাণ চাটুজ্জে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, এদিকে মাথা গলিও না, নিজের কাজে যাও।

মাথা কেউ গলাতেও আসেনি। পরাণ চাটুজ্জের জোরটা যে কোথায় কেউ জানে না। কিন্তু জোর যে আছে সে সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেউ বলতে সূর্য হালদার অথবা মহিম তরফদার নয়। সকলের চোখের ওপর বসে সত্য পিতৃহীনা মেয়েটাকে এভাবে আটকে রাখার জুলুম তাদের বরদাস্ত হবার নয়। তার ওপর ছোট দারোগার মনে একটা সংশয় উঁকি ঝুঁকি দিয়েছে। মেলার দিনে পথে লোকজনের যাতায়াত বেশি, ঠ্যাঙাড়েদের সেদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। আক্রান্ত পথচারীকে সব সময় একেবারে মেরেও ফেলে না তারা। এই বেলায় মেরে ফেলেছে। এমন একজনকে মেরেছে যার কাছ থেকে একসঙ্গে পাঁচটা টাকা বেরুবারও প্রত্যাশা নেই। এক মেয়েটার লোভে যদি মেরে থাকে। কিন্তু সে-রকম নজির নেই বললেও চলে। তাছাড়া মেয়েটা যে লোভনীয়, রাত করে ঠ্যাঙাড়েরা জানবেই বা কি করে! সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার ঠিক সেই সময় সেই পথে পরাণ চাটুজ্জের সঙ্গে যোগাযোগটা।

তার সঙ্গে আর যারা ছিল তারাই বা কে?

ক্ষোভে দুঃখে নিজের হাত কামড়ে মরছিল মহিম তরফদার। মেয়েটার দিকে চেয়ে, মেয়েটার সেই পাথর মূর্তি দেখে, কোন কিছুই খেয়াল ছিল না তার। কোন সম্ভাবনার কথাই ভাবেনি। নিজেই দেহ দাহ করার অনুমতি দিয়ে বসেছে। এই দেওয়ার অর্থ, সন্দেহজনক ব্যাপার নেই কোথাও কিছু। এখন এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নিজেরই বিপদ।

অনুরূপ সংশয় আর কারো মনে জেগেছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সূর্য হালদারের মনে যে জেগেছে সেটা গোপন থাকল না। তিনিও অনেক ভেবেছেন। ভেবে ভেবে ক'টা দিনের শিথিল অবকাশ জটিল করে তুলেছেন। ঠিক ওই সময়ে ওই জায়গাটিতে পরাণ চাটুজ্জে না হয়ে আর কেউ যদি ঠ্যাঙাড়েদের সামনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতো,

হালদারমশাই একবারও ভাবতেন না। কোন সংশয় রেখাপাত করত না। আজ কেবলই তাঁর মনে হচ্ছে, ছ-মাস আগে মুকুন্দ গোস্বামীর হাতে সেই অমানুষিক খড়ম-পিটুনি পরাণ চাটুজ্জের এত নির্বিবাদে বরদাস্ত করার কথা নয়। আর, যে মেয়েটার টানে দিন দুপুরে সেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা—লম্বা ছ'টা মাস সকল বাসনায় জল ঢেলে অমন তপস্বীর মতোও তার কাল কাটানোর কথা নয়। ভেবে ভেবে মস্তিষ্ক তপ্ত করে তুলেছেন হালদারমশাই।

তলায় তলায় নিশ্চেষ্টও বসে থাকেন নি একেবারে। ঠেঙাড়েদের আর পাবেন কোথায়। কিন্তু পরাণ চাটুজ্জের সে-রাতের সঙ্গীদের খোঁজ পাওয়া শক্ত নয়। কারা ছিল পরাণ চাটুজ্জের সঙ্গে সেই খবর সংগ্রহ করে হালদারমশাই সংগোপনে একদিন বাড়িতে ডেকে পাঠালেন তাদের। আদর আপ্যায়ন করলেন। মুকুন্দর কথা বলতে বলতে দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠতে লাগল বার বার। বললেন, ভগবান সেই তোমাদের পাঠালেন যদি, আর দু'দণ্ড আগে পাঠালেন না কেন। বাপটা তো গেলই—মেয়েটাকেও যা-ও উদ্ধার করলে তোমরা, তার পরিণতি দেখো। ঠাকুর জানেন কি তাঁর ইচ্ছে, এত পাপের ভার কি চুনির্গা বইতে পারবে!

যাদের ডাকা হয়েছে, হালদার মশাইয়ের খেদ তাদেরও মনে লেগেছে। নীরব দুশ্চিন্তায় তারাও সায় দিয়েছে। বাস্তবিকই কোথা দিয়ে কি অসম্ভব কাণ্ড হয়ে গেল। হালদারমশাই কথার ফাঁকে আর গল্পের ফাঁকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন, সেটা তখনো মাথায় ঢোকেনি তাদের। হালদারমশাই খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। পরাণ চাটুজ্জের সঙ্গে সেই রাতে দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছিল তারা, কোজাগরী পূর্ণিমার উৎসবের রাতে গ্রাম ছেড়ে তারা যাচ্ছিলই বা কেন, পরাণ চাটুজ্জে কি বলে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের। ঠ্যাঙাড়েদের সামনা-সামনি হবার আগে পরাণ চাটুজ্জের হাব-ভাব কেমন দেখেছিল, ইত্যাদি।

হালদার মশাইয়ের এত অন্তরঙ্গ আপ্যায়নে অভ্যাগতরা এবারে হঠাৎ যেন বিপদের গন্ধ গেল। ভিতরে ভিতরে চকিত হয়ে উঠল তারা। যথার্থই তারা কিছু জানে না। পূর্ণিমার রাতে বেড়াবার জন্যে পরাণ চাটুজ্জে মেলায় গিয়ে তাদের ডেকে এনেছিল বলেই তার সঙ্গে গিয়েছিল। পরাণ চাটুজ্জে বা হালদারমশাই মুখ ফুটে কিছু বললে খুশি হয়েই তো শোনে সকলে। খুশি করার জন্যে শোনে। ভালো-মন্দ তলিয়ে দেখে না অত। নিরুদ্বেগে বেড়াচ্ছিল তারা। বেড়াতে বেড়াতে কতটা এগিয়েছিল তাও খেয়াল করেনি। মনের আনন্দে কেউ কেউ গলা ছেড়ে গানও গাইছিল। সামনে অমন দুর্দৈব উপস্থিত তারা জানবে কেমন করে?

কিন্তু শুধু এটুকু অবগত হবার জন্যে হালদারমশাই এত পরিশ্রম করেননি। তাঁর

মোলায়েম কথার মধ্যে ভয়ের দিকটাই চকচকিয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বললেন, জানিনে বললেই যদি সব মিটে যেত তাহলে তো তোমাদের জন্যে অত ভাবনা হত না আমার। অত সহজে মিটবে না বলেই তো এত দুশ্চিন্তা। একেবারে মগের মুল্লুক তো নয় এটা, ইংরেজের রাজত্ব—সুয্যি ঠাকুরও অস্ত যান না এমন রাজত্ব। এই রাজত্বে কিছু গোপন থাকে, না কিছু রাখা ঢাকা থাকে!

ভাবনায় নিজের মুখখানা অন্ধকার করে তুলে একটা ত্রাসের মুখে ঠেলে দিলেন তাদের। বললেন, উৎসবের রাতে যেখানে পাঁচ গাঁ থেকে লোক আসে চুনিগাঁয়ে সেখানে তোমরা গাঁ ছেড়ে বেরুলে। আর সেই রাতেই মুকুন্দর ওই অঘটন। ঠ্যাঙাড়েরা জ্যোৎস্না রাতে আর লোক চলাচলের রাতেই একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকে সকলে জানে, অথচ শুধু মুকুন্দর জন্যই তারা যেন ঘাপটি মেরে বসেছিল। তারপর অঘটন ঘটতে না ঘটতে তোমাদের সঙ্গে করে পরাণ চাটুজ্জে হাজির সেখানে। ···এত সব যোগাযোগ ওই মহিমকে কি করে বিশ্বাস করাবে তোমরাই জানো। সে-তো সক্কলের বুকে রেঁদা চালিয়ে কথা বার করে নেবার জন্যে তৈরি হয়েছে দেখলাম—আমি বরং অনেক করে ঠেকিয়ে রেখেছি তাকে, বলেছি, নির্দোষীর হেনস্থা করো না মহিম, পরাণ চাটুজ্জের মতলবের আভাস তারা যদি কিছু পেয়ে থাকে, আমাকে অন্তত বলবে। ···এখন বলবে কিনা তোমরাই ভাবো।

তারা ভাবল তো বটেই, বললও। সেই ভাবনা আর বলা দুই-ই মর্মান্তিক বিরক্তির কারণ হালদার মশাইয়ের। নিরপরাধ লোকগুলো আতঙ্কে দিশেহারা। হালদার মশাইয়ের চরণ স্পর্শ করে তাদের আকুতি-মিনতি—তারা কিছু জানে না। কিছুই না।

এরপর ছোট-দারোগার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র প্রথমেই সেই প্রসংগ তুলেছেন তিনি।—ব্যাপারটা কেমন যেন হল না হে মহিম, এই মুকুন্দর হঠাৎ ওভাবে মৃত্যুটা আর কি···

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। ছোট দারোগা গম্ভীর।—সে-সব আর এখন ভেবে কি হবে, আগে ভাবলে পারতেন।

বলার ধরনে প্রচ্ছন্ন ইংগিতটা স্পষ্ট প্রায়। অর্থাৎ, এ নিয়ে আর ঘাঁটাবেন না, চুপ করে থাকুন।

সূর্য হালদার সেটা বুঝলেন। বুঝে অন্য পথে ইন্ধন জোগালেন।—তাতো না হয় হল, মুকুন্দর আয়ু ফুরিয়েছে—গেছে, কিন্তু তোমরা গাঁয়ের লোক হাকিম দারোগা থাকতে গাঁয়ের মধ্যে এ-সব কি কাণ্ড! মেয়েটাকে পাঁচ দিন ধরে এভাবে নিজের বাড়িতে আটকে রেখে দিয়েছে, সর্বনাশের কি আর বাকি আছে কিছু! মুকুন্দ

বেঁচে থাকতেই তো যে কাণ্ড করেছিল। চোখের ওপর এই দেখতে হবে এখন? ইচ্ছে করছে গ্রাম ছেড়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।

ছোট দারোগার মস্তিষ্কে দাহ্যবস্তুটি পুঞ্জীভূতই ছিল, সূর্য হালদার অগ্নি-সংযোগের কাজটি করে দিলেন শুধু। মহিম তরফদার দপ করেই জ্বলে উঠল। নন্দিনীকে জোর করে নিজের বাড়িতে আটকে রেখেছে এ কথাটা মনেই হয়নি। এটাও তো কম অপরাধ নয়। এই অজুহাতে একবার ধরে আনতে পারলে শাস্তির জাঁতায় ফেলে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতে কতক্ষণ।

থানা থেকে চারজন সিপাই নিয়ে চলল ছোট দারোগা মহিম তরফদার। সূর্য হালদারকেও ডেকে নিল। গণ্যমান্য সাক্ষী থাকা ভালো। হালদার মশাইয়ের আসার ইচ্ছে ছিল না খুব, কিন্তু মুখ ফুটে না-ও বলতে পারলেন না।

পরাণ চাটুজ্জে দাওয়ায় বসেই আসতে দেখেছে তাদের। একটুও নড়ল না, একটা পেশীও কাঁপল না, তেমনি বসে রইল। দু'চোখ আগুনের গোলার মতো ধকধকিয়ে উঠল শুধু। শিকলে বাঁধা নিরুপায় শ্বাপদ যেমন নিশ্চেষ্ট বসে থাকে, তেমনি।

মহিম তরফদার সিপাইদের হুকুম করল, হাতকড়া লাগাও।

নিজের অগোচরেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো পরাণ চাটুজ্জে।

সিপাইরা থমকালো একটু। সূর্য হালদার অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আবহাওয়াটা নরম করে আনতে চেষ্টা করলেন তিনি, হাতকড়া লাগাতে হবে কেন মহিম, এমনিতেই নিয়ে যাওনা, পরাণ তো আর আপত্তি করছে না। আইনের ব্যাপার, পাঁচজনে পাঁচ রকম লাগিয়েছে, তোমাকে কর্তব্য করতেই হবে—নইলে পরাণ তো আর আমাদের শত্রু নয় কারো।

সিপাইরা দ্বিতীয় হুকুমের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু মহিম তরফদার হুকুম দেবার অবকাশ পেল না আর। বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দিনী।

এক পরাণ চাটুজ্জে ছাড়া আর সকলেই বিমূঢ় হঠাৎ। নারী দেহের ওপর যেন আসুরিক ঝড় বয়ে গেছে একটা। শাড়ির আঁচলে গলা পর্যন্ত ঢাকা, কপালের জায়গায় জায়গায় আঘাতের চিহ্ন, বাঁ-চোখের ভুরুর ওপর মস্ত একটা কালশিরে। কাঞ্চন-বর্ণ মুখখানা অসাড় কালচে, চোখের কোলে কালি।

সকলের দৃষ্টি অনুসরণ করে পরাণ চাটুজ্জেও ফিরে তাকালো। নন্দিনীকে দেখল। প্রতিশোধ গ্রহণের পরিপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ভেবে দেহের শিরায় শিরায় গলিত আগুনের স্রোত বইল একপ্রস্থ। যাবার আগে এই একজনকে অন্তত নিঃশেষ করে দিয়ে গেল না কেন, চোখের তারায় তারায় সেই ক্রূর খেদ।

সূর্য হালদার আঁতকে উঠলেন প্রথম, এ কি চেহারা হয়েছে তোর নন্দিনী, তোকে মারধর করেছে নাকি?

নন্দিনী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ মারধর করেনি।

এক ধাক্কায় পরাণ চাটুজ্জেকে ঠেলে দিয়ে মহিম তরফদার এগিয়ে এলো।—তোমার আর কিছু ভয় নেই নন্দিনী, তোমার ওপর অত্যাচার করেছে কিনা সত্যি করে বলো।

নন্দিনী স্পষ্ট মৃদু জবাব দিল, করেনি।

সূর্য হালদারের ধৈর্য গেল। কটু কণ্ঠে বলে উঠলেন, করেনি তো তোর এই অবস্থা কেন, কপালটা ওভাবে ফুলে ফুলে আছে কেন?

কপাল কুটেছিলাম।

জবাব শুনে সকলেই ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। এমন কি পরাণ চাটুজ্জের দুই চোখেও দুর্বোধ্য বিস্ময়।

একটু বাদে ছোট দারোগা কর্মতৎপর হল আবার।—এ কথা থাক, পাঁচ দিন ধরে এ তোমাকে জোর করে এখানে আটকে রেখেছে কিনা বলো?

ধীর, শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, না। আমি নিজের ইচ্ছেতেই আছি এখানে।

অসহিষ্ণুতায় কর্কশ শোনালো এবার ছোট দারোগার কণ্ঠস্বর।—বলছি তো তোমার একটুও ভয় নেই আর, যা বলার নির্ভয়ে সত্যি করে বলো।

তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে এবারে আরো একটু দৃঢ় স্বরেই জবাবটা দিল নন্দিনী। বলল, ভয় আর আমার কাউকেই নেই।

আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে গেল।

বাইরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সকলে। হঠাৎই আত্মস্থ হয়ে পরাণ চাটুজ্জের মুখের ওপর এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে সিপাই-সহ দাওয়া ছেড়ে হনহনিয়ে প্রস্থান করল ছোট দারোগা।

সূর্য হালদার দাঁড়ালেন আরো একটু। একটু কাশলেন, একটু হাসলেন। তারপর নরম করে বললেন, আমার তো আগেই মনে হয়েছিল তোমার কোন দোষ নেই, ওদের দারোগা পুলিসের মেজাজ-পত্রই আলাদা। যাক, আজ চলি, মেয়েটার এখন শোকের মুখ, কি করা যায় না যায় পরে কথা হবে।

পরাণ চাটুজ্জে দাওয়ার ওপর নিস্পন্দের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল একসময়। মেঝেয় মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে নন্দিনী বসেছিল চুপচাপ। নীরব দৃষ্টি বিনিময়।

ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম মুখখানা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে পরাণ চাটুজ্জের। ক্রুর

মুখোসটা খসে গেছে! সাদাসিধেভাবেই জিজ্ঞাসা করল, এভাবে আমাকে বাঁচাতে গেলি কেন?

নন্দিনী নিষ্পলক চেয়েছিল। দেখছিল। চেয়েই রইল। দেখল। তারপর ঠাণ্ডা জবাব দিল, প্রতিশোধটা আমি নিজেই নেব বলে।

মুহূর্তে পরাণ চাটুজ্জের দুচোখ থরথরিয়ে উঠল আবার। এই এক কথা বলার ফলেই পাঁচ-পাঁচটা দিন অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছে নন্দিনী। তবু বলেছে। আজ আবারও বলল।

কিন্তু আজ এগোতে গিয়েও পা আপনি থেমে গেল পরাণ চাটুজ্জের। সামনে আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারল না বেশিক্ষণ।

তিন

দিন যায়। বেশ একটা জোরালো গোলযোগের আশঙ্কা করেছিল গাঁয়ের লোক। সূর্য হালদারের মত ডাকসাইটে মানুষ গাঁয়ে থাকতে একজন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে নিয়ে এভাবে বাস করবে কেউ, ভাবা যায় না। প্রকাশ্যে কেউ এগিয়ে না এলেও তলায় তলায় সকলে হালদারমশাইয়ের দিকেই। হালদারমশাই নিজেও জানতেন সেটা। গাঁয়ের মুরুব্বিদের অনেককেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। একসঙ্গে নয়, একে একে। আলাপের ছলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরাণ চাটুজ্জের এতবড় ধৃষ্টতা বরদাস্ত করতে চায় না কেউ, কিন্তু বিহিত যা করার সেটা হালদারমশায়ই করবেন বলে সকলের আশা।

মৃদু হেসে সূর্য হালদার বলেছেন, তোমরা পাঁচ জনে চোখ বুজে থাকলে আমি আর কি করতে পারি।

যাই বলুন, করলে যে কিছু তিনিই করবেন সেটা সকলেই জানে। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত বিত্তের ফলে যত ভারিক্কিগোছের মাননীয় ব্যক্তিই হয়ে উঠুন, হালদারমশাইয়ের শরীরের রক্ত এখনো অতটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। বয়েসও পঞ্চাশের নিচেই এখনো। এভাবে ডেকে গাঁয়ের লোকের মন বোঝা শুধু, নইলে সংকল্প তাঁর ঠিকই আছে বলে বিশ্বাস সকলের। তাঁর বাড়িতে গোপন মন্ত্রণার আভাসও পেয়েছে কেউ কেউ। অপরিচিত মুখের আনাগোনা দেখা গেছে। আর ছোট দারোগার সঙ্গে তো প্রায়ই শলা-পরামর্শ চলে।

এমন দুই শক্তি একযোগ হলে পরাণ চাটুজ্জে বাঁচবে কি?

সরস্বতীর ধারে, পড়ো মাঠের ওধারে রাত দুপুরে হঠাৎ একটা কুটির দাউ দাউ করে জ্বলছে দেখলেও কেউ তেমন বিস্মিত হত না বোধহয়। সাহসে ভর করে ছুটেও আসত না কেউ। যে-যার ঘরের মধ্যেই সেঁধিয়ে যেত আবার, ভোর হলে নতুন বিস্ময়ে রাতের অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনতো।

কিন্তু একটা একটা করে দিন যায়, একে একে মাসও কাবার চার-পাঁচটা, কোনরকম অঘটনের আঁচও দেখা গেল না কোথাও। দিন যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। ছোট দারোগা মহিম তরফদার আর তেমন ঘন ঘন আসে না এদিকে। হালদারমশাই অনেকটাই নিরাসক্ত নির্বিকার। আভাসে ইঙ্গিতে কেউ সে-প্রসঙ্গ

উত্থাপন করলে জবাব দেন, ও-সব নোঙরা ব্যাপারে গিয়ে কাজ কি বলো, গাঁয়ের বাইরেই তো পড়ে আছে বলতে গেলে, আমাদের আর ক্ষতিটা হচ্ছে কি।

ক্ষতি যে নেই সকলেই স্বীকার করেছে। করেছে বটে, কিন্তু মনে মনে পরাণ চাটুজ্জের নীরব প্রতাপের যেন কূল-কিনারা পায়নি তারা। এ-হেন দু'দুজন লোক এমন নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ হয়ে পড়ল কোন্ জাদু শক্তিতে? আড়ালে আবডালে কানাকানি করে কেউ কেউ, পরাণ চাটুজ্জে নাকি দুজনকেই শাসিয়েছে। সূর্য হালদারের বাড়ি থেকে কোন এক রাতে তাকে বেরুতেও দেখেছে দুই-একজন। আর, সন্ধ্যার নিরিবিলিতে মরা সরস্বতীর চড়ায় বসে মহিম দারোগার সঙ্গেও তাকে কথা বলতে দেখার ব্যাপারটা এরপর আর গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না একেবারে।

গুজব নয়।

এক রাতে সূর্য হালদারের সদর দরজা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকেছিল পরাণ চাটুজ্জে। ছোটবেলায় হামেশা আসত। কিন্তু এই আসার সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। হালদার-মশাই বাইরের ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁর দুই-একজন অনুগ্রহ-ভাজনও ছিল সেখানে। সেই সময়ে ঘরের মধ্যে—একেবারে দু'হাতের মধ্যে পরাণ চাটুজ্জেকে দেখে প্রায় চমকেই উঠেছিলেন তিনি। আলবোলার নলটা হাত থেকে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু সেটা বুঝতে দেননি, নিজের ঘরেই ফরাসচৌকিতে বসে আছেন খেয়াল হয়েছে। বিবর্ণ উসকো-খুসকো মূর্তি পরাণ চাটুজ্জের। রাত-জাগা উত্তেজনা আর অত্যাচারের ধকলে যেমন হয়। কিন্তু সেই শুকনো মূর্তির মধ্যেই ধক-ধকে দুটো চোখ অস্বস্তির কারণ হয়েছিল হালদারমশাইয়ের। শুকনো ছাইয়ের নিচে যেন দুটুকরো অঙ্গার জ্বলছে।

—পরাণ যে! কি খবর? হঠাৎ এই রাতে···নন্দিনী ভালো তো?

পরাণ চাটুজ্জে ঘাড় নেড়েছে, ভালো।

আমাকে বলবে কিছু?

পরাণ চাটুজ্জে ঠিক একভাবেই ঘাড় নেড়েছে আবারও। বলবে।

বক্র ইঙ্গিতে ঘরের অন্য লোক বিদায় করেছেন হালদারমশাই। তারপর বলেছেন, বোসো পরাণ বোসো, দাঁড়িয়ে কেন—

পরাণ চাটুজ্জে বসতে আসেনি। বসেওনি। আর একটু সামনে এগিয়ে এসেছে শুধু। তারপর খুব ঠাণ্ডা মুখে বক্তব্য পেশ করেছে। সে কোন গণ্ডগোলে মাথা গলাতে চায় না, নিজের ভিটেতে শান্তিতে কাটাতে চায় শুধু। তার শান্তি-ভঙ্গ যাতে না হয় হালদারমশাই যদি সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখেন ভালো হয়।

হালদারমশাইয়ের ধমনীতে বনেদী রক্তের স্রোত উষ্ণ হয়ে উঠেছিল একটু একটু করে। এই দণ্ডে এত বড় স্পর্ধার সমুচিত জবাব দিতে পারেন। কিন্তু সিংহের গহ্বরে যে লোক এ-রকম নিঃশব্দে ঢুকে পড়তে পারে, কোথাও না কোথাও তারও যে একটা জোর লুকিয়ে আছে সেটা ভুলে যাবার মত মাথা গরম তাঁর কোন দিনই নয়। তবু ঈষৎ ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে শাসাতে এসেছ?

পরাণ চাটুজ্জে মাথা নেড়েছে, শাসাতে আসেনি। বরং তার সেই রাতের সঙ্গীদের ডেকে হালদারমশাই শাসিয়েছেন শুনে এসেছে। তিনি আর ছোট দারোগা মহিম তরফদার তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন এ-কথাও শোনা যাচ্ছে। সে উপস্থিত, হালদারমশাই ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তেই শাস্তি দিতে পারেন।

শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছিল। এই মুহূর্তে উঠে ওর মুখটা পা দিয়ে মাটির সঙ্গে থেতলে দিতে ইচ্ছে করছিল। আরো অনেক কিছু ইচ্ছে করছিল হালদারমশাইয়ের। কিন্তু সেই ইচ্ছের কঠিন রেখাগুলো আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে গেল। পরাণ চাটুজ্জের নিজে থেকে সেধে এসে শাস্তি গ্রহণের ইচ্ছেটা মোটেই আত্মসমর্পণের মত লাগেনি তার। মনে হয়েছে, ওকে শাস্তি দিলেই সব শেষ হবে না। এমন কি এই মুহূর্তে এখানে ওকে একেবারে শেষ করে দিলেও সব শেষ হবে না। নিজের জোরটা তিনি ভালো জানেন, কিন্তু আর একজনের স্পর্ধার উৎসটা একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই ভাবতে হয়। রাগের বশে ছেলেমানুষি করে বসার লোক নন তিনি। মুকুন্দ গোসাঁইয়ের প্রাণটা বেঘোরে কার হাতে খোয়া গেল কে জানে।

হুঁকোর নলটা আবার মুখে তুলে নিয়েছেন হালদারমশাই। গম্ভীর ভারী মুখে হাসির খাঁজ পড়েছে। বিশেষ স্নেহ-ভাজন বয়ঃকনিষ্ঠের উদ্দেশে যে-ভাবে অনুযোগ করা চলে সেইভাবে বললেন, আমাকেও তাহলে এতই পর ভাবো তুমি। বেশ···

পরাণ চাটুজ্জে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার বক্তব্য শেষ হয়েছে, আর দাঁড়াবারও ইচ্ছে নেই।

সূর্য হালদারের বক্তব্য, পাঁচ জনে পাঁচকথা বললে তাদের মুখ তিনি চাপা দেবেন কি করে। তাঁকে আপন লোক ভাবলে উনি নিজে সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর সঙ্গে পরাণের বিয়ে দেওয়াতেন। পরাণের একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ টুঁ-শব্দটি করত না। হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে গলা খাটো করে তিনি আরো কিছু বলেছেন। বলেছেন, শাস্তি তাকে সূর্যি জ্যাঠা দিতে চায় কি কে দিতে চায় তাও জানে না নাকি? মহিমের এত জ্বালা কেন তাও কি বলে দিতে হবে? দিন রাত এসে সে নাকি তাঁর কানে মন্ত্র দিচ্ছে, এর একটা বিহিত করা দরকার।

বলেছেন, সুর্য্যি হালদারের সায় থাকলে এর মধ্যেই পরাণ টের পেত, বেশ ভালো হাতেই টের পেত। কিন্তু পরাণ আপন না ভাবুক তিনি যে ভাবেন— সেখানেই যত জ্বালা। তবু, এই একবারও যে পরাণ তাঁর কাছেই এসেছে তাতেই খুশি তিনি। শাস্তির কথা পরে ভাববেন, আপাতত যে-কোন দরকারে পরাণ যেন তাঁর কাছেই আসে, তাঁকে জানায়।···আর, অমন গোঁয়ারের মত চলাফেরা না করে সে যেন একটু সাবধানে থাকে।

···গুজব নয় সাঁঝের আঁধারে মরা সরস্বতীর চড়ায় বসে মহিম দারোগার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটাও। এই একই দাপটে পরাণ চাটুজ্জে তারও মেরুদণ্ড খানিকটা বেঁকিয়ে দিয়েছিল। নইলে সত্যিই হয়ত যে বিপদ আশা করেছিল, আশঙ্কা করেছিল গাঁয়ের লোকেরা—তাই হত, তাই ঘটত। রাত দুপুরে ঘর-দোর দাউ দাউ করে হয়ত জ্বলেই যেত একদিন।

সন্ধ্যায় যারা তাকে সরস্বতীর চড়ায় ছোট দারোগার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল, ভরা দিন দুপুরে তারা তাকে একেবারে বাঘের ডেরায় হানা দিতে দেখেনি। পরাণ চাটুজ্জে দুপুরেও দেখা করেছে ছোট দারোগা মহিম তরফদারের সঙ্গে। থানায়, তার প্রতিপত্তির আওতার মধ্যে।

সূর্য হালদারের মতই একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছিল মহিম দারোগা। তাঁর মতই ওই শুকনো মূর্তির মধ্যে চাপা আগুন দেখেছিল।

পরাণ চাটুজ্জে জানিয়েছে, নিরিবিলিতে তার সঙ্গে গোটাকতক কথা কওয়ার বাসনা, সন্ধ্যের দিকে একবার সরস্বতীতে এলে ভালো হয়।

এভাবে তাকে নাগালের মধ্যে পাবে ভাবেনি, মহিম দারোগার ক্রুর বাসনাটা অন্য রকম। কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা বোঝা দরকার। না বুঝে কাজ করার রীতি নয় তাদের।

কি কথা?

পরাণ চাটুজ্জে এক কথারই পুনরুক্তি করল, সেটা এখানে হবার নয়, ব্যক্তিগত কথা—সন্ধ্যের দিকে সরস্বতীর ধারে এলে কথা হবে।

ছোট দারোগার সহগুণ আর যাই হোক সূর্য হালদারের মত নয়। হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তোমার হুকুমে আমাকে সরস্বতীতে যেতে হবে কথা শুনতে?

হুকুমে নয়, ছেলেবেলার সঙ্গী হিসেবে তাকে একবার আসতে বলেছে পরাণ চাটুজ্জে।

এও সীমাতীত ধৃষ্টতা। তবু মহিম দারোগা সংযত করল নিজেকে। আবারও জিজ্ঞাসা করল, কি কথা?

পরাণ চাটুজ্জে নিরুত্তর। এইটুকুই বলতে এসেছিল। বলা হয়ে গেছে।

মহিম দারোগার ইচ্ছে করছিল কোথায় সে এসেছে এখনি সেটা বুঝিয়ে দেয়। রুলের গুঁতোয় হাড়-পাঁজর গুঁড়িয়ে কথা বার করে নেয়। ওতে অনভ্যস্তও নয় খুব। কিন্তু অজ্ঞাত আশঙ্কার প্রতিক্রিয়া সর্বত্রই একরকম। তার দিকে চেয়ে চেয়ে সূর্য হালদারের মত সেও পরাণ চাটুজ্জের দুঃসাহসটা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল। এখানে এইভাবে এসে দাঁড়ানোটা কম কথা নয়। অথচ সেই বুকের পাটা আছে দেখছে। কোন্ ভরসায় আছে? কিসের জোরে? মহিম দারোগার সংযত হবার আরো একটা কারণ, বড় শিকারের লোভ। এই চাকরিতে এ-লোভটা মজ্জাগত। এখন চড়াও হলে কোন্ ভাঁওতা দেবে ঠিক কি। তার থেকে জায়গা মত বসলে চার জমলেও জমতে পারে। সামান্য ইঙ্গিত-ইশারা থেকে অভাবিত শিকার জোটে এক-একসময়। এ চাকরিতে অবধারিত উন্নতির রাস্তা সেটা। যা সে করতে চাইছে তা সব সময়েই করা যেতে পাবে, তার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

মহিম দারোগা কথা দিল, সন্ধ্যে নাগাদ সরস্বতীর চড়ায় উপস্থিত থাকবে।

পরাণ চাটুজ্জে চলে গেল।

মহিম দারোগা এসেছিল।

পরাণ চাটুজ্জের কথাটা কি হতে পারে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছে। শেষে ভেবেছে, আর কিছু না হোক, কথাটা যদি তার সঙ্গে আপস সংক্রান্তও হয়, তাতেও লোকসান কিছু নেই। উল্টে লাভ। যে লাভের টানে অনেক সন্ধ্যা অনেক রাত মুকুন্দ গোস্বামীর ঘরে কাটিয়েছে। কত রাত ঘুম হয়নি ঠিক নেই। পরাণ চাটুজ্জে চলে যাবার পর যত ভেবেছে, এই লাভের সম্ভাবনাটাই তত বড় হয়ে উঠেছে। একটা লোলুপ প্রতীক্ষায় বিকেল পর্যন্ত কাটিয়েছে সে।

কিন্তু নিরস্ত্র আসেনি তাবলে। কোমর-বন্ধনীতে প্রকাশ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলিয়ে এসেছে। আর, কোথায় যাচ্ছে থানায় তাও জানান দিয়ে এসেছে। যদিও ভালই জানে, পরাণ চাটুজ্জে এত বোকার মত কোন কাজ করবে না। তবু, সাবধানতা পেশাগত।

সরস্বতীর চড়ায় দুজনে পাশাপাশি বসেছে। কথার সূচনায় লোভে মহিম দারোগার ভিতরটা চকচকিয়ে উঠেছিল। বিনা ভণিতায় পরাণ চাটুজ্জে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কি চাও বলো—

কি চাই মানে! মহিম দারোগার হালকা বিস্ময়।

কিন্তু গোঁজেলটা ওই এক প্রশ্ন ছুঁড়ে মুখ সেলাই করে বসে রইল দেখে নিজেই আবার মুখ খুলল। সমাচার যে সত্যিই খুব কুশল নয়, নির্লিপ্ত মুখে সেই

আভাসই ব্যক্ত করল। বলল, আমি আবার কি চাইব, পাঁচ জনে পাঁচ রকম বলছে, অনেকে অনেকরকম সন্দেহ করছে, হালদারমশাইও তদন্ত-তল্লাস করতে বলছেন, তাছাড়া—

আর সকলের কথা থাক, তোমার অত রাগ কেন, নন্দিনী আমার ঘরে আছে বলে?

সরাসরি স্বার্থের কথায় এসে পৌঁছুতে মহিম দারোগারও আপত্তি নেই। পিচ্ছিল হাসিতে মুখ ভরে গেল, এর পরেই আপসের প্রস্তাবটা আসবে ভাবছে। সেই পথ সুগম করার জন্য ফিরে তেমনি চটুল প্রশ্ন নিক্ষেপ করল, তা নন্দিনী শুধু তোমার ঘরেই এভাবে থাকবে কেন?

স্থির মূর্তির মত খানিকক্ষণ বসে থেকে পরাণ চাটুজ্জে বলল, শুধু আমার ঘরেই থাকবে·· তবে এভাবে থাকবে না বোধহয়।

মুহূর্তে ধৈর্য গেল মহিম তরফদারের। হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল। কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি কথা বলার জন্যে এখানে ডাকা হয়েছে আমাকে?

এই কথাই। পরাণ চাটুজ্জের বলার মধ্যে শঙ্কার লেশমাত্র নেই। ঠিক যেভাবে সূর্য হালদারকে বলে এসেছিল তেমনি করেই বলল, আমি আমার ভিটেতে শান্তিতে থাকতে চাই—কোন রকম অশান্তি হোক সেটা আমি চাইনে, নিজেরও না অপরেরও না।

শিরায় শিরায় রক্ত ফুটে উঠল মহিম দারোগার। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে।—রাস্কেল! এই কথা বলতে তুমি এখানে ডেকে এনেছ আমাকে?

হ্যাঁ। উঠে দাঁড়াল পরাণ চাটুজ্জেও। আরো ঠাণ্ডা, আরো নির্বিকার।—তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, ইচ্ছে করলে এই আঁধারে এক্ষুনি একেবারে যম-দোরে পাঠিয়ে দিতে পারো তুমি আমাকে। লাশটা টেনেটুনে একটু ভিতরে নিয়ে ফেলে দিলেই রাতের জোয়ারে ভেসে যাবে—কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। আর, তারপরে নন্দিনীর কি হল না হল আমিও দেখতে আসব না।

অন্ধকারেও তার শাদাটে চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিল মহিম দারোগা। বক্তব্যটা ওখানেই শেষ নয় জেনেই থমকে তাকিয়েছিল। একটু থেমে পরাণ চাটুজ্জে কথাটা শেষ করল এবারে। বলল, কিন্তু তারপরে হয় সরস্বতীর জলে নয়তো চুনিগাঁয়ের মাটির তলায় আর একটা লাশও হারিয়ে যাবে—কেউ টের পাবে না। আর, তখন তোমার বউ ছেলেপুলের কি হল না হল তুমিও দেখতে আসবে না। এই কথাটাই তোমাকে জানানো দরকার মনে করলাম।

ক্রোধে বিস্ময়ে মহিম তরফদার স্তব্ধ খানিকক্ষণ। গাঁজা-খোর পরাণ চাটুজ্জে এই ভাবে এই গলায় এমন কথা বলতে পারে সেটা যেমন আশ্চর্য, তার মত ডাকসাইটে

দারোগাকে ডেকে এনে কেউ এভাবে শাসাতে পারে সেটাও তেমনি অবিশ্বাস্ত। শাসাতে পারে না কেউ, শাসায় না, কিন্তু শাসালে কি হয় ছোট দারোগা মহিম তরফদারই তার জলজ্যান্ত নজির। এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলে কুকুর বেড়ালের মতই শেষ করে দিতে পারে তাকে, ইচ্ছে করছেও। আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারে তারা, করে থাকেও। কিন্তু সেই নির্মম ইচ্ছেটা দমন করতে হল। অন্যের বিপদ যারা সহজে ঘটাতে পারে, নিজের বিপদ সম্বন্ধে তারাই সজাগ, সতর্ক বেশি। বুকের পাতাল থেকে যে হিংসা ছোট দারোগার একটা হাত কোমর-বন্ধনীর দিকে ঠেলে দেবার উপক্রম করেছিল, আর একটা পাল্টা হিংসার ভয়ে সেটাই আবার বিবরে প্রত্যাবর্তন করল।

তারপর যে পদক্ষেপে সে সরস্বতীর চড়া ছেড়ে চলে গেল, মনে হবে, অচিরে এই লোকটার বুকের ওপর দিয়ে ঠিক অমনি করেই মাড়িয়ে যাবে সে। আজ নয়, খুব শীগগীর। আর একদিন।

সেই আর একটা দিন এখনো আসেনি।

পাঁচ-ছ'মাস হয়ে গেল সুনির্বিঘ্নে প্রায় অপরিচিত লোকের মতই গাঁয়ের ওই একপাশে বসবাস করছে পরাণ চাটুজ্জে।

কেউ কোন ব্যাপারে ডাকেনি তাকে, ডাকুক সেও সেটা চায়নি। ডেরা থেকেও বেরোয়নি বড়। যাও বেরিয়েছে, গাঁয়ের পথ মাড়ায়নি। সরস্বতীর চড়া ধরে এসেছে, গেছে।

কিন্তু তা বলে তার খবর কি রাখে না কেউ? সবাই রাখে। সে সব খবর প্রত্যক্ষগোচর নয় বলেই চাপা উত্তেজনার খোরাক জোগায় আরো বেশি। নন্দিনী অন্তঃসত্ত্বা সেটা পুরনো খবর। সম্প্রতি সজাগ হবার মত খবর হল, পরাণ চাটুজ্জে বিয়ে করবে নন্দিনীকে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাবড়ে গেছে অনেকে। এত বড় অনাচারের পর এই শেষ সময়ে বিয়েটা শুধু সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার তাগিদে বলেই ধরে নিয়েছে সকলে। এ কেমন বিয়ে, কেমন ধারা বিয়ে? হিন্দুমতে বিয়ে, না তান্ত্রিকমতে বিয়ে, না কি বৈষ্ণবমতে? ব্রাহ্মণপাড়ার ব্রাহ্মণদের মুখ শুকালো। পৌরোহিত্য যজমানী করেন যাঁরা তাঁদেরও মুখ শুকালো—সমাজিক আমন্ত্রণ এলে বা অনুষ্ঠান পালনের ডাক পড়লে তো বিড়ম্বনার একশেষ। যাবেন কেমন করে? আর, এড়াবেনই বা কোন্ ভরসায়?

আমন্ত্রণও এলো না, ডাকও পড়ল না।

ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি। ফাঁড়া কাটলে কানাকানি মিষ্টি।

বিয়েটা হয়েই গেল তাহলে। স্বস্তি। ব্রাহ্মণ পরাণ চাটুজ্জে হিন্দু আচারেই কন্যা গ্রহণ করেছে। কোন্ ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে দিয়ে গেলেন কে জানে। এ গাঁয়ের নয়। আর, কারাই বা সব এলো গেলো? তাও কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই, নিশ্চিন্তে বসে মুচকি হাসা যাচ্ছে সেটাই লাভ। এত কাণ্ডর পর এর আর দরকার ছিল কি? ঘি দিয়ে নিমপাতা ভাজলেও জাতের ধাত বদলাবে? তোকে আর জানতে বাকি কার? আর মেয়েটাকেও বলিহারি যাই—সবদিক মজিয়ে একেবারে ফলবতী হয়ে শেষে কুমারী কন্যা সেজে বিয়ে বসলি।

মেয়েটার প্রতিই ঘৃণা আব বিতৃষ্ণা বেশি। অমন মেয়ে যে বুকের মধ্যে এমন নরক পুষত কে ভাবতে পেরেছে। বাপের অপঘাত মৃত্যুতে একটুখানি লোক দেখানো শোক করা দূরে থাক, একেবারে শ্মশান থেকেই সরাসরি পর-পুরুষের ঘরে গিয়ে উঠেছে। মুকুন্দ গোস্বামী মরে বেঁচেছে, নয়তো ওই সাপিনী মেয়ে নিজেই একদিন বাপকে ঠিক দংশে মারত। এই মন্তব্য গাঁয়ের লোক সেই দিন থেকেই করে আসছে, যেদিন সূর্য হালদার আর মহিম দারোগাকে পরাণ চাটুজ্জের কুঁড়ে থেকে বলতে গেলে গালে চড় মেরে তাড়িয়েছিল মেয়েটা। ব্যাভিচাব অনেক দেখেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া ব্যাভিচার কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি।

সকলের বিশ্বাস বাপেব চোখেও ধুলো দিয়ে আসছিল ওই মেয়ে। দিনে দুপুরে পর্যন্ত বাড়িতে নাগর নিয়ে রঙ্গরস করত—একদিন শুধু ধরা পড়েছিল, যার ফলে খড়মের ঘায়ে আধমরা হয়েছিল পরাণ চাটুজ্জে। আশ্চর্য, কি সতীপনাব অভিনয়ই না করেছিল মেয়েটা সেদিন! বাপ ওভাবে লোকটাকে পিটবে জানলে কি করত কে জানে।

এ-সব আলোচনা এবং সিদ্ধান্তে একমত সকলেই।

রটনার কিছু মাত্র সত্যি হলেও সব থেকে খুশি হত সম্ভবত পরাণ চাটুজ্জে নিজেই। গাঁয়ের খবর বাতাসে ফেরে বটে, কিন্তু দু'জনের জীবনযাত্রার অন্দর মহলের যে-খবর বাইরে পৌঁছয় না, সেটাই দিনে দিনে স্নায়ুর ওপর চেপে বসেছে তার।

সেখানে পরাণ চাটুজ্জেব দোসর নেই কোন। সেখানে ভয়াবহ রকমের একা সে।

যা সে চেয়েছে, তাই হয়েছে। তার কোন ইচ্ছের এতটুকু প্রতিবাদের আভাস পর্যন্ত দেখেনি। দেখলে খুশি হত, নন্দিনীকে একটু অন্তত সজীব মনে হত। কিন্তু

হিংস্র আক্রোশে বারবার আদিম নখদন্ত বিদারণ করেও তার ওই নিথর নিষ্প্রাণতায় একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারেনি। জড় পদার্থের ওপর আঘাত করলে যেমন তেমনি হয়েছে। তেমনি হচ্ছে। নিজেরই লাগছে ফিরে।

নন্দিনী ঘরের কাজ করে। রান্নাবান্না করে। তাকে খেতে দেয়। নিজে খায়। প্রথম প্রথম অবিশ্বাস করত পরাণ চাটুজ্জে। পোষা বিড়াল আছে দুটো, খাবার সময় তাদের ডাকতে হয় না, নিজেরাই ছুটে আসে। অন্ন-ব্যঞ্জন সব সে-দুটোকে আগে খাওয়াতো। পরে নিজে খেত। কিন্তু শেষে এমন দাঁড়ালো যে, অন্ন-ব্যঞ্জনে নন্দিনী বিষ মেশালেও পরাণ চাটুজ্জে ক্ষমা করতে পারত। বিড়াল দুটো মরলেও প্রতিশোধ-পরায়ণা নারীর মধ্যে প্রাণ-বস্তু আবিষ্কার করা যেত। খেয়ে-দেয়ে বহাল তবিয়তে বিড়াল দুটোকে তপস্বীর মত মুখ গুঁজে বসে থাকতে দেখেও পরাণ চাটুজ্জের মাথায় খুন চাপত। এক-একদিন আচমকা আঘাতে আর্তনাদ করে ছুটে পালাতো বিড়াল দুটো।

আজও না পাওয়ার মতই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে কামনা'র আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে পরাণ চাটুজ্জের। নন্দিনী সন্তান-সম্ভবা। তারই সন্তান বহন করছে। তবু মিলনের সন্তান নয়। সেই প্রথম দিনের মতই নির্মম নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নন্দিনীর। নিষ্প্রাণ, শান্ত।

পরাণ চাটুজ্জে হঠাৎ একদিন বলল, বিয়ে হবে।

নন্দিনী দাঁড়িয়ে শুনল। বাধা দিল না। একটি কথাও বলল না। বিয়ে হয়ে গেল।

তার মাস তিনেকের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মেয়ে। মেয়ে বড় হতে লাগল। পরাণ চাটুজ্জে মেয়ের নাম রাখল বাসনা। মনে মনে খুশি একটু। মেয়েটা মায়ের মতই দেখতে হয়েছে অনেকটা। দু'হাত বাড়ালে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মায়ের মত যে মেয়ে দেখতে, সেই মেয়ে।

এরপর আর এক চেষ্টায় মন দিল সে। পাশেই আর একটা ঘর তুলে গানের আসর বসালো। এতদিনের মধ্যে নন্দিনীর গলায় গানের একটু গুনগুনও শোনেনি। সে বাজাতো আর নন্দিনী গাইত এ-যেন এক বিস্মৃত অধ্যায়। প্রথম যেদিন গানের আসর বসবে, পরাণ চাটুজ্জে কষে গাঁজায় দম দিয়ে নিল সেদিন। গানের সঙ্গে বাজনায় পাল্লা দেবার জন্য আগে যে-ভাবে প্রস্তুত হত, সেইভাবেই প্রস্তুত হল। পরাণ চাটুজ্জে কথা দিয়েছিল গাঁজা খাওয়া ছাড়বে, কিন্তু ছাড়েনি। কেনই বা ছাড়বে। নন্দিনীকে পেলে ছাড়ত। নন্দিনীকে সে পায়নি, অধিকার করেছে। জোর করে দখল করে আছে। নন্দিনী বললে আজও এক কথায় ছেড়ে দিতে পারে

হয়ত। কোনদিন আর তা বলবে না জানে। তাকে আক্কেল দেবার জন্যই পরাণ চাটুজ্জে গাঁজার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে।

কিন্তু হুকুম করে বা চোখ রাঙিয়ে নন্দিনীকে গানের আসরে আনা গেল না। পরাণ চাটুজ্জে শ্রোতা সংগ্রহ করেছিল দু'পাঁচ জন। একটু-আধটু গাইতে পারে এমন লোকও এসেছে। আনন্দের ঘ্রাণ পেলে ছুটে আসার লোক সব সময় সর্বত্র মেলে। এখানে আনন্দ ছাড়া কৌতূহলও প্রবল।

নন্দিনীকে যেভাবে আসরে এনে ঠেলে ফেলা হল, দেখে আনন্দ কৌতূহল দুই-ই উবে গেল সকলের। কাঠ তারা। তাকে দেখে আঁতকেও উঠল অনেকে। এ কি চেহারা হয়েছে মেয়েটার! সেই নন্দিনী বলে চেনা দায়। সেই প্রথম তাদের মনে হল এখানকার সমাচার সরল নয় খুব। তাঁরা যা ভাবত তার মধ্যে ভুল আছে, ফাঁক আছে।

রাগে আর গাঁজার ঝোঁকে পরাণ চাটুজ্জের দু'চোখ আগুনের গোলা। খোলের ওপর দুটো প্রচণ্ড চাঁটি মেরে যে লোকটা গাইতে পারত একটু-আধটু ; কর্কশ স্বরে তাকে আদেশ করল, নে ধর্—

লোকটা প্রাণের দায়ে গান ধরল। মানভঞ্জনের গান। কিন্তু সকলের কানের পরদায় আর্ত কান্নার মত বিঁধতে লাগল সেই গান। অসহিষ্ণু পরাণ চাটুজ্জের হাতের ঘায়ে খোলটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। তারপর মাঝখানেই হঠাৎ ঝপ করে থেমে গেল সে। নন্দিনীর চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে ঘরে টেনে নিয়ে এলো আবার।

পরদিন থেকে আর শ্রোতা জুটল না, গায়ক তো নয়ই। কিন্তু পরাণ চাটুজ্জের শ্রোতার দরকার নেই, গায়কেরও না। গান নন্দিনীকে দিয়েই করাবে। সে বাজাবে, নন্দিনী গাইবে। আগের মত না পারুক, যেমন পারে তেমন গাইবে। তবু গাইবে।

উপর্যুপরি পাঁচ-সাতদিন ধরে নির্যাতন চলল। কিন্তু নন্দিনীর গলা দিয়ে গান ছেড়ে একটু কান্নার শব্দও বেরুলো না।

মনে মনে পরাণ চাটুজ্জে হাল ছাড়ল।

হাল ছাড়লেও হার মেনে বসে থাকার লোক নয় সে। এই আসর উপলক্ষ করেই গাঁয়ের লোক দু'পাঁচজন এসেছিল। আসতও। আবারও যাতে আসে সেই ব্যবস্থাই করল সে। আরো একখানা ঘর তোলা হল। ঘর একখানা ছেড়ে দশখানাও তোলা যেতে পারে। ডাইনে বাঁয়ে সব জমি পরাণ চাটুজ্জের।

সেই ঘরে বাস করতে এলো চারু বোষ্টুমী।

ভিন গাঁয়ের সুকণ্ঠী চারু বোষ্টুমীকে চিনত অনেকেই। চুনিগাঁয়েও অনেকবার এসে গান গেয়ে গেছে। রূপসী নয় এমন কিছু, তার ওপর বয়সের দাগ স্পষ্টতর হয়ে

উঠেছে। কিন্তু ঢং-ঢাং জানে ভালো, গান তো ভালোই গায়। গানের রসঘন, প্রত্যাশার মুহূর্তটি ঠারে ঠমকে নিবিড় করে তুলতে জানে। মুখ টিপে হাসতে জানে। চোখ দিয়ে চোখ টানতে জানে।

চারু বোষ্টুমীর সুনাম না থাকুক, কদর আছে।

পরাণ চাটুজ্জের আসর আর ঠেকায় কে।

তিন বছরের ছেলে নিয়ে নতুন কুটিরে পাকা বাসিন্দা হল সে। কোন্ সর্তে আর কোন্ চুক্তিতে তারাই জানে। কিন্তু চুক্তি খুব কড়া নয় বোধহয়। কারণ, চারু বোষ্টুমীর ঘরে অচেনা দু'পাঁচজন সঙ্গীত রসিকের আনাগোনায় পরাণ চাটুজ্জেকে আপত্তি করতে দেখা যায়নি কখনো। সান্ধ্য আসর প্রায় নিয়মিত বসতে লাগল। নন্দিনীর আসর দেখে যারা ভয় পেয়ে সরে গিয়েছিল তারাও এলো আবার। তাদের সঙ্গে একে একে আরো অনেকে।

শেষে সূর্য হালদারও এসে হাজির এক সন্ধ্যায়।

সকলের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পরাণ চাটুজ্জেকে শুনিয়ে বললেন, নামের মায়া ছাড়া কি সহজ, কোথাও নাম হচ্ছে শুনলে আর স্থির থাকতে পারিনে·· সেই মুকুন্দ যাবার পর থেকে কানে আর তেমন করে নাম ঢোকেনি।

নাম শোনার তাগিদে চারু বোষ্টুমীর কাছাকাছি এসে বসলেন তিনি।—তুমি থামালে কেন হে পরাণ, বেশ তো বাজাচ্ছিলে, আর এ-ও গাইছিল বেশ—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে শুনছিলাম, শেষে বাইরে আর থাকা গেল না। গাও গাও, নামের আসরে ছোট বড় নেই, সব সমান।

সবে গাঁজায় দম' দিয়ে আসরে এসে বসেছিল পরাণ চাটুজ্জে। হাত দুটো তার চনমনিয়ে উঠল একসঙ্গে, খোলটা গমগমিয়ে উঠল। চারু বোষ্টুমী চোখ বুজে গান করে না নন্দিনীর মত। সেই চোখ সূর্য হালদারের মুখের ওপর ফেলে রেখেই অসমাপ্ত গানের খেই ধরে সে নাম ছড়াতে বসল আবার।

'কানুর প্রেমে লাজ নাই গো
কানু বিনা প্রাণ নাই,
(আর) কানু ছাড়া নাম নাই গো।
কানু বিনা গান নাই।'

পরাণ চাটুজ্জের এবারেও মেয়ে হল একটা। ভরা সময়ের অনেক আগেই এসেছে মেয়েটা। তাই এলো যখন, না বোঝা গেল আকার, না রং। দগদগে একটা রক্তের

ঢাকা, তার মধ্যে ধুকপুকুনি একটু। মেয়েটা বাঁচবে ভাবেনি পরাণ চাটুজ্জে। বাঁচুক মরুক, নন্দিনী নির্বিকার।

ওই রক্তের টুকরোকে মনুষ্য আকারে নিয়ে আসার একটু-আধটু চেষ্টা কেউ যদি করে থাকে, করেছে চারু বোষ্টুমী। সময়ে মেয়েটাকে এক ফোঁটা বুকের দুধ পর্যন্ত দেওয়া হয় না বলে নন্দিনীকে রোজ গালিগালাজ করেছে। এমন পটের পুতুল সোহাগীকে মরদটা গলা টিপে মেরে ফেলে না সেই ক্ষোভও প্রকাশ করেছে। অবশ্য পরাণ চাটুজ্জের সামনে নয়। লোকটা আগের মত সর্বক্ষণ ঘরে বসে থাকে না আর। কাজেই মেয়ে নিয়ে তিক্ত-বিরক্ত চারু বোষ্টুমীর মনের সাধে গাল দেবার অবকাশ মেলে। তা'হলেও পরাণ চাটুজ্জের সামনে কর্কশ কথা পারতপক্ষে বলে না। ভয়ে নয়। বললে রসের হানি। তাই পেশারও। রস-পরিবেশনের বায়না নিয়ে এসেছে যে, অপ্রিয়-বচনও তাকে সুরসিকার মতই বলতে হবে। বললে সেই রকম করেই বলে। রঙিয়ে রসিয়ে কৌতুকের ধার মিশিয়ে।

কিন্তু মনে মনে যত বিরক্ত হোক আর নন্দিনীকে যত গালই দিক, নাইয়ে খাইয়ে ছোট মেয়েটাকে বাঁচার রাস্তায় গড়িয়ে দিলে চারু বোষ্টুমীই। বাইরের লোক ছেড়ে, বলতে গেলে পরাণ চাটুজ্জেও নিজের মেয়েকে আবিষ্কার করল মাস ছয় বাদে।

আবিষ্কার করে অবাক একেবারে।

রঙের রক্ত আগুনের রঙে দাঁড়িয়েছে। এক মাথা কোঁকড়া চুল। মুখের আদল খানিকটা মায়ের মত আর বড় মেয়ে বাসনার মত। আর, খানিকটা অন্যরকম। কিন্তু সেই অন্যরকমটুকু ভারী চেনা চেনা যেন। শেষে চারু বোষ্টুমীর মুখে শুনেছে কার মত। আসরে আরো কেউ কেউ মেয়ে দেখে সেই কথাই বলেছে। বলেছে, মেয়ের আগুনপানা রঙটা নিজস্ব, নাক চোখ হাতের আঙুল মায়ের মত, আর ঠোঁট আর চিবুক হুবহু বাপের মত। মেয়ের মুখে বাপ আর মায়ের মুখ মিশিয়ে বসানো।

রঙ দেখেই পরাণ চাটুজ্জে এই মেয়ের নাম রাখল স্বাহা। সকলে বললে, এই মেয়ের এই একটা নামই হতে পারে।

এরপর অবকাশ সময়ে পরাণ চাটুজ্জে চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখত মেয়েটাকে। আদর যত্ন করত। তারও মনে হত, কথাটা মিথ্যে নয়, তাদের দুজনেরই স্বাক্ষর আছে এই মেয়ের মুখে। মেয়ে বড় হলে দেখতে কেমন হবে সেটা যেন এখনই আঁচ করতে পারে পরাণ চাটুজ্জে। অবশ্য মেয়ের রূপ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আসরানুরাগীদের মুখে শুনেছে। সকলেই আদর করে আর বলে, ছোট মেয়ে তোমার মেয়ের মত মেয়ে হবে পরাণদা, দেখে নিও।

সেদিন মেঝেয় শুয়ে ছিল মেয়েটা, নন্দিনী অদূরে মেঝেতে বসে চুপচাপ। মেয়েটা হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছিল। পরাণ চাটুজ্জে ঘরে এসেছিল, হাঁটু মুড়ে বসে মেয়েকে খেলা দিল খানিক। তারপর নন্দিনীকে শুনিয়ে বলল, সবাই বলে এই মেয়েটা তোর আর আমার দু'জনের মত দেখতে হয়েছে।

সময়ে অনেক সয়। পরাণ চাটুজ্জের মেজাজও আজকাল আর সারাক্ষণ তেতে থাকে না অতটা। নন্দিনীর সাড়া বা জবাব না পেলেও এ-রকম অনেক সময় অনেক কথা বলে সে। নন্দিনী শুনল কি না তাও বোঝা যায় না, কিন্তু তার জন্য আগের মত তেমন আর তপ্ত হয়ে ওঠে না পরাণ চাটুজ্জে। বলার ভাগ বলে।

কিন্তু আজ এই সামান্য কথায় হঠাৎ একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল।

নন্দিনী মুখ তুলে শুনল। শুনে তার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। দূর থেকেই মেয়েকে দেখল একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কে বলে?

পরিবর্তনটুকু আগে লক্ষ্য করেনি পরাণ চাটুজ্জে। প্রশ্ন শুনে চকিতে ঘাড় ফেরালো তার দিকে। একই বছরের মধ্যে ক'টা কথা শুনেছে ওর মুখে হাতে গুণে বলে দিতে পারে। এই জন্যই ওকে কম নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি তার হাতে। কিন্তু নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক পাঁচ কথার জবাবে নন্দিনী একবার মাথা নাড়ে কিনা সন্দেহ। যা বলে চুপচাপ শোনে, আর যা করতে বলে করে দেয়।

তাই নন্দিনীর মুখের এই সামান্য কথা পরাণ চাটুজ্জের কাছে সামান্য নয় মোটেই। মেঝের ওপরেই বসে পড়ে সাগ্রহে ঘুরে বসল সে। —সন্ধ্যের গানে যারা আসে সকলেই বলে, সবাই কত কাড়াকাড়ি করে আদর করে তোর মেয়েকে দেখলি না তো—

আস্তে আস্তে উঠে নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়াল। নির্নিমেষে মেয়েকে দেখল চেয়ে চেয়ে। তারপর মেয়ের বাপের মুখের দিকে তাকালো। সজ্ঞানে দেখছে না যেন। পরাণ চাটুজ্জের মুখের ওপর থেকে দুচোখ আবার মেয়ের দিকে গেল। দেয়াল-খুপরি থেকে ছোট আয়নাটা তুলে নিয়ে নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়াল আবার। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল চেয়ে চেয়ে। পরে আবারও মেয়েকে।

বিস্ময়ে আনন্দে পরাণ চাটুজ্জে কাণ্ডকারখানা দেখছে তার। নন্দিনীর দুচোখ এবার তার মুখের ওপর এসে থামতে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখলি, দু'জনের মত নয়?

নন্দিনী অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল একটু। আনমনা হলেও নন্দিনীর মুখে এই প্রথম হাসির আভাসের মত দেখল।

এটুকুই যেন মস্ত প্রাপ্তি পরাণ চাটুজ্জের। খুশি মুখে বলল, মেয়ে তো ডাকসাইটে সুন্দরী হবে দেখিস, তোর আমার দু'জনের মত কিনা, বড় মেয়েটা আমার কিছু পায়নি—

ছোট মেয়ে স্বাহাকে কোলে করে সেই দিনই নন্দিনী এই প্রথম চারু বোষ্টুমীর ঘরে এসে দাঁড়াল। মেঝেয় বসে বোষ্টুমীর ছেলে নন্দ আর নন্দিনীর বড় মেয়ে বাসনা খেলা করছিল। বাসনা থপ-থপিয়ে হাঁটতে চলতে শিখেছে। ফাঁক পেলেই এখানে চলে আসে। নন্দ বছর দেড়েকের বড় তার থেকে, নাদুসনদুস দুরন্ত ছেলে। ওর মা বলে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বজ্জাতির বাসা। সেই ছেলে গোটা আঙিনা চষে বেড়ায়, কিন্তু ভুলেও বাসনাদের ঘর মাড়ায় না কখনো। গোড়ায় গোড়ায় তার মা আগলে রাখত, এখন আর তার দরকার হয় না। সাথীর নিতান্ত অভাব বোধ করলে নন্দ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে ডাকে বাছনা, খেলবি আয়—নন্দ ডাকছে। কিন্তু বেড়ার ওধারে পা দেয় না।

দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটির ফাঁকেও ছেলেটা নন্দিনীকে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ে, দু'চোখ টান করে দেখে দূর থেকে। চোখাচোখি হয়ে গেলে ছুটে পালায়। ছেলেকে আগলে রাখতে না পেরে ভয়টা তার মা-ই ঢুকিয়েছে। বলত, খবরদার যাবি না, ধরতে পারলেই তোকে জল দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলবে। চারু বোষ্টুমী কেন ভয় দেখাতো সেই জানে। চাইত না ছেলে ওখানে যাক। ছেলের বায়নায় স্বাহাকেই যখন-তখন এখানে নিয়ে আসতে হয়। দুরন্ত ছেলেটার ভারী লোভ ননীর মত মেয়েটাকে ধরে মনের সাধে চটকায়। কিন্তু তাহলেও নাকি তার মা তাকে জল দিয়ে গিলে খাবে। তবু ফাঁক পেলে ওই ছ'মাসের মেয়েটাকে তুলে নিজের পেটের সঙ্গে সাপটে ধরে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়ায় ছেলেটা। চারু বোষ্টুমী বলে, ওই এলো ওর মা—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে রেখে শান্ত একেবারে। রাখার ধাক্কায় মেয়েটা হয়ত তারস্বরে কেঁদে ওঠে। খুদে নন্দ ঘরের ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে কেউ তাকে গিলতে আসছে কিনা। তারপর বেগতিক দেখে মেয়েটার মুখ চাপা দেয়, কান্নার শব্দটা যেন ওই কুটীর পর্যন্ত না পৌঁছয়। ফলে মেয়েটার দম বন্ধ হবার দাখিল এক-সময়।

এ-হেন বিভীষিকাময়ীকে একেবারে ঘরের মধ্যে দেখে দুরন্ত নন্দ ভয়ে কাঠ একেবারে। নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। শুধু ও নয়, নিজের মেয়ে বাসনার কাছেও নিতান্ত অস্বাভাবিক লাগল ব্যাপারটা। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সে-ও।

চারু বোষ্টুমীও তেমনি অবাক।

মুখে কথা নেই খানিকক্ষণ। তারপরেই বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল একেবারে। কার মুখ দেখে উঠেছে বা সূর্য কোন্ দিকে উঠেছে তরল উচ্ছ্বাসে সেই সংশয়। চাটাই পেতে বসতে দিল, নিজেও বসল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই আকস্মিক আবির্ভাবের দরুন উতলা একটু চারু বোষ্টুমীও।

ছেলেটা উঠে পালিয়েছে ততক্ষণ। তার পিছনে ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটিও। নন্দিনী বসল। কোলের মেয়েটাকে সামনে শুইয়ে দিল। তারপর বলল, মেয়ে কার মত দেখতে হয়েছে বলো দেখি

প্রশ্ন শুনে চারু বোষ্টুমী হতভম্ব। নন্দিনীর উদ্‌গ্রীব চোখে চোখ পড়তে মনে হল, তার একটা জবাবের পরেই যেন অনেক কিছু নির্ভর করছে। মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিল কিনা চকিতে সেই সন্দেহ হল। কিন্তু না, আজ বরং সুস্থ মনে হচ্ছে ওকে, স্বাভাবিক লাগছে।

নন্দিনী আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমরা নাকি বলো আমাদের দু'জনের মত দেখতে হয়েছে ?

জবাবের সুতোটা এবারে ধরে ফেলল চারু বোষ্টুমী। মেয়ের সামনে বসে আনন্দে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দিল সে, মেয়ের কোন-অঙ্গ হুবহু নন্দিনীর মত, আর কোন-অঙ্গ হুবহু বাপের মত। শেষে তাকে খুশি করার জন্যই তরল মন্তব্য করল, এখন চেহারাটা অমন দুমড়নো পাকানো হলে কি হবে, নতুন বয়সের কালে চেহারাটা ভালোই ছিল বলতে হবে গোসাঁইয়ের। সেই ভালোটুকুই মেয়ের মধ্যে এসেছে। নন্দিনী হাসছে একটু একটু। তার মুখে হাসি এই প্রথম দেখল চারু বোষ্টুমীও। তুষ্টির হেতু বুঝল না, আর নিজেও কেন জানি পরিতুষ্ট হল না খুব। তবু হাসি-মুখেই ঠাট্টা করল আবার, বড় মেয়েটা তোমার আদল পেয়েছে খানিকটা, এই মেয়েটা তোমাদের দু'জনের, এর পরে যেটা আনবে সেটা শুধু গোসাঁইয়ের মত হবে দেখতে। সমান সমান ভাগ—

লঘু কৌতুকের কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু তবু শোনামাত্র নন্দিনী বিমূঢ়-মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে। যা সে ভাবেনি কখনো অথচ ভাবার মত, এমন কোন কথাই শুনল যেন। কি বলতে কি বলে ফেলল ভেবে মনে মনে চারু বোষ্টুমী নিজেই ঘাবড়ে গেল আবার।

নন্দিনী চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে পরাণ চাটুজ্জে এসে হাজির। পিছনের জঙ্গলের ছায়ায় বসে বাঁশ চাঁছছিল। মেয়ে কোলে করে নন্দিনীকে বোষ্টমীর ঘরের দিকে যেতে দেখেছে। ঘরে ঢুকতেও দেখেছে।

ও এসেছিল দেখলাম···?

চারু বোষ্টুমীও নিবিষ্ট মনে ভাবছিল কিছু।

সামলে নিয়ে সহজ-মুখেই অভ্যর্থনা জানালো, বোস, অত হাঁপাচ্ছে কেন—খারাপ খবর কিছু নয়।

পরাণ চাটুজ্জে সত্যিই হাঁপাচ্ছিল না, তবে আগ্রহ গোপন করতে পারছিল না সেটা ঠিক। বিরক্তি চেপে আবার জিজ্ঞাসা করল, কেন এসেছিল ?

ছোট মেয়ে তোমাদের দুজনের মত দেখতে হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে।

পরাণ চাটুজ্জের চোখে নীরব প্রতীক্ষা, আরো কিছু শুনতে চায়। চারু বোষ্টুমী মুখ টিপে হাসতে লাগল, তারপর বলল, মেয়ের মুখে তোমাদের দুজনের মুখ ভাগাভাগি করে বসানো বলতে খুশি হয়ে চলে গেল।

খুশি হয়ে চলে গেল পরাণ চাটুজ্জেও।

নন্দিনীর খুশির কারণটা সুস্থ বা স্বাভাবিক কিনা তাও জানে না। এই একই প্রসঙ্গে ওর মুখ থেকে দীর্ঘ দিনের একটা নির্লিপ্ত অথচ কঠিন ছায়া অপসৃত হতে দেখেছে নিজের চোখে। চমক-ভাঙা তন্ময়তায় সেই প্রথম যেন মেয়েকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। যত অস্বাভাবিকই হোক, ওই পরিবর্তনটুকুই সুবাঞ্ছিত পরাণ চাটুজ্জের কাছে। সে শুধু ভাবল, মেয়েলি সংস্কার বা বিশ্বাসের ব্যাপার হবে কিছু একটা।

সানন্দে বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে উঁকি দিল সে। যা দেখল, তাও আবার প্রত্যাশিত নয় খুব। মেয়েটা মেঝেয় শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে তারস্বরে কাঁদছে। তার সামনেই নন্দিনী বসে আছে নিষ্পলক মূর্তির মত। এই জগতেই নেই যেন আর, মেয়ের কান্না কানে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। কিছু একটা ভাবনায় তন্ময় একেবারে।

কি ভেবে পরাণ চাটুজ্জে ঘরে ঢুকল না। চুপচাপ বাইরে চলে এলো। একদিনে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাওয়াটা সঙ্গত বোধ করল না সে। এটুকুই সুলক্ষণ। নন্দিনী এবার বদলাবে বোধহয়।

গানের আসরটি অন্যদিনের থেকে বেশিই জমেছে আজ। চারু বোষ্টুমী রোজই একটু-আধটু প্রসাধন করে আসরে এসে বসে। সেই প্রসাধনে বয়সের দাগ কিছুটা ঘোচে। বাকিটুকু মিলায় ঠোঁটের হাসিতে, চোখের কটাক্ষে আর রং-মাতান গানের তরঙ্গে। কিন্তু আজ এটুকু ছাড়া আরো কিছু ছিল। শুকনো শিউলি-বোঁটার গুঁড়ো গায়ে মেখে চান করেছে। মাথায় সুবাসিত তেল মেখে সিঁথির দুপাশে সযত্নে পাতা কেটেছে। অনেক যত্নে চন্দনের ফোঁটা কেটেছে, দুই গালে খুব হালকা করে লাল চন্দনের আভাস মিশিয়েছে। খোঁপায় বেলের মালা জড়িয়েছে, গলায় মোটা গোড়ের মালা পড়েছে। পক্ষ্মরেখায় চুলচেরা কাজল টেনেছে, দুই ঠোঁট তাম্বুলে রাঙা। হাঁটু মুড়ে দুলে দুলে গাইছে চারু বোষ্টুমী :

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি ;
চূড়া বেন্ধে যাব চলে যেথা কমল আঁখি।

অঙ্গের দোলায় আর ভ্রূ-ভঙ্গিতে বঁধু সন্নিধান যাবার ঢেউ তুলেছে চারু বোষ্টুমী। তাম্বুল-রাঙা অধরে হাসির ঝলক, কটাক্ষে বিদ্যুৎ। খোলের কাছ ঘেঁষে পরাণ চাটুজ্জের মুখোমুখি বসেছে সে। গাইছে—

'পিরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর মাঝে
প্রেম পরিমল লুব্ধ ভ্রমর
ধাইল আপন কাজে।'

সঙ্গে সঙ্গে সরোষ ভ্রূ-ভঙ্গিতে লুব্ধ ভ্রমরটি যে কে, সভাসৎজনের কাছে সেই নালিশও ব্যক্ত করেই দিল প্রায়।

হেসে উঠল সকলে। বাহবা রব উঠল। আরো একটু কাছ ঘেঁষে আসতে চেষ্টা করলেন সূর্য হালদার। ভাবাবেগে দুলে দুলে গায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। মহিম দারোগাও আসা শুরু করেছে, সে মাথা নাড়তেও জানে না, দুলতেও জানে না। তার চোখের তারায় নিঃশব্দে কামনার আগুন ঝরে শুধু। নবীন-প্রবীণ সঙ্গীত রসিকের সমাবেশটি স্ফীতি লাভ করছে দিনে দিনে, ঘরে ঘরে আর জায়গা ধরে না। দাওয়াও ভরে ওঠে। এর মধ্যে কেউ কেউ গাইতেও জানে, কেউ কেউ আবার পরাণ চাটুজ্জেকে খোলের ওস্তাদ মেনেছে।

পরাণ চাটুজ্জে লুব্ধ হয়ে উঠছিল সত্যি কথাই।

তার বাজনার মধ্যেও আজ যেন তাজা প্রাণের সাড়া উপলব্ধি করছিল রসিকজনেরা। পরাণ চাটুজ্জের প্রাণে আজ আনন্দ ছিল। সেই আনন্দের খবর কেউ রাখে না। শুধু চারু বোষ্টুমী রাখে।

রাখে বলেই ভাবনা। সমস্তটা বিকেল চারু বোষ্টুমী বিমনা ছিল আজ।

মনের তলায় একটা নিরাপত্তাবোধের অভাব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল থেকে থেকে।

পরাণ চাটুজ্জের সঙ্গে চারু বোষ্টুমীর পরোক্ষভাবেও কোন চুক্তি ছিল না। একমাত্র আঁসর বসানোটাই চুক্তি। আর কিছু না। কোন বিনিময় না। চাটুজ্জে ডেকেছে, সে এসে বসবাস করছে। সুবিধে না বুঝলে যে-কোন দিন চলে যেতে পারত, যে-কোন দিন চলে যেতে পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের মূলধনের ওপর আস্থা একটু কমে আসছিল চারু বোষ্টুমীর। সে-মূলধন যৌবন। তাতে টান ধরেছে টের পাচ্ছিল। টান ঠিক না ধরলেও ধরবে শিগগিরই, সেই চিন্তার সময় অন্তত এসেছে। তাই তলায় তলায় নিরাপদ আশ্রয় একটা খুঁজছিল তাতে সন্দেহ নেই। নইলে আসবে কেন? পুরুষ জাতটার ওপর তার শ্রদ্ধা এমন কি বিশ্বাসও অনেকদিনই গেছে। নন্দ কোলে আসার পরেই তার ঘরের পুরুষটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন করেছে এক নারী। চারু বোষ্টুমী অবাক হয়েছে এই জন্য যে, সেই নারীর রূপও নেই গুণও নেই। তাহলে কেমন করে সম্ভব হল সেটা?

কেমন করে সম্ভব হল বুঝেছে। সম্ভব হয়েছে পুরুষ জাতের স্বভাবে। তার

অভিজ্ঞতায় সে-জাত সহজে পোষ মানে না, তোলা শিকারে তার অরুচি। অনেক রূপসী রমণীর ঘরের পুরুষকে এরপর ভ্রমরের মত অষ্টপ্রহর গুন্‌গুনিয়ে উঠতে দেখেছে তাকে ঘিরে। অবজ্ঞা-অবহেলাও তারা চন্দনের মত কপালে মেখেছে।

কিন্তু সেই স্বর্ণ-দিনের মেয়াদ খুব দীর্ঘ নয়, সেটুকু বুদ্ধি চারু বোষ্টুমীর ছিল। তাই পরাণ চাটুজ্জের ডাক পেয়ে নিস্পৃহভাবেই দেখতে এসেছিল ঘর জোটে কি না। পুরুষের আধিপত্যবিহীন নিরাপদ ঘর।

সেই ঘরই পেয়েছিল এসে। দূর থেকে যেটুকু জানত, কাছাকাছি এসে আরো অনেক জেনেছে। জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। পরাণ চাটুজ্জে গাঁজা খায়, খোল বাজায়, আর নিজের ঝোঁকে থাকে। এক নারীকে কেন্দ্র করে রোগগ্রস্তের মত মোহগ্রস্ত হয়ে আছে লোকটা। যে-নারীর আবার সমস্ত সত্তা বিমুখ ওই লোকটার প্রতি। চারু বোষ্টুমী নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে হেসেছে প্রথম প্রথম। তার হৃদয়ের দখিন দুয়ারে পুরুষের পদার্পণ চিরকালের মত বন্ধ। তবু, চুক্তি থাক আর না থাক, ঘরের মূল্য হিসেবে যতই আসর বসাক, আশ্রয়ের মূল্য হিসেবে এই এক পুরুষকে অন্তত কিছু দিতে হবে সেটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানত। কিন্তু এসে দেখল ওই পুরুষের ঘরের জীবন-যাত্রা অস্বাভাবিক এক বিভ্রান্তির ঢেউয়ে এমন ওলট-পালট যে ব্যাধের নাকের ডগা দিয়েও নিশ্চিন্তে হরিণ ঘুরে বেড়াতে পারে।

চারু বোষ্টুমী এ-পর্যন্ত রমণীর একটি রমণীয় বাণও নিক্ষেপ করেনি লোকটার ওপর। গাঁজাখোর ওই পাকানো চেহারার পরে এমনিতেই কোন নারীর কোন-রকম লোভ থাকার কথা নয়। পাশাপাশি বাস করে তাকে উসকে তুললে উপদ্রব বাড়বে বই কমবে না। তাই এই এক জনের বেলায় এ চেষ্টাটা চারু বোষ্টুমী এতদিন পরিহার করে এসেছে। আর পাঁচ জন যারা আসরে আসে তাদের মোহটুকু বরং কাম্য। পরাণ চাটুজ্জে থাক আর না থাক, আসর টিকবে তাহলে। আসরের তৃষ্ণা তাদের যত বাড়ে তত মঙ্গল। দিনে দিনে বাড়ছেও। সূর্য হালদার কোন্ তাড়নায় অত দোলেন জানে। মহিম তরফদারের চোখের ক্ষুধাও অগোচর নয়। প্রয়োজনে এদের বরং একটু-আধটু প্রশ্রয় দিতে আপত্তি নেই চারু বোষ্টুমীর। এটুকুর বিনিময়ে আশাতীত লাভের নজির তো তার হাতেই আছে। সূর্য হালদারের দেওয়া হীরের আঙটিটা ডানহাতের মাঝের আঙুলে জলজল করছে। আর, মহিম দারোগার গোপন আবেদনও সে নাকচ করে দেয়নি একেবারে—তার বাড়িতে এক সন্ধ্যায় আসর বসানোর আমন্ত্রণটা বাতিল করেনি এখনো।

কিন্তু এতদিনের এই নিরাপদ আশ্রয়ের ভিতটাই আজ চারু বোষ্টুমীর চোখের সামনে নড়েচড়ে উঠল একদফা। নাড়িয়ে দিয়েছে নন্দিনী। ভয় পরাণ চাটুজ্জেকে

নয়, ভয় তাকে। এতদিনের এত গান-বাজনা সত্ত্বেও যে এদিকে তেমন করে কখনো আকৃষ্ট হয়নি লোকটা তার কারণ তেমন প্রশ্রয় পায়নি বলে নয়, প্রশ্রয় সে চায়নি। সম্পূর্ণ অন্য ঝোঁকে ছিল বলে চায়নি। চারু বোষ্টুমী সেটা একেবারে জানত না এমন নয়। জানত। কিন্তু এর আগে এমন করে উপলব্ধি করেনি কখনো। নন্দিনীর পবিবর্তন দেখে সে অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে পরিবর্তনের আভাস পেয়ে পরাণ চাটুজ্জের মুখে আনন্দছটা দেখে চারু বোষ্টুমী শঙ্কিত হয়েছে। তাই এতদিন যা করেনি আজ তাই ক-তে বসেছে সে। আসর-জনতার মাঝে মুখোমুখি বসে শুধু একজনের উদ্দেশে মোহ ছড়াতে বসেছে। আশ্রয়ের ভিত রচনায় মন দিয়েছে।

'রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা,
কুলবতী সতী যুবতী জনাব
পরাণ লইয়া খেলা।'

চারু বোষ্টুমীর ঠোঁটে হাসি, ভ্রূকুটিতে অভিযোগ, বাহু-পল্লবে লঘু অসহিষ্ণুতার সুঠাম ছন্দ।

রাত্রি গভীর। অন্ধকার।

পরাণ চাটুজ্জের চোখে ঘুম নেই। চাটাইয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। রাতে মাঝখানের এই আসর-ঘরেই আজকাল শোয় সে। গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে সেই কখন। কিন্তু এখনো যেন বাতাসে চারু বোষ্টুমীর খোপার আর গলার ফুলের মালার মৃদু গন্ধ মিশে আছে। চাঁদ ঢাকা মেঘের দরুন গরম বেশি। তবু মাঝে মাঝে বাতাস দিচ্ছে একটু। সেই বাতাসে গ্রীষ্মের প্রথম ফোটা শিরীষের গন্ধ ভেসে আসছে। এরই মধ্যে কর্কশ ছন্দপতনের মত পিছনের জঙ্গলে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডেকে উঠল।

পরাণ চাটুজ্জের সর্বাঙ্গে অতি পরিচিত যাতনা একটা, স্নায়ুর যন্ত্রণায় স্পর্শাতুর অসহিষ্ণুতা। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কামনার কণা। চারু বোষ্টুমী আজ তাকে বিভ্রান্ত করেছে, বিহ্বল করেছে। প্রাকৃতিক তাড়নাটাকে জাগ্রত করেছে। পশুচিত্তের সুপ্তি ভাঙলে পরাণ চাটুজ্জের চুপ করে থাকার কথা নয়, চুপচাপ শুয়ে থাকার কথা নয়। দস্যুর মতই তখন লোলুপ নির্মম সে।

তবু আজ হাত পা ছড়িয়ে মরার মত পড়ে আছে পরাণ চাটুজ্জে।

পশুরও বিবেক আছে বোধহয়। নন্দিনীর আজকের এই সদ্য পরিবর্তন সেই

বিবেকের পর্দায় আঁচড় কাটছে থেকে থেকে, নিবৃত্তির শিকল আঁটছে। কেন জানি নিজেই নিজেকে প্রতিরোধ করছে পরাণ চাটুজ্জে—আজ নয়, এই দিনে নয়।

নিযুতি অন্ধকারে এই দুই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে নিঃশব্দে প্রহর গুণছে সে। আজকের মত প্রবৃত্তি বড় হবে কি নিবৃত্তি? আলো আর অন্ধকার কতক্ষণ পাশাপাশি থাকতে পারে? একটার অবসান অনিবার্য।

হঠাৎই বিষম চমকে উঠল পরাণ চাটুজ্জে। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার দুচোখ টান করে অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু আধ হাতও চোখ চলে না, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও চেনা যায় না।

কয়েকটা মুহূর্ত। নারী-হাতের স্পর্শজনিত রোমাঞ্চ।

তাকে যেতে হবে না কোথাও, অভিসারিকা নিজেই এসেছে কাছে। নির্লজ্জ সান্নিধ্যে পরাণ চাটুজ্জের সকল দ্বন্দ্বের অবসান।

প্রবৃত্তির তাড়নায় বিবেকের ক্ষীণশিখা প্রদীপটা একেবারে নেভে যখন, সেই প্রবৃত্তির রূপ ভয়ঙ্কর। দুর্দম আদিম নিষ্ঠুর। পরাণ চাটুজ্জে ঘুমিয়ে কি জেগে তাও বোঝার উপায় নেই তার স্তব্ধতায় শার্দুলের প্রতীক্ষা। স্থির নিস্পন্দ প্রতীক্ষা।

কিন্তু তবু কোথায় যেন অস্বাভাবিক লাগছে পরাণ চাটুজ্জের। নারীতনু-পাশের পিচ্ছিল বন্ধন নিবিড় হয়ে উঠছে ক্রমশ। সাপিনীর মত অভিসারিকার সেই ধীর অমোঘ বেষ্টনে সমর্পণের প্রগলভতা নেই, সমর্পণের আভাসমাত্র নেই। উল্টে সে-ই যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলতে চায় তাকে।

প্রতীক্ষার সমাপ্তি। রক্তে আগুন লেগেছে পরাণ চাটুজ্জের। আদিম উল্লাসে পুরুষের হৃৎপিণ্ড ধকধকিয়ে উঠেছে। দুই হাতের হিংস্র নিষ্পেষণে নারী-তনু ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে বুঝি।

কিন্তু…

কিন্তু এমন লাগছে কেন পরাণ চাটুজ্জের! কি যেন গণ্ডগোল একটা। কিসের অস্বস্তি…। সঙ্গে সঙ্গে থমকালো একটু। মুখের ওপর মুখ রেখে চোখ টান করল, অন্ধকার ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করল।

বুকের ওপর খচ করে কিসের আঁচড় পড়ল একটা।

সেই মুহূর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত পরাণ চাটুজ্জে নিস্পন্দ। কাঠ একেবারে।

আঁচড়টা চেনা। আগেও লেগেছে। আগেও বিঁধেছে। গলার হারের ঝোলানো লকেট একটা, সেই স্বর্ণ-তারকার আঁচড়।

রাত্রিরূপিনী অভিসারিকা চারু বোষ্টুমী নয়। চারু বোষ্টুমী আসেনি।

নন্দিনী এসেছে।

চার

সবাই বলে পরাণের কাঁধে ছোট পরাণ যায়।

চারু বোষ্টুমীর পরিহাস যে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে সে নিজেও ভাবেনি। সে ঠাট্টা করে নন্দিনীকে বলেছিল, বড় মেয়ে বাসনা খানিকটা মায়ের আদল পেয়েছে, ছোট মেয়ে স্বাহা বাপ আর মা দু'জনার -এর পরেরটা শুধু বাপের মুখ পাবে—সমান সমান ভাগ।

সত্যি সত্যি ছেলেটার সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ—এমন কি এই দু'বছর বয়সেই সেই রকমই একরোখা তেজ।

লোকে বলে, ছোট পরাণ কাঁধে চড়িয়ে কোথায় চললে হে বড় পরাণ?

পরাণ চাটুজ্জে হাসে। খুশিতে আনন্দে ভরে ওঠে। সত্যিই ছেলেটাকে দু'দণ্ড বাড়িতে রেখে আসার জো নেই। রেখে আসতে মন চায়ও না। ছেলেটা যেন তার চোখের মণি ও আসার পর থেকেই পরাণ চাটুজ্জে প্রায় বদলেছে। মন মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে। চুনিগ্রামের আর দশ জনের মত সামাজিক মানুষ হয়ে উঠেছে সে। তার সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের সেই ভীতি মেশানো কৌতূহল কমে আসছে।

পরাণ চাটুজ্জে এত বদলেছে শুধু মনের মত ছেলে পেয়েছে বলেই নয়। আর ছেলেটাকে যে এত ভালবাসে তাও অবিকল তার মত দেখতে বলেই নয়।

ছেলেটা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তঃপুরিকাটি বদলেছে। নন্দিনীর সেই শুষ্কতা তরল হয়েছে। সেই নীরব কঠিন নিস্পৃহতা কেটে গেছে। সে এখন কথা বলে। হাসেও। পরাণ চাটুজ্জের মনে মনে আশা একদিন হয়ত আগের মত গানের আসরেও আবার এনে বসানো যাবে তাকে। নন্দিনী গাইবে, সে বাজাবে।

লোকের কথা পরাণ চাটুজ্জে নিজেই ঘরে এসে গল্প করে। শুনে শুনে নন্দিনীর কান পচে যাবার কথা এতদিনে। তবু শুনলে খুশি হয় সেটা পরাণ চাটুজ্জে লক্ষ্য করেছে। তাই বলে, তাই শোনায়। নন্দিনী খুঁটিয়ে দেখে ছেলেকে, লোকের কথা মিলিয়ে দেখে। কখনো বা শ্লেষ মিশিয়ে বলে, এখনো তো গাঁজাই ধরল না, মিল আবার কোথায়!

চারু বোষ্টুমীর ভয় ভেঙেছে।

না, নন্দিনী কখনো তাকে আশ্রয়চ্যুত করার কথা ভেবেছে বলেও মনে হয় না। পুরুষের বিশেষ করে ঘরের পুরুষের ব্যভিচারী আকর্ষণের দিক থেকে চারু বোষ্টুমীর

অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন নয় যেন সে। চারু বোষ্টুমীর মোহ বিস্তারের তাড়না গেছে। আগের মতই সুস্থ সহজ হয়ে উঠেছে সে। আগের থেকেও বেশি বলা যেতে পারে। উল্টে নন্দিনীই যেন অনেকটা মুখাপেক্ষী তার। মেয়ে দুটোর ব্যাপারে তো বটেই। তার নিজের ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ে দুটোকেও বলতে গেলে তাকেই দেখাশুনা করতে হয়। বড় মেয়েটার বয়েস ছয়, ছোটটার প্রায় চার। এই দু'দুটো পরের মেয়ে টানতে হচ্ছে বলে চারু বোষ্টুমীর ক্ষোভ নেই তেমন। কারণ, এর ফলে তার আশ্রয়ের ভিতটা পাকাপোক্ত হয়েছে আরো, কর্তৃত্ব বেড়েছে।

মেয়ে দুটো পারতঃ মায়ের কাছে ঘেঁষে না, এখানেই থাকে বেশির ভাগ সময়। খায়-দায়, রাতে ঘুমোয়ও অনেক দিন। মায়ের সে-জন্য তাপ-উত্তাপ নেই, সে ছেলে নিয়েই মশগুল। বোষ্টুমীর নিজের আট বছরের ছেলেটার বজ্জাতি বাড়ছে দিনে-দিনে। মেয়ে দুটোকে মেরে-ধরে একাকার করে এক-একসময়। কিন্তু মার খেয়ে ওরা তারস্বরে কাঁদলেও নন্দিনীর কানে ঢোকে না পর্যন্ত। একবার মুখের কথাও শুধোয় না, কি হল, কাঁদছে কেন।

চারু বোষ্টুমী ঠাট্টা-ঠিসারা না করে পারে না এক-একসময়। নন্দিনীকে বলে, তোমার মত এমন একচোখো মা দেখিনি কখনো, মেয়ে দুটো যেন বানের জলে ভেসে এসেছে। কখনো বলে, বাপ-মা দুজনেই কাড়াকাড়ি করে ছেলে নিয়ে মত্ত, বাপটা তবু দুটো মেয়ে আছে জানে, তুই তাকেও ছাড়ালি। এমন আর দেখিনি, ছেলে তো আমারও আছে।

নন্দিনী পরিহাসভরেই পাল্টা জবাব দিয়েছিল, আর সেই জবাব শুনে চারু বোষ্টুমী হাঁ একেবারে। নন্দিনী দাঁতে করে ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরে তার দিকে চেয়েছিল খানিক। তার চোখ দুটো হাসছিল। শেষে বলেছিল, তোমার তো ছেলে, আমার কি ছেলে ?···ছেলের বাবা।

হাসতে হাসতে ছেলে নিয়ে প্রস্থান করেছে নন্দিনী। চারু বোষ্টুমী গালে হাত না দিয়ে পারেনি। রঙ-ঢঙের কথা সে-ও কম জানে না। বাপের মত দেখতে হয়েছে বলে এমন ঢঙের কথা আর শোনেনি কখনো।

আগের মতই আসর বসে, চারু বোষ্টুমী গায়, পরাণ চাটুজ্জে বাজায়, সূর্য হালদার দোলেন আর মহিম দারোগার চোখ জ্বলে। তরুণ গাইয়ে বাজিয়েও তৈরি হয়ে উঠছে আরো দু'চারজন। ওদিকে পরাণ চাটুজ্জে সুস্থ উপায়ে সংসার নির্বাহের মাশুল সংগ্রহে মন দিয়েছে। তার জমি কম নয়, সেই জমি সে ভাগচাষে ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া চারু বোষ্টুমীর পরামর্শমত গঞ্জে মুদী দোকান দিয়েছে একটা। কিন্তু দোকান দেখার সময় কোথায় পরাণ চাটুজ্জের ?

চারু বোষ্টুমী ঠাট্টা করে, তাই তো তোমার ছেলে আছে না, তুমি দেখবে কখন?

পরাণ চাটুজ্জে হাসে। অনুযোগটা অস্বীকার করে না—ছেলেকে না দেখে সকাল-সন্ধ্যা দোকানে বসে কাটাতে পারবে না।

দোকান দেখে বিনয়কেষ্ট।

চারু বোষ্টুমী দোকানের ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। আসরের তরুণ অনুরাগীদের মধ্যে বিনয়কেষ্ট সব থেকে প্রিয়পাত্র তার। ব্রাহ্মণের ছেলে, বোষ্টুমীকে মাসি বলে ডাকে। মিষ্টি মেয়েলী গলায় গান করে। স্বভাবটিও নরম-সরম, কিন্তু বোকা নয় তা বলে। দোকানের যা কিছু হিসেব নিকেশ সব তার মাসির সঙ্গে। দোকানের আসল মালিক যেন চারু বোষ্টুমী।

খুব ভোরে উঠে বিনয়কেষ্ট গঞ্জে চলে যায়, সন্ধ্যায় ঝাঁপি বন্ধ করে সোজা আসরে আসে। ঝড়-জলেও আসর কামাই নেই তার। আর কেউ আসুক আর নাই আসুক, সে আসবে। চারু বোষ্টুমী মাঝেসাঝে যশোদা গোপালের পালা গায় তার সঙ্গে। অবশ্য বিনয়কেষ্টর গোপালের বয়েস অনেক দিন গেছে, বছর বাইশ হবে বয়েস। তবু আনন্দ ধরে না বিনয়কেষ্টর, যশোদার সংগীত-বিলাপে দুচোখ ছলছলিয়ে ওঠে। যদিও আনন্দ আর কার হয় বলা শক্ত, সূর্য হালদার যে এ ধরনের আসর পছন্দ করেন না সেটা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। ভাবাবেগে তাঁর দেহ অত আর দোলে না তখন।

মাসি ডাকলেও চারু বোষ্টুমী অনেক সময় ঠাট্টার সুরে বিনয়কেষ্টকেই বলে, আমার সঙ্গে গাইতে ক'দিন আর ভালো লাগবে তোর—গাইতে-টাইতে পারে দেখে শুনে একটা ছোট মেয়ে যোগাড় কর না। গোষ্ঠবিহার রাসলীলা মানমাথুর যুগলমিলনের পালাগুলো বেশ গাইতে পারবি তাহলে। মেয়ে পছন্দ হলে আমিই না হয় শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।

বিনয়কেষ্ট লজ্জা পায়। কিন্তু সংগোপনে ভাবে, বেশ হয় তাহলে জীবন সার্থক হয়।

কোজাগরী পূর্ণিমায় মেলা এলো আবার চুনিগ্রামে। ওলাই-চণ্ডীর বটের সেই তিন দিনের মেলা। ক'দিন আগে থেকেই আসন্ন উৎসবের তোড়জোড় চলছে। চুনিগাঁয়ে সাড়া জেগেছে।

পসারীরা চঞ্চল। তিন দিনের মেলায় এক মাসের বাণিজ্যের আশা তাদের। গ্রামবাসীরাও আসন্ন আনন্দের আশায় উন্মুখ। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে দোকান সাজানোর তোড়জোড় চলেছে। গ্রামবাসীরা তাই দেখতে আসছে, ছেলেছোকরারা অদম্য সাহায্যও করছে তাদের।

আনন্দের ব্যবস্থাও কম নয়। কোথাও ম্যাজিক দেখানো হবে বলে তাঁবু পড়েছে, কোথাও নাগরদোলার খুঁটি পোতা হচ্ছে। পরিণত বয়স্কদেরও এবারে একটু বৈচিত্র্যের প্রত্যাশা। ওলাইচণ্ডীর বটের পিছনের কোণের খানিকটা জায়গা বাখারি দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। ওখানেও তাঁবু পড়বে, ত্রিপল ছাওয়া হবে, তক্তাপোশের মঞ্চ বাঁধা হবে। মেলার দ্বিতীয় রাতে গানের আসর বসবে ওখানে।

উদ্যোক্তা পরাণ চাটুজ্জে।

উৎসাহদাতা সুর্য হালদার, আরো অনেকে।

গাইয়ে বাজিয়ে পেলে রাত ভোর আসর জমানোর ইচ্ছে সকলের। আখড়ায় যে ক'টি গাইয়ে বাজিয়ে আছে তারা সমস্ত রাত আসর জিইয়ে রাখতে পারবে কেন। পরাণ চাটুজ্জে আশপাশের গ্রাম শহরে যাতায়াত করছে যদি দু'পাঁচ জন সংগ্রহ হয়। সকলের আশা, আর দুই-এক জন মেয়ে-গাইয়ের সন্ধানে আছে পরাণ চাটুজ্জে।

কথাটা মিথ্যে নয়, পরাণ চাটুজ্জে সেই চেষ্টাই করছিল। চারু বোষ্টুমীর সঙ্গে আর এক জনকে পেলেও হত। আজ আবারও নন্দিনীর অভাবটা উপলব্ধি করছিল সে, তাকে আসরে পেলে আর ভাবনা কি ছিল। কিন্তু আসরে নন্দিনীর গান এরই মধ্যে বিগত স্মৃতি শুধু।

তবু মনে এবারে আনন্দ কম নয় পরাণ চাটুজ্জের। তার অন্য কারণ। মুকুন্দ গোস্বামীর মৃত্যুর পর বছরের এই একটা দিন নন্দিনী যেন নতুন করে স্তব্ধতার গহ্বরে ডুবে যেত। সমস্ত মুখ থমথমিয়ে উঠত। পরাণ চাটুজ্জে ভীতু নয়, তবু কেন জানি সেই দিনটা এড়িয়ে চলত নন্দিনীকে, বাইরে-বাইরেই কাটাতো একরকম। ব্যতিক্রম দেখল। গত বছর ছেলের প্রায় এক বছর বয়েস তখন, নন্দিনীকে অনেকটাই স্বাভাবিক দেখেছিল সেই দিনও। আর এবারে তো সেই দিনটার কথা নন্দিনী যেন ভুলেই গেছে। তার এবারের হাসিখুশি মুখটা দেখে উল্টে সেই আগের দিনের নন্দিনীকে মনে পড়ছিল পরাণ চাটুজ্জের।

মনে মনে মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পরাণ চাটুজ্জে।

সেই দিন। সেই রাত্রি।

জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। চুনিগ্রামের আনন্দ দেখেই জ্যোৎস্না যেন খলখলিয়ে হাসছে। কোন বাড়ির অতি বৃদ্ধ বা অতি শিশুরাও বোধহয় ঘরে বসে নেই। সকলের সঙ্গে সকলের দেখা। কোথায় দেখা?

ওলাইচণ্ডীর পথে। ওলাইচণ্ডীর মেলায়। ওলাইচণ্ডীর আসরে।

নন্দিনীও বেরিয়েছে। একটু বেশি রাতে। পূর্ণিমার চাঁদ যখন মাথার ওপর।

ওলাইচণ্ডীর পথে নয়। ওলাইচণ্ডীর মেলায় নয়। ওলাইচণ্ডীর আসরে নয়।

তাকে কেউ দেখেনি। তার সঙ্গে আর যে ছিল তাকেও না।
শুধু পূর্ণিমার ওই চাঁদটা দেখেছে।

খুব ভোরে ঘুম-জড়ানো চোখে একটা সোরগোল আর উত্তেজনা কানে আসছিল পরাণ চাটুজ্জের। বিরক্ত হচ্ছিল ঘুমের ঘোরেই। আসরের তক্তাপোশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছিল শেষ রাতে।

গাঁজাব নেশা আর ঘুমের ঘোর একসঙ্গেই ছুটে গেল হঠাৎ। উঠে বসল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠল সে।

উত্তেজনা তাকে ঘিরে। তাকেই তারা বলছে কিছু একটা। বলতে চাইছে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পবাণ চাটুজ্জে তীরের মত ছুটল হঠাৎ।

রাজা দীঘির ঘাট।

সিঁড়িতে ভিড়।

ভিড় ঠেলতে হল না। তাকে দেখে সকলেই সবে সরে দাঁড়াল। হতচেতনের মত পরাণ চাটুজ্জে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো।

সিঁড়িতে ছোট পরাণ শুয়ে। ঘুমিয়ে।

সে ঘুম আর ভাঙবে না।

অল্প জলে কেউ তাকে চুবিয়ে চুবিয়ে তাব প্রাণ-শিখাটুকু নিভিয়েছে। তারপর সিঁড়িতে শুইয়ে বেখেছে।

সহসা বন্যপশুর বুটফাটা অন্তিম আর্ত চিৎকারে সন্ত্রাসে শিউরে উঠল সকলে।

দীঘির শান্ত জলও বুঝি কেঁপে উঠল।

পরাণ চাটুজ্জে সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

গাঁয়ের লোকের চোখের সম্মুখ থেকে এর পর মস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে একটা। তারা নতুন করে কিছু জেনেছে। নতুন কবে কিছু উপলব্ধি করেছে।

মুকুন্দ গোস্বামীকে ঠেঙাড়েরা হত্যা করেছিল? না আর কেউ?

শোকতপ্ত কন্যা শ্মশান থেকে স্বেচ্ছায় পরাণ চাটুজ্জের ঘরে গিয়ে উঠেছিল?

চোখের সামনে একি প্রতিশোধের বিভীষিকা দেখে উঠল তারা!

রহস্যের একটা ঘন যবনিকা সরে গেছে চারু বোষ্টুমীর চোখের সমুখ থেকেও। নন্দিনী বলেছিল, তার ছেলে নয়, ছেলের বাবা। কেন বাপের মত ছেলে চেয়েছিল নন্দিনী সেটা আর অস্পষ্ট নয়। বাপমুখো ছেলে পেয়ে তার অমন অস্বাভাবিক

উল্লাসের কারণও আগোচর নয় আর। ছোট মেয়ে যাহার দিকে চেয়ে শিউরে উঠেছে চারু বোষ্টুমী। বাপের আদল পেয়েছে জেনে এই মেয়েটাকেই শেষ করার সঙ্কল্প এঁটেছিল। সত্যিই বাপের আদল পেয়েছে কিনা তাকে দেখাতে এনেছিল। চারু বোষ্টুমীর ঠাট্টার সঙ্কল্প বদলেছে। সে বলেছিল, পরেরটা আব বাপ-মা মেশানো নয়, শুধু বাপের মত হবে।

আশ্চর্য! তাই হয়েছিল।

নন্দিনী সন্তান চায়নি, সন্তানেব মধ্যে ওই বাপকেই চেয়েছিল।

বলেছিল, শোধ নেবে।

নিয়েছে।

তারপর আর তাকে চুনিগ্রামে দেখেনি কেউ।

কোথাও দেখেনি।

পাঁচ

পরাণ চাটুজ্জের ভিটেতে আবার এক কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে চোদ্দ-পনের বছর বাদে।

এই অধ্যায়ের প্রধান নারী-পুরুষ যারা, তারা লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি যতদিন ততদিনই শুধু দিন কেটেছে একটা, বৈচিত্র্যহীন। তখনো আবির্ভাব ছিল তাদের, কিন্তু সেই আবির্ভাবে ঘোষণা ছিল না, দাবী ছিল না।

এটা এই ঘোষণার অধ্যায়। দাবীর অধ্যায়।

ভিটের মালিক এখনো বর্তমান বটে। কিন্তু না থাকাবই সামিল। পরাণ চাটুজ্জের মেরুদণ্ড ভেঙেছে চোদ্দ বছব আগে। দুখানা হয়ে গেছে। অকাল বার্ধক্যে জবুথবু হয়ে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকে। একটা না একটা ব্যাধিও লেগে আছে সেই থেকে। নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য দেহে ব্যাধির প্রকোপ স্বাভাবিক। বড মেয়ে বাসনার সেবা যত্ন না পেলে এই দেহেব মিয়াদ অনেক আগেই ফুরাতো। সে গ্রামবাসীবও করুণাব পাত্র এখন।

গাঁজা খাওয়া ছেড়েছে পবাণ চাটুজ্জে। ফলে সেই চনমনে ভাবটা গেছে—চোখের শিরায় আর লালরক্ত কাঁপে না। গাঁজার বদলে আফিং খায়। আফিং খেয়ে ঝিমোয় দিনবাতের বেশির ভাগ সময়। আফিং ফুরালে চুপটি করে জামাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিছু বলে না। বলাব দরকাবও হয় না। জামাই বোঝে। শ্বশুরেব ববাদ্দ আফিং সে-ই সববরাহ কবে। আর শালীকে লুকিয়ে আরো ততখানিই প্রায় এনে দিতে হয় ফি হপ্তায়।

জামাই বিনয়কেষ্ট। বলতে গেলে সে-ই কর্তা এখন। লোক রেখে মুদী দোকান চালাচ্ছে এখনো। জমি-জমাও সব তারই তত্ত্বাবধানে। ছ'বছর আগে তার সঙ্গে বাসনার বিয়েটা চাক বোষ্টুমীই দিয়ে গেছে। বিনয়কেষ্ট এখনো সেই রকমটিই আছে। বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো নরম আরো দুর্বল গোছের হয়ে পড়েছে। একটু গান-বাজনাব ব্যবস্থা হলে আগেব মতই খুশি। নইলে নিজের মনেই গুন্‌গুন্ করে অষ্টপ্রহর। শ্যালিকা সম্পর্কেব জোরে স্বাহাকে রসেব গান শুনিয়ে রাগাতে চেষ্টা করে, তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে।

আসলে পরাণ চাটুজ্জের ভিটেতে কর্তা কেউ নয়, কর্ত্রী আছে একজন। সে বড মেয়ে বাসনা।

বিনয়কেষ্টর থেকে কম করে ষোল-সতের বছরের ছোট। কিন্তু এই কর্ত্রীটিকেই

বিলক্ষণ ভয় করে চলে বিনয়কেষ্ট। বাসনা রাগ হলেই বলে, তুমি আবার মানুষ নাকি, তুমি মেয়ে মানুষের হদ্দ।

স্বাহা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়ায়। টিপ্পনী কাটে, দিদি মিথ্যে বলে না— তুমি একটা মেয়ে মানুষের মান ভাঙাতে পারো না, রাগ-টিট করতে পারো না, তুমি আবার মানুষ কি!

বিনয়কেষ্ট হাসে। নিরাপদ বুঝলে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—

'আগে যদি জানতেম সতর্কে থাকতেম।
এমন না করতাম মনে।
সে হেন পীরিত, হবে বিপরীত
এমন মনে কে জানে।'

স্বাহা ফাঁক পেলে তাকে মুখ ভেঙচায়, বিনয়কেষ্ট হাত ধরে বেশি টানাটানি করলে দুই একটা কিলও বসিয়ে দেয়। ডাকে কেষ্টদাদা বলে। ছেলেবেলা থেকে তাই ডাকত, সেই ডাক আর বদলায়নি। দিদির সামনে সে অনেক সময় গম্ভীর ভব্যসব্য হয়ে থাকতে চেষ্টা করে। দিদির সবেতে কড়া শাসন। কিন্তু হাসির জোয়ারে সে-গাম্ভীর্য খানখানও হয়ে যায় প্রায়ই। দু'হাতে দিদিকে জড়িয়ে ধরেই হেসে লুটোপুটি খায় তখন। দিদি তবু চেষ্টা করে নিজের কড়া কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। চড়চাপড় লাগায়, শেষে হাল ছাড়ে।

পরাণ চাটুজ্জের ভিটে ছেড়ে চারু বোষ্টুমী ছেলে নিয়ে অন্যত্র বসবাস করছিল, সেও প্রায় পাঁচ-ছ'বছর হয়ে গেল। বাসনার সঙ্গে বিনয়কেষ্টর বিয়ের পরেই একরকম। কেউ তাকে যেতে বলেনি সে নিজেই গেছে। প্রাণের দায়ে গেছে। কিন্তু তার আগে অনেক কাণ্ড।

একদা নিজের গাঁয়ের ত্রিলোচন ঠাকুরের স্নেহের পাত্রী ছিল চারু বোষ্টুমী। কিছুটা প্রিয়পাত্রীও। মনে মনে গুরুজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত তাঁকে। হুকুম মত গান শোনাতো, ফাঁকে ফাঁকে সেবা-যত্নও করত। সেই সেবা যত্নের চাহিদা কখনো-সখনো মাত্রা ছাড়ালেও চারু বোষ্টুমীর ভক্তি-শ্রদ্ধা কমেনি। মনে মনে বরং খুশিই হত। ত্রিলোচন ঠাকুরকে মস্ত গুণী বলে জানত সকলে, দৈবজ্ঞ বলে মানত। আপদ-বিপদের অনেক ঝাড়-ফুঁক, টোটকা-টাটকি জানতেন তিনি। হাত দেখে কোষ্ঠি দেখে ভূত-ভবিষ্যত বলে দিতেন। হারানো প্রাপ্তির সন্ধান দিতেন, নিরুদ্দেশের হদিস বলে দিতে পারতেন। তিনিই একদিন বলে দিয়েছিলেন, বোষ্টুমীর ছেলের বিপথগামী হবার সম্ভাবনা আছে, মৃত্যু-তুল্য বিপদের ভয় আছে। অবশ্য বিপদ-নিরসনের তাবিচ কবচও দিয়েছেন সেই সঙ্গে, আর সাবধান করেছেন চারু বোষ্টুমীকে।

ষোল বছর বয়েস না পেরুতে নন্দর ভাবগতিক দেখে দুর্ভাবনায় গায়ের রক্ত এক এক-সময় হিম হয়ে গেছে চারু বোষ্টুমীর। বদ সঙ্গে মিশছে, পান-বিড়ি ধরেছে। তাছাড়া, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে—সেই পাঁচ বছর আগেই ওই এগারো-বারো বছরের মেয়েটার প্রতি ছেলের লোলুপতা তার চোখে এড়ায়নি। অনেক বাবা-বাছা করেছে, ছেলের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক বুঝিয়েছে—ওরা অভিশপ্ত, ওদের অভিশপ্ত সংসার, ঘেঁষবিনে। মারধর করে লাভ নেই, ডাকাত ছেলে, তাকেই তাহলে খুন করে বসবে কোন্‌দিন।

কিন্তু কোন ফল হয়নি। বড় মেয়েটার ওপর চোখ নেই নন্দর, লোভ ছোট মেয়েটার ওপর। ছেলেবেলা থেকেই ওই মেয়েটার ওপর ছেলের অধিকার বিস্তারের একটা প্রচণ্ড আক্রোশ লক্ষ্য করত চারু বোষ্টুমী। ছেলের সঙ্গে না পেরে শেষে ওই মেয়েটার ওপরেই যত রাগ গিয়ে পড়েছে তার। শুধু ছেলেকে বোঝাবার জন্য বলেনি নিজেও ওদের অভিশপ্ত বলেই বিশ্বাস করে চারু বোষ্টুমী। এমন অভিশপ্ত মা-বাপের মেয়ে অভিশপ্ত হবে না তো কি! আগে সে কথা মনে হয়নি, ত্রিলোচন ঠাকুরের কথা মনে পড়েনি। কিন্তু যত বড় হচ্ছে মেয়ে দুটো, আর তত ছেলের মতিগতি বদলাচ্ছে, ত্রিলোচন ঠাকুরের কথা তত যেন বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছিল চারু বোষ্টুমীর।

ছেলের সঙ্গে না পেরে রাগে এক এক-সময় মেয়েটাকেই মারধর করেছে সে। কিন্তু তাও বেশি দিন পারেনি। আদর করে বাপ আবার নাম রেখেছিল স্বাহা। ওই বয়সেই যেন সত্যি সত্যি আগুনের ফুলকি। গায়ে হাত পড়তে না পড়তে যে-ভাবে ফুঁসে উঠত, যে-ভাবে তাকাত—সেই মূর্তি দেখে চারু বোষ্টুমী শাসন করবে কি, নিজেই ঘাবড়ে যেত।

এ ছাড়াও বিপদের আরো জলজ্যান্ত সূচনা দেখেছিল। সেটাই আরো বেশি ভয়ের। একে ছেলের জ্বালায় অস্থির, তার ওপর আরো দুটো দস্যি কুলাঙ্গার জুটেছিল এখানে। জুটেছে তো অনেকেই, মধু ছড়ালে মাছি এসে আটকাবে জানা কথাই। কিন্তু ওই দুজন ছাড়া চারু বোষ্টুমী আর কারো জন্য ভাবে না। ওই ছোঁড়া দুটোকে মনে মনে ভয়ই করে সে। একজন মহিম দারোগার ছেলে কেদু, আর একজন বিনয়কেষ্টর আমদানী—মন্টি। নন্দর থেকে বয়সে বড় দুজনেই, মন্টি কেদুর থেকেও চার পাঁচ বছরের বড়। দু'জন ছেলেটাকে ধরে মারধর করে যখন-তখন, ফাঁক পেলে চড়-চাপড় লাগায়। ছেলেটাও একটু রয়ে-সয়ে চললে কথা ছিল—সেও খুদে লঙ্কা একটি। কাজেই রেষারিষি লেগেই আছে।

মন্টির খোলের হাত ভালো। বিনয়কেষ্টর বিশ্বাস, কালে পাকা খোলবাজিয়ে হবে

সে। এ গাঁয়ের ছেলে নয়, কিন্তু এই গাঁয়েরই পাকাপাকি বাসিন্দা এখন। তার বাপ সুদে টাকা খাটাতো। খাতকের গলায় পা দিয়ে পয়সা করেছিল। নিজেকে বঞ্চিত করে, স্ত্রী-পুত্রকে বঞ্চিত করে সোনার শিকলটা দিনে দিনে মোটা করছিল। মুদী দোকান বাড়ানোর জন্য তার কাছ থেকে একবার কিছু টাকা ধার করেছিল বিনয়কেষ্ট। সেই সূত্রে মন্টির সঙ্গে যোগাযোগ। তার গান-বাজনার সখ দেখে বিনয়কেষ্ট প্রীত হয়েছিল। প্রায়ই আখড়ায় নিয়ে আসত তাকে। চারু বোষ্টুমী তখনই বুঝেছিল ছোঁড়াটা আটকে গেল এখানে। মেয়ে দুটোর মধ্যে বাসনার তখন নতুন লাবণ্যের মায়া-বন্দরে অবস্থান কাল। বোষ্টুমীর কাছে গান শেখে, তার সঙ্গে আসরে গায়। বিনয়কেষ্টর সঙ্গেও গায়।

ছোঁড়াটা চালাক বটে। গানের দিকে না ঝুঁকে খোলের দিকে ঝুঁকেছে। পরাণ চাটুজ্জের মেরুদণ্ড ভাঙার পর থেকে পাকা খোল বাজিয়ের অভাব বলতে গেলে আজও ঘোচেনি। মন্টির হাতে বিনয়কেষ্ট সেটা ঘোচবার প্রতিশ্রুতি দেখেছে। যদিও পরাণ চাটুজ্জের কাছাকাছি আসতে ঢের দেরি, তবু পরাণ চাটুজ্জের জায়গাটিতে জাঁকিয়ে বসতে সময় লাগেনি তার। তার আগে ওপরঅলা সুযোগ-সুবিধেও দিয়েছেন ছোঁড়াকে। সুদ-খোর বাপ টাকার আণ্ডিল রেখেই চোখ বুজেছে। তার মাস ছয়েকের মধ্যে মন্টি বাপের সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়ে পাকাপাকিভাবে চুনিগ্রামের বাসিন্দা হয়েছে। টাকা দেখে গাঁয়ের লোকই গণ্যিমান্যি একজন ভাবে ছোঁড়াটাকে, চারু বোষ্টুমী তো মেয়ে মানুষ। নিজের ছেলের হেনস্থা দেখে সে তার কাছেই আবেদন করেছিল, নন্দ তো তোমার ছোট ভায়ের মতই বাবা, দোষ করলে শাসন একটু-আধটু করবে বই কি—কিন্তু তা বলে একটা ছোট ছেলেকে ধরে যখন-তখন মারধর করো তোমরা, এ কেমন কথা।

আবেদনের জবাবে মন্টি গম্ভীর মুখে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে।—তোমার ছেলে বজ্জাতের ধাড়ী।

শুনে গা জলেছে চারু বোষ্টুমীর। চালুনী বলে ছুঁচে ছেঁদা। কিন্তু মুখে বলতে পারেনি কিছু। বরং মন্টি এরপর যা বলেছে শুনে রক্ত জল হয়েছে আরো।

মন্টি শাসিয়েছে, ও কেষ্টুর সঙ্গে লাগতে যায় কেন, দুদিন বাদে কেষ্টু দারোগা হবে জানো? এখনই হয়েছে কি, পরে তখন হাড়মাস আলাদা করে।

চারু বোষ্টুমীর আশা ছিল, নন্দ লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। সে আশায় জলাঞ্জলি।

এক-একসময় অনুশোচনা হত আঁতুড়ে কেন একদিন গলা টিপে শেষ করে দেয়নি

সর্বনাশীকে। তখন তো কম সুযোগ সুবিধে ছিল না। এখন চারু বোষ্টুমী করবে কি, ছেলে নিয়ে যাবে কোথায়? কেন চোখের ওপর সেই আগুনের কণা বাড়তে দেখে জ্ঞানবুদ্ধি হল না তার। কেন তখন থেকেই সাবধান হল না সে, কেন ছেলে নিয়ে আর কোথাও চলে গেল না। তখন তো চারু বোষ্টুমীর গতরে ভাঁটার টান আসেনি এমন—গানও ছিল। একটা ছেলে কি মানুষ করতে পারত না সে। লোভ লোভ লোভ—লোভের বশেই সব গেল। মেয়েটার এই বয়সের আগুনেই পুড়তে লেগেছে ছেলে, বয়েসকালে হবে কী?

কি হবে সেটা দিব্য চোখে দেখেছে চারু বোষ্টুমী। ত্রিলোচন ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। দেখে বড় মেয়েটাকে অর্থাৎ বাসনাকে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করেছে। বাসনা তার সামর্থ্য অনুযায়ী বোনকে সামলাতে চেষ্টা করেছে, শাসন করেছে। বাবার কাছে বলে লাভ নেই, কাঁদ-কাঁদ মুখে বিনয়কেষ্টর কাছে নালিশ করেছে। স্বাহা তার কথা একটু-আধটু শোনে—গান গেয়ে দুজনে দুজনের উদ্দেশে মুখ ভেঙচে যা মুখে আসে তাই বলে। বিনয়কেষ্ট যদি পারে বোনটাকে সামলে-সুমলে রাখতে।

বাসনার সঙ্গে বিয়ের অনেক আগের কথা। ফলে তার নালিশটাকে একটুও ছোট করে দেখেনি বিনয়কেষ্ট। তার সাধ্যমত সে চেষ্টা করেছে স্বাহাকে আগলে রাখতে। এলে তারও নাকানিচোবানির একশেষ। গানের আসরের আবছা আড়ালে লুকিয়ে মেয়েটা মুখ ভেঙচে তার গান পণ্ড করেছে—ঘুমের মধ্যে তার বাবরি চুল দড়ি দিয়ে খাটে বেঁধে রেখেছে। বিনয়কেষ্টর শাসন করা মাথায় উঠেছে।

অগত্যা মন্টির শরণাপন্ন হয়েছিল বাসনা। তাকে কাঁদ-কাঁদ মুখ করেও বলা দরকার হয়নি, অনুনয় করেও না। রুক্ষস্বরেই জানিয়েছে, সে আখড়া বন্ধ করে দেবে, গান বাজনাও বন্ধ করে দেবে। মাসি বলেছে, বোন তার ছেলের মাথা চিবিয়ে খেলে। এখন হয় বোনের সঙ্গে নন্দর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হোক, নয়ত যে-যার পথ দেখুক।

কিন্তু এর ফল কি হতে পারে বাসনা তলিয়ে দেখেনি অত। যা বলেছে রাগের মাথায়ই বলেছে। কারণ, আখড়ার গানের আসরে বাসনার আকর্ষণ তখন প্রায় অপরিহার্য হলেও সর্বময়ী কর্ত্রী তখনো চারু বোষ্টুমী। পথ দেখার কথাটা অমন মুখ করে বাসনা একমাত্র মন্টিকেই বলতে পারে তখন।

মন্টি নন্দর ধড়টাই ছিঁড়ে নিয়ে আসার পরোয়ানা পেল যেন। একে মহিম দারোগার ছেলে ভাবী ছোট দারোগা কেদারের দুচোখের বিষ নন্দ, তার ওপর বাসনার এই কথা। বাসনা আশা করেছিল, মন্টি বড়-জোর নন্দকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে, একটু ভয় দেখাবে। বোনের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে বন-জঙ্গলে ঘোরাটা বন্ধ করবে।

আর, এদিকে সেও চেষ্টা করবে বোনকে আগলে রাখতে। তাহলেই হয়ত মাসি তুষ্ট থাকবে, নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু সেই দিনই প্রহারে জর্জরিত করে মণ্টি আর হবু ছোট দারোগা কেদু পিঠমোড়া করে বেঁধে নন্দকে বাসনার চোখের সামনে ধুপ করে দাওয়ায় এনে ফেলল। দেখে বাসনার দুই চক্ষু স্থির, মুখ ভয়ে আমসি। বাঁধন খুলে দেবার আগেই সকলের চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার করতে করতে চারু বোষ্টুমী এসে হাজির। বাসনা বললে মণ্টি কেদু তাকেও তুলে আলতো করে তার ঘরের দাওয়ায় ফেলে দিয়ে আসত। কিন্তু বাসনার উল্টোরাগ দেখে দুজনেই তারা ভড়কে গেল কেমন। চারু বোষ্টুমীর সঙ্গে যোগ দিয়ে উল্টে মণ্টিকেই গালাগাল করে উঠল বাসনা। চারু বোষ্টুমীকে বলল, ওর অত বড় সাহস, ওকে তুমি আখড়া থেকে তাড়িয়ে দাও না কেন মাসি—গাঁয়ে আর খোল বাজিয়ে নেই?

পয়সাওয়ালা মণ্টিকে এত বড় কথাটা এক বাসনা ছাড়া আর কেউ বললে কি হত বলা যায় না। রাগে সন্তাপে জর্জরিত চারু বোষ্টুমী পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখল মণ্টি আর তার পিছনে কেদু মাথা গোঁজ করে পালিয়ে বাঁচছে। মেয়েটার জোরটা কোথায় চারু বোষ্টুমী এই প্রথম যেন আঁচ করল তার দিকে চেয়ে।

কিন্তু বাসনা অগ্নিমূর্তি তখনো। নন্দর বাঁধন খুলে দিয়ে রাগের মাথায় খানিকক্ষণ ধরে স্বাহাকেই খুঁজে বেড়াল সে। শাস্তিটা স্ব-চক্ষে দেখলে মাসিও একটু খুশি হত। কিন্তু বিপদ আঁচ করে স্বাহা তার অনেক আগেই সরে পড়েছিল। দূরে কেষ্টর হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মজা দেখছে আর হাসছে। রাগে দুঃখে অসহায় মুখে মাসির দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, ওই দেখো মাসি, তোমার নিজের লোক অমন আশকারা দিলে আমি কি করব।

মাসি দেখল। দেখেও একটিও কথাও বলল না আর। এক ঝটকায় ছেলের ডানা ধরে টেনে তুলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

চারু বোষ্টুমীর বদ্ধ বিশ্বাস তার ছেলের যে লেখাপড়া কিছু হল না, আর, মানুষ হওয়ারও যে আশা নেই—সে শুধু ওই আগুন-মুখো মেয়েটার জন্য। তাও এমন কিছু ভয়ানক দুঃখের কারণ নয়। না হোক নাই হল, পুরুষ মানুষ খেটে-পিটে খাবে। কিন্তু তার ত্রাসটাই ভয়ানক। ত্রিলোচন ঠাকুরের কথা ঠিক হলে ওই মেয়েই যে সব পুড়িয়ে খাক করে দেবে একদিন তাতে আর যেন কোন সন্দেহ নেই। নইলে মহিম দারোগার ছেলে হবু দারোগা কেদু পর্যন্ত কেন এখন থেকে তার পেটের ছেলের এমন শত্রু হল।

চারু বোষ্টুমী জানে, মণ্টি আর যাই হোক বয়সে অনেক বড় ওই ছোট মেয়েটার

থেকে। পরে কি হবে বলা যায় না, এখন অন্তত ছোট মেয়েটার ওপর তার চোখ নেই। কিন্তু কেদারের আছে। কতটা আছে সেটা দেখার মত চোখও চারু বোষ্টুমীর আছে। সেই বাপেরই ছেলে তো। মেয়েটার সেই মায়ের ওপর কেদুর বাপের কি চোখ ছিল গাঁয়ে সেটা কে আর না জানে। নেহাত সেদিনের পরাণ চাটুজ্জের সঙ্গে শত্রুতায় এঁটে উঠতে পারেনি বলে—নইলে দিত আগুন জালিয়ে ভিটেসুদ্ধ ছারখার করে। কিন্তু চারু বোষ্টুমীর ছেলে কেদুর সঙ্গে এঁটে উঠবে কোন্ বলে? সে-যে দুধের শিশু। কেদুর এত রাগ কেন নন্দর ওপর সে-কি চারু বোষ্টুমী জানে না, না বোঝে না? আর, সর্বনাশী মেয়েটাও এমন যে ওই ছোঁড়াটাকে একটুও পাত্তা দেবে না—দেবে কেন, তাব ছেলেকেই খেতে এসেছে যে।

নিজের ছেলেকেই ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছে চারু বোষ্টুমী। বলেছে, ফের যদি তুই ওই মেয়ের ছায়া মাড়াবি তো আমি গলায় দড়ি দেব—

কথাটা নন্দ বুঝে নিতে চেষ্টা করেছে। ভয়ের দিকটা আঁচ করতে চেষ্টা করেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, শেষে পেতনী হয়ে আটকে রাখবি আমাকে? উপায়টাও সে তক্ষুনি বার করে ফেলেছে। বলেছে, আমি তাহলে দোলুই ওঝাকে ডাকব—কত জনের পেত্নী ছাড়িয়েছে জানিস না তো, আমি স্বচক্ষে বেল-ডাল ভেঙে পেত্নী পালাতে দেখেছি।

চারু বোষ্টুমী হাসবে না কাঁদবে? মায়ের গলায় দড়ি দিয়ে পেত্নী হওয়ার কথাও ভাবতে পারে, কিন্তু ওই মেয়েটার ছায়া না মাড়ানোটা ভাবতে পারে না। চারু বোষ্টুমী কপাল চাপড়ে বলে, হা রে কপাল, আমি মরলে ওই কেদু আর মণ্টিই যে তোকে আস্ত গিলে খাবে রে হতভাগা!

কিন্তু এইটুকু ছেলের চোখই চারু বোষ্টুমী জিঘাংসু ক্রোধে ধকধকিয়ে উঠতে দেখেছে তক্ষুনি। বলেছে, ওই কেদুকে আমি সরস্বতীর চড়ায় জ্যান্ত পুঁতব একদিন—দেখে নিস।

তবু প্রাণের দায়ে চারু বোষ্টুমী ছেলে আগলে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি। কিন্তু কোমরে শাড়ি জড়ানো মেয়েটার কোনো ফাঁক থেকে একটু সংকেত এলেই চুপি চুপি নন্দ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। ধরা পড়লে প্রকাশ্যেই ছুটে পালাবে। তারপর জঙ্গল চষে বেড়াবে দুজনে, সরস্বতীর চড়ায় ঝাঁপাঝাঁপি করবে। ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারিও কম হয় না দুজনের। বরং সেটা প্রায় নৈমিত্তিক হয়। কিন্তু নন্দর চড়-চাপড় আর স্বাহার আঁচড়-কামড়ের নিষ্পত্তি হতে এক সন্ধ্যা বা এক বেলার বেশি সময় লাগে না কখনো। নন্দকেই হার মানতে হত। মাঝের কাঁচা উঠোনে বাখারি পুঁতে সন্ধি করতে হত। মায়ের জ্বালায় আর ওদিকে বাসনার মাতব্বরীতে স্বাহাকে ডেকে প্রকাশ্যে ভাব-সাব

করার তেমন সুযোগ পেত না। সন্ধির এই সহজ রাস্তাটা নন্দই একদিন আবিষ্কার করেছিল। একবারের কড়া রকমের ঝগড়া আর হাতাহাতির ফলে পর পর দুটো দিন সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। রাগে অন্ধ হয়ে স্বাহাকে বাগানের ইঁটের খোয়া আর কাঁটা ভরতি মাটির ওপর ফেলে চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা মাটির সঙ্গে ঠুকে দিয়েছিল নন্দ। আর স্বাহাও প্রাণপণে তার চুলের ঝুঁটি সাপটে ধরে দাঁতে করে কাঁধের খানিকটা ছিঁড়ে এনেছিল।

তারপর জীবনে আর কেউ কারো মুখ দেখবে না—সেই রকমই একটা মনোভাব হয়েছিল দুজনেরই। দীর্ঘ দুটো দিনের অদর্শনে জীবনের শেষ প্রান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিল তারা। নন্দ তো বটেই, ইয়ার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে জলজ্যান্ত একটা মেয়ের রহস্য অতল-রহস্যের মতই মনে হত তার। সেই বন্ধুরা স্বাহার কথা তুলে যা-সব জিজ্ঞাসা করত আর ইঙ্গিত-ইশারা করত—শুনলে চারু বোষ্টুমী ছেলের আশা গোটাগুটিই ছাড়ত বোধহয়। কিন্তু সে-সব কথাই জীবনের সারকথা ভাবত নন্দ, আর যাকে নিয়ে সেই কথা ফাঁক পেলেই তাকে বিশ্লেষণ করে দেখত। হাত ধরে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কিছু একটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করত। কাজেই দুদিনের অদর্শনটা তার কাছে দু'শ বছরের অদর্শন মনে হয়েছিল। ওদিকে স্বাহার মনও নরম হয়েছিল একটু। তাই সেই আপসের ধারাটাও একটু ভিন্ন রকমের হয়েছিল। স্বাহার কোঁচড় ভরে মিষ্টি কামরাঙা পেড়ে দিয়েছিল নন্দ, মগডালে উঠে অনেক পিঁপড়ের কামড় খেয়ে বড় বড় থোকা থোকা ধপধপে জামরুল পেড়ে দিয়েছিল। তারপর নেমে আসতেই সন্ধির একটা নতুন উপায় মাথায় এসেছিল তার। কারণ, স্বাহা বলেছিল, নন্দর মত সে-ও ভাব করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে নন্দ যখন দুধ-রঙা জামরুলের থোকা হাতে নিয়ে গাছের ওপর থেকে আবারও জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি কি না—জিবের জল আটকে স্বাহা কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় বেঁকিয়ে অম্লান বদনে সায় দিয়েছে, সত্যি।

মনের আনন্দে নন্দ সন্ধির উপায় বাতলেছে। ঝগড়াঝাঁটি মারামারি একটু-আধটু হবেই জানা কথা—তখন কথাও বন্ধ হবে। কিন্তু তারপর যারই ভাব করতে ইচ্ছে হবে সে উঠোনে এসে বাখারি পুঁতে দেবে। মুখের একটি কথারও দরকার নেই। তারপর বাগানে এসে একজন আর একজনের জন্য অপেক্ষা করলেই হল।

জামরুলে কামড় বসাতে বসাতে স্বাহা অম্লান-বদনে তেমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। অর্থাৎ সেটাই সু-ব্যবস্থা।

কিন্তু সন্ধির বাখারি আজ পর্যন্ত এক তরফা নন্দকেই পুঁততে হয়েছে। ভাবের সময় নন্দ এই নিয়েও অনেক অনুযোগ আর অভিমান করেছে।

নন্দর সঙ্গে অবাধ মেলামেশাটা তার দিদি আর বোষ্টুমী মাসির চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে সেটুকু অবশ্য স্বাহা বুঝতে পারত। কিন্তু এর নিগূঢ় কারণটা স্পষ্ট ছিল না খুব। কারণ নিয়ে তেমন মাথাও ঘামায়নি। দিদির ভ্রূকুটি আর বোষ্টুমী মাসির কটুক্তি নস্যাৎ করে চুপিসারে এসে মিলতে পারাটাই ভারী একটা উল্লাসের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এদিকে দিদি জব্দ, ওদিকে তার থেকেও বেশি জব্দ বোষ্টুমী মাসি। যে-দিন বেশি কড়াকড়ি সেদিনই জব্দ করার ঝোঁকটা দ্বিগুণ হত। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন গোপন জায়গায় নন্দর সঙ্গে এসে মেলার সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দে স্বাহা প্রথমে খুব হাসত এক দফা হি-হি করে। তারপর মুখ মচকে হয়ত নন্দকে বলত, তুই আমার সঙ্গে মিশিস কেন, তোর মা বলে তোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব আমি।

এ-সব কথা শুনলে নন্দ বেশির ভাগ দিনই স্বাহাকে শুনিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস বোঝার মত মতি নয় দেখে সেদিন স্বাহার কাঁধ ধরে ফিসফিস করে বলছিল, চিবিয়ে তো খাচ্ছিস না, কবে আর খাবি—

উঃ! নাক মুখ কুঁচকে স্বাহা দু'হাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তাকে, তোর মুখে বিড়ির গন্ধ!

পূর্বরাগের প্রথম মুহূর্তে কোন বাঞ্ছিতা এ-ধরনের ছন্দ-পতন কখনো ঘটিয়েছে কিনা নন্দর জানা নেই। কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে থেকে কতকগুলো পেয়ারা পাতা ছিঁড়ে নিজের মুখে পুরে দিয়েছিল। সেগুলো চিবিয়ে ফেলে দিয়ে আবার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এবারে আয়—

কোথায় যাবে স্বাহার স্পষ্ট বোধগম্য হয়নি। নন্দর হাবভাব কেমন যেন লেগেছে। কিছু না বুঝেই বলেছে, ভাগ, তোর কাছে আমি আসতে যাব কেন—

যে-বয়সে মেয়েরা এ-সব একটু-আধটু অনুমান করতে শেখে, স্বাহার সেই বয়সই প্রায় তখন। কিন্তু যে-মেয়ে অজ্ঞান বয়সে মা হারিয়ে আর জ্ঞান অবধি বাবাকেও জীবন-মৃত দেখে রশি-ছেঁড়া হরিণীর মত বন-বাদাড় নদীর চড়া আর মাঠ-ঘাট চষে বেড়াচ্ছে, তার বয়ঃসন্ধি আর মনঃসন্ধিতে কিছু বিলম্ব ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বিলম্ব আরো হতে পারত, কিন্তু সে আবার ওই পারিপার্শ্বিক কারণেই হয়নি। সম্প্রতি নন্দর হাবভাব, কেতুর প্যাচপেচে চাউনি, দিদির বকুনি আর বোষ্টুমী মাসির অকথা-কুকথা—এই সব থেকেই কেমন একটা রহস্য জমাট বেঁধে উঠছে তার মধ্যে। তাছাড়া নিজের মধ্যেও অস্পষ্ট ইশারার মত কি একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করছে স্বাহা। তার ভিতরে ভিতরে কিছু যেন একটা ঢেলে সাজার কাজ চলেছে। কেবলই মনে হয়, সে যা ছিল শিগগীরই আর তা থাকবে না।

বয়স্কদের মধ্যে স্বাহার একমাত্র মনের মিল কেষ্টদাদার সঙ্গে। স্বাহার মতে ভালো লোক বলতে এই একজনই আছে। হাজার অত্যাচার করে গেলেও যে-লোক একটুও রাগ করে না, শুধু হাসে—সে ভালো লোক না তো কী? খুনসুড়ি ছেড়ে স্বাহার অনেক সময় অনেক গুরু গম্ভীর কথাও হয় তার সঙ্গে। দিদির সঙ্গে কেষ্টদার বিয়ে হবে এমন একটা কথাও কানে আসছিল তার। আর কার মনে কি হয়েছিল জানা নেই, ও নিজে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। এ-হেন কেষ্টদাও নিতান্ত ঠাট্টার ছলেই ওকে সেই অজ্ঞাত অস্পষ্ট রহস্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে এক প্রস্থ।

দিদির হাতে মার খেয়ে মুখ গোমড়া করে স্বাহা কেষ্টদার কাছে এসে বসেছিল একদিন। বিনয়কেষ্টও ছদ্ম অনুশাসনে চোখ রাঙিয়েছিল, কেন অত মাখামাখি করিস ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে?

বেশ করব, হাজার বার করব, তোমার তাতে কী?

বিনয়কেষ্ট সবিনয়ে স্বীকার করেছে তার কিছু নয় বটে, তবে ওর দিদিকে এজন্য মাসির কাছে অষ্ট প্রহর গঞ্জনা সইতে হয়।

রাগ একটু পড়তে গঞ্জনার কারণটা স্বাহা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরেই আবছা পরদা একটা পড়েই আছে যেন। শেষে স্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় বলে উঠেছে, কেন? মাসি গঞ্জনা দেয় কেন? আমরা তো শুধু ঘুরে বেড়াই আর ফল খাই, তাতে কী হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কেষ্ট হেসে উঠেছে। জোর হাসি নয়, জোরে সে হাসে না বড়। নরম নরম হাসি। সেই হাসিভরা চোখ দুটো স্বাহার সর্বাঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছে একবার। তারপর এদিকে ওদিকে চেয়ে চটপট চাপা গলায় গান বানিয়েছে :

রাধে, ফল খাওয়া ভালো নয়,
ও-ফল খেলে অসুখ হয়।
ওই ফলের ফল ধরলে পরে
রাজার বদ্যি কিছু নয়।

পাছে কেউ শুনে ফেলে বিনয়কেষ্টর সেই ভয়। কিন্তু রাগ তাপ ভুলে স্বাহা হি-হি করে হেসে গড়িয়েছে একেবারে। কেষ্টদাদাকে এই জন্যই এত ভালো লাগে তার। কিন্তু নিরিবিলিতে সেই অস্পষ্ট পরদাটাই কিছু যেন হালকা হয়েছে, কিছু যেন উপলব্ধি করতে পেরেছে।

আরো বেশি পেরেছে সেই দিনই বিকেলে। নন্দর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সে-দিন একেবারে গোয়ালফেলানীর শ্মশানে গিয়ে হাজির হয়েছিল তারা। শ্মশান সম্বন্ধে স্বাহার অনেক দিনের কৌতূহল। অনেকদিন বলেও নন্দকে রাজি করাতে

পারেনি। তার অপদেবতার ভয়। সেদিন আসন্ন সন্ধ্যায় বলতে গেলে স্বাহাই এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। নন্দর কাছে স্বাহা কেষ্টদার ফল-খাওয়ার গানের গল্প করছিল আর হাসছিল। শুনে নন্দও হাসতে চেষ্টা করছিল, হাসি আসছিল না। আনন্দ হচ্ছিল খুব, কিন্তু সে-আনন্দটা যেন স্পর্শাভিরাম জ্বালার মত। জিভ আর গলার ভিতরটা শুকনো লাগছিল নন্দর। স্বাহার সেদিনের গোয়ালফেল্গানীর শ্মশান দেখে আসার প্রস্তাবে আপত্তি করেনি সে। অনেকটা পথ, অনেকক্ষণের নিরিবিলি সঙ্গের প্রত্যাশা। সরস্বতীর পাড় গড়িয়ে চড়ায় আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাহার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল। শ্মশানে যাওয়ার এটাই একমাত্র সর্ত যেন। নতুন স্থানে হানা দেওয়ার রোমাঞ্চে স্বাহা সেদিন আর আপত্তি করেনি। হাতে মাঝে মাঝে একটু জোরেই চাপ পড়ছিল—তাতেও না। একবার শুধু ঘুরে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর ভয় করছে নাকি ?

নন্দ জবাব দেয়নি। ভয়-ডর আর একটুও ছিল না। কিন্তু নিরুত্তর থেকে ভয়-ভয় যে করছে সেই ভাবটাই দেখালো। নরম ঈষদুষ্ণ হাতের ওপর ওর হাতের মুঠোটা আরো একটু শক্ত হল।

শ্মশানে রোজ চিতা জ্বলে না। কিন্তু সেদিন জ্বলছিল একটা। শব দাহ হচ্ছিল। স্বাহা বিস্ফারিত চোখে দেখছিল চেয়ে চেয়ে। জ্বলন্ত কাঠগুলোর নিচে দেহটা কোথায় ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছিল না। নন্দই এক সময় দূরে সরিয়ে নিয়ে এলো তাকে, এদিকে আয়, পোড়া গন্ধ লাগছে—

দূরে দাঁড়িয়ে আরো খানিকক্ষণ নিবিড় চোখে চিতার আগুন দেখেছিল তারা। তারপর নন্দর হঠাৎই এক উদ্ভট প্রস্তাবে দেখার তন্ময়তায় ছেদ পড়েছে স্বাহার। তার হাতখানা যেন ওর সম্পত্তি। হাত বগলদাবা করে সে বলেছিল, তোতে আমাতে অমনি এক চিতায় পুড়ে মরলে কেমন হয় রে ?

আবছা অন্ধকার ঠেলে দু'চোখ টান করে স্বাহা এই প্রথম ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেছিল তাকে। খিল খিল হাসি তারপর। সহমরণ কথাটা শোনা ছিল, বলেছে, তোর সঙ্গে কি আমার বিয়ে হয়েছে যে সহমরণে যাব ?

কিন্তু চিতা দেখে নন্দর মাথায় ভূত চেপে ছিল। এমন একটা পরিকল্পনা আর যেন হয় না। সাগ্রহে বলেছিল, মরবি ? চিতা জ্বেলে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা, এক চিতায়—ওর ডবল আগুন হবে, চমৎকার হবে! শ্মশানে যেদিন কেউ থাকবে না সেদিন। আসবি ?

কেমন করে ওর ডবল চিতা জ্বালবে, কেমন করেই বা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে

দুজনে সে-প্রশ্ন অবান্তর। স্বাহা প্রথমে ভাবল শ্মশানে এসে নন্দদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের হাতের দুরবস্থা দেখে মনে হল, মাথা খারাপ হয়নি, আর কিছু হয়েছে। আর তখনি সেই অস্পষ্টতার পরদাটা প্রায় চোখ-চলে এমনি হালকা পাতলা হয়ে গেছে যেন।

জবাব দিয়েছে, তুই আগে পড় ঝাঁপিয়ে, আমি দেখি, তারপর—।

এই এক কথাতেই নন্দর ঝোঁক কেটে যাওয়ার দাখিল।—তুই ঝাঁপাবি না কলা, তুই দৌড়ে পালাবি তারপর।

পরের অপেক্ষা রাখেনি, এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্বাহা হন হনিয়ে বাড়ি-মুখো হয়েছিল তক্ষুনি।

ভর-সন্ধ্যেয় শ্মশান মাড়িয়ে আসাটা চারু বোষ্টুমী জানতে পারল কেমন করে। কেউ দেখে খবর দিয়ে থাকবে তাকে। শুনে চারু বোষ্টুমীর গায়ের রক্ত জল। জনবল না থাকলে দিনের আলোয় যেখানে যেতে চায় না কেউ—বার সন্ধ্যায় কিনা হতচ্ছাড়া ওই নাচুনীর আঁচল ধরে নির্বিবাদে সেখান থেকে ঘুরে এলো! চারু বোষ্টুমী ভয়ে কত বার শিউরে উঠল ঠিক নেই। রাজ্যের অশুভ ইঙ্গিত চারদিক থেকে ছেঁকে ধরতে লাগল তাকে।

চারু বোষ্টুমী আর কটূক্তি ক'ল না, আর বকাবকি ক'ল না। অনেক করেছে—এই করে যে কিছু হবে না মর্মে মর্মে বুঝেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে পর পর ক'টা দিন ভেবেছে শুধু। আর কথা নয়, আর কান্না নয়—পথ একটা না বার করলেই নয়।

অনেক মাথা খাটানোর পর চারু বোষ্টুমী আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। বুকের ত্রাসে সেই আলোটাই একমাত্র ত্রাণের আলো ভেবেছিল। এই বিপদে শেষে হঠাৎ ত্রিলোচন ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল তার। চেষ্টা-চরিত্র করে ছেলেকে শেষ পর্যন্ত সে ত্রিলোচন ঠাকুরের হাতে সঁপে দিয়ে এলো একদিন।

প্রথম মৃদু আপত্তি করে ত্রিলোচন ঠাকুর শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। ঠাকুরের নাম ডাক যশ আরো বেড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়েসটাও আরো খানিকটা বাড়তির দিকে গড়িয়েছে। এই বয়সেও ভক্ত জোটে, কিন্তু রস জোটে না। পুরনো ভক্তিমতীরাই সেই রসের সমঝদার ভালো।

দিন যায়।

নন্দ ঝাড়-ফুঁক তুকতাক শেখে, হাত দেখা কোষ্ঠী দেখার পাঠ নেয়। কতটা শেখে আর কতটা নেয়, সেটা গুরু জানেন আর শিষ্য জানে। আশ্বাসটুকুই মস্ত সম্বল চারু বোষ্টুমীর। ছেলেটার নাকি এদিকে ঝোঁক খুব—লেগে থাকলে হবে কিছু। কিন্তু মায়ের কাছ-ছাড়া ছেলে অনেকভাবে বিগড়য়, মায়ের স্নেহও দরকার, শাসনও দরকার।

এমনিতেই তো দুরন্ত ছেলে। কাজেই মাকে অর্থাৎ চারু বোষ্টুমীকে মধ্যে মধ্যে এসে দেখাশুনা করে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন ত্রিলোচন ঠাকুর।

চারু বোষ্টুমী পরামর্শটার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। বুড়োর রস দেখে মনে মনে হেসেছে। কিন্তু ঠাকুরের দৈব ক্ষমতার সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র সংশয় নেই। ছেলের হয় যদি কিছু, মাঝে-সাজে এসে দুজনকেই দেখাশুনা করে যেতে তার একটুকুও আপত্তি নেই।

অসৎসঙ্গের ভয়ে গোড়ায় গোড়ায় নন্দর গলায় কড়া শাসনের শেকল পরিয়ে রেখেছিলেন ত্রিলোচন ঠাকুর। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতে হত তাকে। পয়সার তাগিদে আসতেই হত মাঝে মধ্যে। তখন বলত, অষ্টপ্রহর গুরুর সেবা করাটা যাও সয়, গুরুর খড়মের প্রহার আর সয় না। শুনে মায়ের মনে লাগত, সান্ত্বনা দিয়ে বলত, মুখ বুজে লেগে থাক বাবা, শিখে নে, কত বড় গুণী লোকের আশ্রয়—নিজে বলেছেন তোর ভালো হবে।

নন্দ যাতনা সয়েও পড়ে আছে ভালো হবে বলে নয়, ভালো হচ্ছে বলে। নইলে বুড়োর মাথাটা দুফাঁক করে দিয়ে চলে আসত এত দিনে। গুরু যতই খড়ম-পেটা করুক, ত্রিলোচন ঠাকুরের শিষ্য বলে গাঁয়ের আর পাঁচজনের কাছে এরই মধ্যে একটু-আধটু কদর হয়েছে তার। বিশেষ করে, বুড়ো-বুড়ীদের কাছে। এখন দেখলেই আর আগের মত অস্ফুট কটু-কাটব্য করে না কেউ, হেলাফেলা করে না। মস্ত ভবিষ্যত-দ্রষ্টা হয়ে উঠছে, যেখানে-যেখানে সম্ভব চারু বোষ্টুমী সেটা প্রচার করেছে। নিজের উক্তি নয়, ত্রিলোচন ঠাকুরের নাম করে বলেছে।

এই সঙ্গে নন্দর নিজের আবিষ্কারটাও কম নয়। ভবিতব্যের প্রতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভয়-মেশানো একটা দারুণ কৌতূহল দেখেছে এরই মধ্যে। পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হলেই তারা কাছে ডাকে, হাত দেখায়, আপদ-বিপদের কথা বলে। সমবয়সী ছেলেদের অনেকে গোপন ব্যাধি আহরণ করে গোপনে এসে তার শরণাপন্ন —এমন কি সিকিটা আধুলিটাও গুঁজে দেয় কেউ কেউ ত্রিলোচন ঠাকুরের কাছ থেকে শুধু হাত-সাফাই করে আনার জন্য।

এই পরিচিতিটুকুই মস্ত আকর্ষণ নন্দর। এই জন্যই নির্যাতন সয়েও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায়। লোকে চিনছে তাকে।

কিন্তু প্রবৃত্তি-ক্ষুধা ভিন্ন বস্তু।

নন্দর এই প্রবৃত্তির তাড়না নির্মূল করতে পারেন এত ক্ষমতা ত্রিলোচন ঠাকুরের নেই। চারু বোষ্টুমী জানে, ছেলে মাঝে-মধ্যে পয়সার জন্য আসে। কিন্তু আর এক টানে তার থেকে যে অনেক বেশি আসে সেটা সব-সময় টের পায় না।

আসত স্বাহাকে দেখতে। সেটা কখনো গোপন থাকে, কখনো থাকে না। বিকেলে সরস্বতীর চড়ায় দেখা হয়, দুপুরে ফল-বাগানেও। কিন্তু স্বাহা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন। আগের মত আর তেমন আমল দিতে চায় না ওকে। অবজ্ঞাই করে যেন। কখনো চোখ রাঙায়, দাঁড়াও পেছু নিয়েছ মণ্টিদাকে বলছি। বললে মার খাবে জানে, মার খাইয়েছেও অনেক দিন।

রাগে ওর মুখটা থেতলে দিতে ইচ্ছে করে নন্দর। কোনদিন বা ফাঁক পেলে বসিয়ে দেয়ও দুই এক ঘা, না পেলে চোখ দিয়েই ভস্ম করতে চায়। তাকে রাগতে দেখলে স্বাহা কখনো হাসে হি হি করে, কখনো বা কিল দেখায়। ছড়া কাটে, ফুলের শোভা ভোমরা, গাইয়ের শোভা চমরা। চমরা অর্থাৎ ল্যাজের চামর। নন্দ বাবরি চুল রাখতে শুরু করেছে সম্প্রতি। রাগ করে নন্দর মা-ই এই টিপ্পনী কেটেছিল একদিন। শুনে স্বাহা হেসে গড়িয়েছিল।

তবু নন্দ আসত। নিবিবিলি সাক্ষাতের লোভে না এসে পারত না। সে আসত আগুনের মোহে পতঙ্গের মত। এ জন্য নাজেহাল কম হয় না। তার ভুরুর ওপরে সেবারের সেই নিগ্রহের কালশিরে ছ'মাসেও মেলায়নি।

স্বাহার সঙ্গে নন্দর সেই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল পিছনের ফলবাগানে, দুপুরে। একটা পেয়ারা গাছের নিচু ডালে পা ঝুলিয়ে বসে স্বাহা উদাসীন-নিবিষ্টতায় পেয়ারা চিবুচ্ছিল। তার শাড়ির কোঁচড়ে একরাশ পেয়ারা।

সেইক্ষণে আবির্ভাব নন্দর। এমন নিরিবিলি দর্শন লাভের আনন্দে মুখে একগাল হাসি।

এই বনবাদাড়ে একা ঢোকা হয়েছে?

একা ঢুকব না তো কি তোকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকব? এমনিতে আজকাল তুমি বলে নন্দকে, রাগলে তুই। এই সময়ে এখানে এই মূর্তি দেখে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তির মত হচ্ছিল তার। সেটাই রাগের কারণ।—তুই চোরের মত এখানে এসেছিস কেন?

নন্দ বলল, আমার খুশি আমি আসব, এটা তোর বাগান?

কোঁচড়ে যা আছে, তার একটা ছুঁড়ে মারলেই কার বাগান ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা না করে স্বাহা নিবিষ্টমনে পেয়ারা চিবুতে লাগল। হাতে মস্ত বড় ডাঁশা পেয়ারা একটা।

নন্দও দু'চোখ ভরে দেখছে কিছু। দেখছে না গিলছে। আবারও ভয় দেখাতে চেষ্টা করল সে, দাঁড়া বাসনাকে গিয়ে বলছি।

যা বলগে যা, তোর নিজের বাসনার কথাও বলিস।

নন্দ হাসতে লাগল দাঁত বার করে। এই জন্যই এত ভালো লাগে। স্বাহা

আগুন নয় শুধু, ওর কথাগুলোও আগুন-আগুন। নন্দ সন্ধির চেষ্টা করল। বলল, নেমে আয় না, তোর হাতটা দেখি একবার, অনেক নতুন রেখা চিনেছি।

হাত দেখতে হবে না, পা ত্মাখ্।

ঝুলন্ত পা দু'খানা গোড়া থেকেই দেখছে নন্দ। নাগালের মধ্যেই। স্বাহার এক হাতে পেয়ারা, অন্য হাতে কোঁচড় ধরা। দুই পা ধরে নন্দ আচমকা হ্যাঁচকা টান লাগালো একটা। হুমড়ি খেয়ে স্বাহা একেবারে তার গায়ের ওপরে। প্রস্তুত ছিল বলেই অর্ধধরাশায়ী হয়েও নন্দ উঠে দাঁড়াল চট করে। স্বাহার আঁজলার পেয়ারা মাটিতে গড়াচ্ছে—ডান হাতে ডাঁশা পেয়ারাটা আছে শুধু।

তার বাঁ-হাতখানা নিজের দুই হাতের দখলে নিয়ে নন্দ আপসের সুরে বলল, সত্যি পড়ে যাবি ভাবিনি, লেগেছে ?

লাগার কথা ওর নিজেরই। লাগলে স্বাহা খুশি হত। অত রাগও হত না। শোধটা এখুনি নিতে পারে, কিন্তু কি ভেবে ইচ্ছাটা দমন করল। মনে হল প্রহসনের আরও কিছু বাকি। ডাঁশা পেয়ারাটা আবার মুখে তুলল।

অন্য হাত নন্দর হাতে। তাও টেনে নিল না।

হাত দেখার জন্যই যেন হাত ধরেছে নন্দ। হাত মেলে চোখের সামনে ধরেছে। অল্প আলোয় দেখার অসুবিধে হচ্ছে বলেই কাছে টানছে একটু একটু করে।

দাঁতের থেকে পেয়ারাটা নামেনি স্বাহার। আড়ে আড়ে হাত দেখা দেখছে তার। কিন্তু বাগানের ছায়ায় হাতের রেখা বিচার করা এত সহজ নয়। আলোর অভাবটা ক্রমশ নন্দর বেশি মনে হচ্ছে। তাই স্বাহার হাতখানা কাছে টানছে আরো। টিপে টিপে দেখছে, আঙুলের ঘষায় ঘষায় রেখা আবিষ্কার করছে। সেই দেখার তাড়নায় তার নিজের হাত দুটোই ঘেমে উঠছে, কাঁপছেও একটু, দু'চোখ চকচকিয়ে উঠেছে। একখানা হাত স্বাহার ধরা হাতখানার বাহুর দিকে এগিয়ে আসছে গুটিগুটি।

উঃ !

দুই হাতে কপাল চেপে আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল নন্দ। চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার। সেই আঘাতে স্বাহার হাতের আধ-খাওয়া ডাঁশা পেয়ারাটাও ফেটে চৌচির।

নন্দর চোখ থেকে অন্ধকারের ঘোর কাটল যখন, ধারে কাছে তখন দ্বিতীয় প্রাণীর চিহ্নও নেই।

বাগান থেকে মায়ের আশ্রয়েই আসতে হয়েছে নন্দকে। চোখটা অল্পের জন্য বেঁচেছে, কিন্তু যা হয়েছে ভুরু আর কপালের অবস্থা, সেই মূর্তিতে গুরুগৃহে গেলে

এরই ওপর পিঠে আবার খড়ম ভাঙবে। বাসনা উপস্থিত না থাকলে মন্দ ঘটনাটা মায়ের কাছে হয়ত গোপনই করত। যা হোক কিছু বলে দিত। কিন্তু বাসনাকে দেখে রাগ চাপা সম্ভব হয়নি তার। স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, যাহাকে সে খুন করে ফেলবে একদিন, খুন করে মাটিতে পুঁতবে।

ছেলের কপালের দিকে চেয়ে ত্রাসে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল চারু বোষ্টুমী। বাসনাও শিউরে উঠেছিল। কিন্তু কি জানি কেন, চারু বোষ্টুমী একটা কথাও বলেনি। বোনের দায়ে বাসনাকে হামেশাই গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। ভয়ে তার মুখ শুকিয়েছিল। কিন্তু চারু বোষ্টুমী তাকে কিছুই বলল না। ছেলের শুশ্রূষায় মন দিল। তারপর নিজেই ত্রিলোচন ঠাকুরকে খবর দিয়ে এলো, ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দু'-চারদিন পরে আসবে।

সেই দিনই চারু বোষ্টুমীর প্রথম মনে হয়েছে, ছেলেকে সরিয়ে কোন লাভ হয়নি। আর মনে হয়েছে, তারও এখানকার আশ্রয় ছেড়ে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। মায়ের প্রতিশোধ-বৃত্তি ওই ছোট মেয়েটা পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস। সেই প্রতিশোধের কথা মনে হলে এত বছর পরে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। ছেলেকে কেন্দ্র করে পুরানো বিভীষিকার ছায়াটা আবারও পেয়ে বসছে তাকে। ত্রিলোচন ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী খচখচিয়ে বুকের মধ্যে বিঁধছে।

এর ওপর বিনয়কেষ্টর সঙ্গে বাসনার বিয়ের পর মন্টির চাপা আক্রোশ সবটাই যেন চারু বোষ্টুমীর ঘাড়ে এসে পড়ল। এতটা হবে ভাবেনি। বিনয়কেষ্ট ছোঁড়াটার গুরুস্থানীয়। তাছাড়া বাসনা মেয়েটাও গম্ভীর গোছের। মন্টিকে তেমন প্রশ্রয় কখনো দিতে দেখেনি। মন্টিই বরং কিছুটা সমীহ করে চলে মেয়েটাকে লক্ষ্য করেছিল। বিয়ের পর মন্টির ক্ষোভের আঁচ পেয়ে চারু বোষ্টুমী হকচকিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সরাসরি ছোঁড়াটা এ নিয়ে কখনো কিছু বলেনি তাকে।

কিন্তু চারু বোষ্টুমী বুঝতে পারে। পুরুষ মানুষের মুখের দিকে চেয়ে মনের কথা বুঝতে পারে সে। বয়সে বিনয়কেষ্টর সঙ্গে বাসনার অনেক তফাত। বিনয়কেষ্ট কিন্তু কিন্তু করেছিল। তার মৃদু 'কিন্তু' চারু বোষ্টুমী কানে তোলেনি। বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়ে বিনয়কেষ্টকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। সে সহায় থাকলে কিছুটা নিরাপদ। এ ব্যাপারে মন্টির দিকটা বড় করে ভাবেনি, ভাবলে তাকেই দলে রাখতে চেষ্টা করত হয়ত। কথাটা মনে হতে নিজের ওপরেই রাগ হয়েছে তার, বিনয়কেষ্ট তো বশেই ছিল, তাকে নতুন করে বশে রাখার দরকার ছিল না কিছু।

চারু বোষ্টুমীর খেদ, কপাল মন্দ হলেই সময় কালে বুদ্ধিভ্রংশ হয় মানুষের। নইলে এ-রকম ভুল তার হবে কেন! তার চোখ তো কম ধারালো নয়। মনে মনে

ভয় করলেও মণ্টিকে বাইরের লোকই ভাবত। সেই বাইরের লোককে ঘরের লোক করে নেবার কথাটা একবারও তার মনে হল না কেন! অথচ চারু বোষ্টুমী না জানত কি? বাসনা কোনদিন গানের আসরে না এলে মণ্টির খোলের হাতের আড় ভাঙত না. গান গাইতে গাইতে মণ্টির সঙ্গে মেয়েটার কখনো চোখোচোখি হলে দাম্ভিক ছোঁড়াটা যেন কাদার তাল। মনে মনে বাসনার বুদ্ধির তারিফ করত চারু বোষ্টুমী – আসকারা দিলে ও ছোঁড়া ঠিক ওর মাথায় পা দিত। দেয় না বলেই পায়ে মাথা নুইয়ে আছে। এক-ঘর লোকের সামনেও এই সেদিন বাসনা যে হেনস্থা করেছিল ছোঁড়াটার, দেখে চারু বোষ্টুমী পর্যন্ত হাঁ হয়েছিল। গান দিব্যি জমে উঠেছিল। তারই শেখানো গান গেয়ে মেয়েটা খুব বাহবা কুড়োচ্ছিল। আখরে আখরে ঘর ভরতি লোক উল্লাসের গুঞ্জন তুলছিল। আর সেই গানের ঝোঁকে খোল বাজিয়ে মণ্টির সঙ্গে বার-কতকই চোখাচোখি হয়েছিল মেয়েটার। কিন্তু হঠাৎ গান থামিয়ে অতগুলো লোকের সামনে সরাসরি অপমান একেবারে। গান বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে এক লহমা দেখে নিয়ে বলল কিনা, বসে বসে খোলের ক-খ শেখো আগে তারপর আসরে বাজাতে এসো—

সভার মধ্যে ছোঁড়াটা লজ্জায় অপমানে ঘেমে সারা।

বিয়ের পরে নয়, বিনয়কেষ্টর সঙ্গে বাসনার বিয়ের রাতেই চারু বোষ্টুমীর মন বলেছে, চালে ভুল হয়ে গেল। পরাণ চাটুজ্জে বিয়ের প্রস্তাবে এক-কথায় ঘাড় নেড়েছে। তার মতামতের যদিও দাম কিছু নেই আজকাল, তবু বিনয়কেষ্টর করুণার ওপরেই বলতে গেলে বেঁচে আছে সে। প্রকাশ্যে আর গোপনে যত আফিম সেই জোগায়। তাই প্রস্তাব শুনে সে হৃষ্টচিত্তে সায় দিয়েছে। বাসনার ইচ্ছে অনিচ্ছে অবশ্য জানতে চেষ্টা করেনি চারু বোষ্টুমী। বাসনা জানার আগে যেমন গম্ভীর—জানার পরেও তেমনি। তার মন বুঝতে চেষ্টা করা দূরে থাক, চারু বোষ্টুমী বরং মেয়েটার ভাগ্যির জোর ভেবেছে। দোকান পরাণ চাটুজ্জের হলেও সে-দোকান চালায় কে, কে এই সংসার টানছে আর আখড়া টানছে? সোনার টুকরো ছেলে না হলে ভিটেয় এতদিনে ঘুঘু চরত। বাপ আর মেয়েদের শুনিয়ে চারু বোষ্টুমী প্রকাশ্যেই অনেকবার বলেছে সে কথা—বলে বিনয়কেষ্টকে তোয়াজ করেছে।

বিয়ের ক'টা দিন আগে থেকেই মণ্টির মুখ থমথমিয়ে ছিল। নিয়মিত আসরে পর্যন্ত আসেনি। তারপর বিয়ের রাতে সন্ধ্যে থেকে সেই যে দূরে বকুলতলায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে এক পা'ও নড়েনি। ছাদনাতলার ধারে ঘেঁষেনি। সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বিয়ে দেখেছে, লোকজনের আনাগোনা দেখেছে। আর তাই দেখে সেই রাতেই চারু বোষ্টুমীর বুক শুকিয়েছে।

সেই থেকে কোন একটা কাজের কথা বললে মণ্টি সাফ জবাব দেয়, পারবে না। অথচ চারু বোষ্টুমী আগের মতই নরম মুখে কথা বলে তার সঙ্গে, আগের থেকেও মিষ্টি করে বলে। তার টাকা আছে, তাই সবাই মিষ্টি কথাই বলে তার সঙ্গে। চারু বোষ্টুমী ভালো কথা বললেও সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, মন্দ-কথা বলার তো উপায়ই নেই।

কিন্তু এসব চারু বোষ্টুমী গায়ে না মেখে মাটি কামড়ে পড়ে থাকত, যদি না ছেলেটাকেও আবার নতুন করে গঞ্জনা দিতে শুরু করত ওরা। আর হতভাগা ছেলেরও দু'দিন এ গাঁয়ের মুখ না দেখলে রক্তে ঘুন ধরে যেন। মারুক ধরুক আসবেই আসবে। সব-সময় মুখ বুজে মার যে খায় তাও না, ফাঁক পেলে শোধও নেয়।

সেদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাওয়ায় এসে বসেছিল মণ্টি। পায়ের গাঁটের কাছটা ধুমসো ফোলা। দুই চোখে সাদা আগুন। চারু বোষ্টুমী দেখেই কেমন করে জানি বুঝেছে কার কীর্তি। মুখ শুকিয়ে বলল, আ-কপাল, কেমন করে লাগল?

নন্দ পাথর ছুঁড়ে গাছের নারকোল পর্যন্ত পাড়তে পারে চারু বোষ্টুমীর অজ্ঞাত নয়। মণ্টি বলল, তোমার ছেলেকে গিয়ে এবারে নিজের হাত আর নিজের কুষ্টিট একবার দেখে রাখতে বলে এসো। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

বালাই ষাট! চারু বোষ্টুমী শিউরে উঠেছিল। তারপর রুক্ষ-কণ্ঠে বলে উঠেছিল, তোমার থেকে তো কম করে সাত-আট বছরের ছোট, তুমিই বা যখন-তখন লাগো কেন ওর সঙ্গে?

এ-রকম কথা মণ্টি শুনে অভ্যস্ত নয়। পায়ে হাত বোলানো থামিয়ে খানিক চেয়েছিল তার মুখের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা জবাব দিয়েছে, কাঁধে করে এবারে ওকে গোয়ালফেলানীর শ্মশান পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব, তারপর আর লাগব না।

চারু বোষ্টুমী আর দাঁড়ায়নি, ত্রস্ত চলে গেছে সেখান থেকে।

ছেলের অপরাধের সকল বৃত্তান্ত চারু বোষ্টুমী জানে না। মেঘলা দিনের আকাশ, রোদ ছিল না। দুপুরে সরস্বতীর চড়ায় গিয়ে বসেছিল স্বাহা। চড়াটা পায়ে চলা রাস্তা থেকে নিচে, কাজেই এ-ধার থেকে দেখা যায় না। সেদিন স্বাহার হাতে পেয়ারা ছিল না, তাছাড়া প্রস্তুতও ছিল না সে। আচমকা নন্দ তার দুটো হাতই শক্ত করে ধরে ফেলেছিল। স্বাহার রাগ দেখে নন্দ অনুনয়-বিনয় করেছে খানিক, নিজেও রেগে গেছে শেষে। রেগে মেরেছে ওকে। অন্তত স্বাহার সেই রকমই নালিশ মণ্টির কাছে। আর বিচ্ছিরিভাবে নাকি গায়ে হাত দিতেও চেষ্টা করেছে।

স্বাহার দিকে চেয়ে চেয়ে বিচ্ছিরিভাবে গায়ে হাত দেওয়ার কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেছিল মণ্টি। স্বাহাকে সেই প্রথম যেন নতুন চোখে দেখেছে। তার এক হাতে নন্দর বাবরি চুলের মুঠি ধরা, অন্য হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে নন্দর একখানি বাহু। নন্দ পালাবার আগেই মণ্টির হাতে ধরা পড়েছিল।

অভিযোগ শুনে মণ্টি স্বাহার সামনেই বিচার করেছিল তার। চুলের গোছা আর একটা কান ছিঁড়ে আনার উপক্রম করেছিল। দেখে স্বাহা খুব হেসেছিল। ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাত পনেরো দূরে গিয়েই নন্দ প্রতিশোধ নিয়েছিল। পাথর ছুঁড়ে গোড়ালির হাড় থেতলে দিয়েছে। কাটা কলা গাছের মত মণ্টি ধুপ করে বসে পড়েছিল। দেখে স্বাহা থ। অনেক চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেনে তুলতে পারেনি তাকে।

রাত্রিতে স্বাহাই এসে সাবধান করে দিয়ে গেছে চারু বোষ্টুমীকে, নন্দদা যেন শিগ্‌গীর আর এই গাঁয়ের পথ না মাড়ায়, এলে বিপদ হবে।

এই বিপদের কথাটাই ভাবছিল চারু বোষ্টুমী। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে, সব কিছুর মূলে এই মেয়েটা। চারু বোষ্টুমী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে একেবারে। বলেছে, ঢলানী মেয়ে, এই বয়সে এত ঢলানী, এমন জানলে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতুম তোকে। পোড়ারমুখী দূর হ' এখান থেকে, তুই এ উঠোন মাড়ালে তোরও বিপদ হবে।

ভালো কথা বলে গেলাম, শোনো তো শোনো—নয়তো বুক চাপড়ে কাঁদতে হবে শেষে।

চারু বোষ্টুমীর পাথর-চোখের সমুখ দিয়ে ঢলানী মেয়েটা হেলে দুলে প্রস্থান করেছিল।

কিন্তু এই ঢলানী মেয়েই যে সেদিন এক অবধারিত বিপদ থেকে তার ছেলেকে রক্ষা করেছিল সে-কথা মুখে না বললেও মনে মনে স্বীকার না করে উপায় নেই। মণ্টির পায়ের গোড়ালি থেঁতলানোর দু'দিনের মধ্যেই। চারু বোষ্টুমী স্বাহার পরামর্শই শুনেছিল। নিজে গিয়ে ছেলেকে সাবধান করে এসেছিল, শিগ্‌গীর যেন এমুখো না হয়—প্রাণে বাঁচবে না তাহলে। প্রাণের মায়া ছেড়ে খুব শিগ্‌গীর যে ছেলে এ-মুখো হবে তাও ভাবেনি। কারণ মণ্টি আঘাত যত না পেয়েছে ছেলের কাছে তার অন্তত চারগুণ বাড়িয়ে বলেছে চারু বোষ্টুমী। ভেবেছিল ছেলে ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু মায়ের কথা শুনে নন্দ আবার অন্য রকম হিসেব করেছে। অতটাই লেগে থাকলে মণ্টি আপাতত বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাহলে আর এখন থেকে এত সাবধান হয়ে লাভ কী? পরের কথা পরে ভাবা যাবে। তাছাড়া

এই ফাঁকে স্বাহার সঙ্গেও একটা বোঝা-পড়া করে নিতে পারবে। সেই তাকে মার খাইয়েছে, আর তার জন্যই যত গণ্ডগোল। হয় আপস হবে, ক্ষমা চাইবে, নয়তো ওকেও আধমরা করে আসবে। তারপর নিজে মরতে হয় মরবে। তার ওপর মায়ের মুখে আর এক খবর শুনেছে। এ সুযোগ ভগবান যেন তার মুখ চেয়েই করে দিয়েছে। বিনয়কেষ্ট বাসনাকে নিয়ে দু'তিন দিনের জন্য শহরে গেছে-তার কোন্ বুড়ী আত্মীয়ার বাড়ি। তারা বউ দেখতে চেয়েছে। ঘরে কেউ থাকলে এক স্বাহার বাবা থাকবে। তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না নন্দ।...মণ্টির কাছে নালিশ করাটা বার করবে সে।

মতলবটা মায়ের কাছে ভাঙল না। ভাবখানা এমন দেখাল যে জীবনে আর ও-মুখো হবে না। পরদিন দুপুরের প্রতীক্ষায় সময় গুনতে লাগল সে।

কিন্তু বিধি বাম। মণ্টি কেতু আর তাদের ইয়ার বকশীরা শীতকালের দুপুরের দিকে প্রায়ই পরাণ চাটুজ্জের ভিটে থেকে সিকি মাইল দূরের বটতলায় বসে আড্ডা দেয়, বিড়ি টানে, পাশা আর গোলকধাম খেলে। কিন্তু সে-দিন যে তাদের ওখানে দেখা যাবে নন্দ কল্পনাও করেনি। মণ্টির পায়ে চুণ-হলুদের পট্টি বাঁধা বটে, কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা-চলা করতে পারে। নইলে ওখানে এলো কি করে। বিশেষ করে তাকে খুব ভালো হাতে শিক্ষা দেবার জটলাই যে চলছিল বটতলায় সেদিন, তাই বা নন্দ জানবে কেমন করে?

দেখার সঙ্গে সঙ্গে নন্দর পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে রইল কয়েক মুহূর্ত।

ওরাও দেখেছে।

হঠাৎই সম্বিত ফিরতে দিশেহারার মত আখড়ার দিকে ছুটল নন্দ। অনেকটা ব্যবধানেই ছিল, তার ওপর প্রাণের দায়ে ছোটা।

শিকার যে এভাবে খপ্পরে এসে পড়বে মণ্টি ভাবেনি। আখড়ায় বাক আর মায়ের আঁচলের তলাতেই লুকোক, আজ জীবনের শোধ তুলবে সে। সঙ্গীরা আগেই পিছু ধাওয়া করেছে—কেতুর কাঁধে ভর করে সেও যতটা সম্ভব দ্রুত আখড়ার পথ ধাওয়া করল।

সঙ্গীরা বাইরে অপেক্ষা করছিল। মাতব্বর-বিহীন হয়ে তাদের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে হামলা করার সাহস নেই। চারু বোষ্টমীর ঘরের দরজাটা ভেজানো। বিশ্বাস, নন্দই ভিতরে সিঁধিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।

ভিতরে উঠোনে মণ্টির তপ্ত গলার আওয়াজ পেয়ে চারু বোষ্টমী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘুমুচ্ছিল, ঘুম ছুটে গেছে। মণ্টি বাইরে থেকে শাসাচ্ছে, বেরিয়ে আয় বলছি, নইলে ইঁদুরের মত ঘর থেকে টেনে বার করব—আজ তোর মা ছেড়ে ইষ্ট দেবতাও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

চারু বোষ্টুমী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। মন্টিকে দেখল, কেদুকে দেখল—বেড়ার ওধারে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দেখল। সর্বাঙ্গ হিম তার।

অস্ফুট স্বরে বলল, সে এখানে কোথায় ?

সে এখানে কোথায় ! —খোকা পেয়েছ আমাদের ! ক্রোধে মুখ বিকৃত করে ভেংচে উঠল মন্টি। রাগ তার চারু বোষ্টুমীর ওপরেও কম নয়। তার ইঙ্গিতে সঙ্গীরাও দাওয়ার সামনে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু ঘরের ভিতরে আর বাইরের আনাচে কানাচে আঁতি-পাতি করে খুঁজেও নন্দর টিকির দেখা পাওয়া গেল না। আখড়ায় ঢুকে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

মন্টিরই হঠাৎ চোখ পড়ল উঠোনের ওধারে স্বাহাদের ঘরের দরজা বন্ধ। চকিতে সন্দেহ হল, বাসনা নেই, স্বাহাকে ভয় দেখিয়ে ওখানেই লুকোয়নি তো? খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল, পিছনে কেদু।

ঘরের জানালা ফাঁক করে স্বাহা দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। মন্টি জিজ্ঞাসা করল, নন্দ ঢুকেছে ভিতরে ?

স্বাহা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, না—।

কিন্তু ওই মাথা নাড়া দেখেই সন্দেহটা বদ্ধমূল হল মন্টির। এই গণ্ডগোল দেখেও দরজা বন্ধ করে জানালা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয় স্বাহা। দরজা খুলে একেবারে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে মজা দেখার কথা।···তার নালিশেই শাস্তি দিয়েছিল নন্দকে, আর সেই কিনা···

গম্ভীর মুখে বলল, দরজা খোল্, দেখব।

স্বাহা বলল, দেখতে হবে না, তোমরা বেরোও এখান থেকে—

মন্টির পিছনে কেদু দাঁড়িয়ে। নন্দর ওপর রাগ ভুলে সে স্বাহাকে দেখছিল। তার পিছনে চারু বোষ্টুমী। তারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ছেলে ওই ঘরেই আছে। ভয়ে ত্রাসে বুকের মধ্যে হাতুড়ি বাজছে তার। বাসনাও নেই, কে রক্ষা করবে নন্দকে! অস্ফুট আর্তনাদ করে মন্টির হাতে পায়ে ধরতে গেল সে।

মন্টি এক ঝটকায় দু'হাত দূরে সরিয়ে দিল তাকে। সঙ্গীদের হুকুম করল দরজায় ধাক্কা মারতে, দরজা কেমন না খোলে দেখবে সে। সঙ্গীদের ইতস্তত ভাব দেখে সে নিজেই দমাদম দরজায় ঘা দিতে লাগল।

দরজা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে খোঁড়া পায়েই হাত পাঁচেক সরে এলো মন্টি।

দরজা খুলেছে স্বাহা। কিন্তু খালি হাতে নয়। তার হাতে বাঁশ-কাটা কাটারি

—উনুনে দিয়ে গনগনে লাল করে পুড়িয়ে এনেছে। বলল, আয় কে বার করে নিবি ওকে আয় দেখি—যে এগোবে পোড়া পোড়া করে কাটব তাকে।

কেউ এগোয়নি। বরং আস্তে আস্তে পিছু হটেছে সকলেই। বার-তের বছরের মেয়ের এ-মূর্তি কেউ দেখেনি কোনদিন। আগুনে পোড়া দগদগে কাটারিটার থেকেও লাল লাগছিল ওই মুখ। এগোলে যে জ্বলন্ত কাটারি ঘাড়ে মাথায় পড়বে তাতে এতটুকু সন্দেহ ছিল না কারো।

কাটারির ভয়ে নয়, ওই মেয়েটার ভয়ে কেউ এক পা এগোলো না। সঙ্গীরা প্রস্থান করল, নির্বাক কেদুর সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মন্টিও।

চারু বোষ্টুমীরও বাক স্ফুরণ হয়নি আর। হতবুদ্ধির মত সেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

ভিতরে ঢুকে স্বাহা কাটারি ফেলে নন্দকে বলল, এবারে মায়ের ঘরে গিয়ে সেঁধোও গে যাও—বীরত্ব বোঝা গেছে।

স্বাহার দুচোখ জ্বলছে তখনো। এমন একটা অভাবিত কাণ্ড দেখে নন্দ নিজেও হতভম্ব। আর যাই হোক, ভীরু কাপুরুষ নয় সে—হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে মাথার ঠিক ছিল না। আক্রমণকারী একজন দুজন হলে এতটা ঘাবড়ে যেত না নিশ্চয়। মার খেত আর যতটা সম্ভব তার শোধও নিত। স্বাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু তা'বলে এ-রকম সরোষ বিদ্রূপ মুখ বুজে সহ্য করা শক্ত। বলল, একসঙ্গে এতজন এলে কি করব?

স্বাহা বলল, আমি কি করলাম?

নন্দ একটু থমকে গিয়ে যুক্তি দেখালো, তুই মেয়েছেলে বলে সরে গেল, নইলে সরত?

জবাবের বদলে স্বাহা খিল খিল করে হেসে উঠল। শেষে হুমকি দিল, তাহলে তুমিও সরো এখন, কাটারি গরম আছে এখনো—আর গায়ে হাত দেবে কোনোদিন?

কোনোদিন ছেড়ে গায়ে হাতটা তক্ষুনি দেবার বাসনা কি করে যে সংযত করেছে নন্দ সেই জানে।

এর দিন কতক পরেই চারু বোষ্টুমী খবর পেল, কেদু অর্থাৎ কেদার ছোট দারোগা হয়েছে। তার বাবা মহিম তরফদার আগেই বড় দারোগা হয়েছিল। এখন আরো বড় কিছু হয়ে শহরে বদলী হয়ে গেছে। যাবার আগে চেষ্টা চরিত্র করে ছেলেকে ছোট দারোগার পদে বহাল করে গেছে।

চারু বোষ্টুমীর ভরাডুবীর বিভীষিকার চিত্রটি সুসম্পূর্ণ।

আবার সে পরামর্শের জন্য ছুটল বৃদ্ধ ত্রিলোচন ঠাকুরের কাছে। পরামর্শে সাব্যস্ত

হল, পরাণ চাটুজ্জের ভিটে ছেড়ে চলে আসবে সে—এখানেই একটা ঘর নিয়ে ছেলে আগলে থাকবে। ত্রিলোচন ঠাকুর যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। ছেলেটায় কিছু কিছু যাতে রোজগার হয় দেখবেন। যা হোক করে চলে যাবে।

পাকাপাকি ব্যবস্থা করে চারু বোষ্টুমী সেখান থেকে ধুলো পায়ে সরাসরি মণ্টির ঘরে এসে উঠল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ তখন। মণ্টি পায়ের ব্যথায় খুব সচল নয় বলেই তার দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা। দর্শন মিলল। একজনের নয়, দু'জনেরই। আনকোরা দারোগা কেদারেরও।

নারীর বল চোখের জল। জলের এই শেষ বলটুকুর ওপর চারু বোষ্টুমীর আস্থা ছিল। তাঁকে দেখে বাঁদর ছোঁড়া দুটোর চোখ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওই জল দেখে আর যাবার মুখে নাড়ীর টানের কথা শুনে দুজনেই অবাক একটু।

চারু বোষ্টুমী চোখের জল মুছে প্রথমেই গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কেদুকে আশীর্বাদ করে নিল। দারোগা হয়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে, আপদে বিপদে গাঁয়ের বল-ভরসা বলতে গেলে এখন তো সে-ই। মণ্টির ব্যথা পায়ের জন্য ত্রিলোচন ঠাকুরের কাছ থেকে প্রলেপ চেয়ে এনেছিল। চোখের জল মুছে ফেলে চারু বোষ্টুমী নিজের হাতে সেই প্রলেপ লাগিয়ে দিল। ছেলের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল। ত্রিলোচন ঠাকুরকে দিয়ে খড়ম-পেটা করিয়ে ছেলেকে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছে—মণ্টির মনস্তুষ্টির জন্য সেই কল্পিত মর্মান্তিক প্রহারের চিত্রটি বিস্তার করতে ভুলল না। সব শেষে জানালো, সে কালই চাটুজ্জের ভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গাঁয়ের এক কোণে মায়ে-পোয়ে পড়ে থাকবে, ছেলের জন্যে আর কোনো অসুবিধের কারণ ঘটবে না বলেই বিশ্বাস তার।

প্রলেপে যতটা হয়নি, চারু বোষ্টুমীর চোখের জলে তার থেকে বেশি কাজ হয়েছে। তারও বাড়া, ভিটে ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর। আসরের ঘরে আজকাল অসুস্থ পরাণ চাটুজ্জে আফিম খেয়ে পড়ে থাকে মড়ার মত। বিনয়কেষ্টর বিয়ের পর থেকে এই ব্যবস্থা। পরাণ চাটুজ্জের মৃত্যুকাতর উপস্থিতি কারোই বাঞ্ছিত নয়। না জমে আসর, না হয় ফুর্তি। মণ্টি তো শুধু তার জন্যেই নিজের খরচায় আর একখানা ঘর তুলে দেবার কথা ভাবছিল। চারু বোষ্টুমীকে ভিটেছাড়া করানো যেতে পারে সে-কথা একবারও মনে হয়নি।

প্রস্তাবটা শোনামাত্র একটা মস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। পায়ের ব্যথা ভুলে এ-যাত্রায় অকাতরে নন্দকে ক্ষমা করে ফেলল সে। এবারের এই নিদারুণ অপরাধটার প্রতিশোধ অন্তত সে নেবে না সেই প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলল। আসর-টাসরের ব্যবস্থা হলে বোষ্টুমী মাসিকেও যে সে ধরে নিয়ে আসবে—সেই হৃদ্যতার কথাও শোনালো।

আত্মরক্ষার তাগিদে শত্রুশক্তি বিভাজনের নীতি চিরকালের কূটনীতি। চারু বোষ্টুমীও নিজের রমণী-রীতির অভিজ্ঞতায় সেই নীতির মাহাত্ম্য জানে। অতঃপর শুভাকাঙ্ক্ষিনীর মত আর একটি মাত্র প্রস্তাবে মণ্টি আর নয়া ছোট দারোগার যুগ্মশক্তিতে অদৃশ্য একটা ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গেল সে।

অদূর ভবিষ্যতে মণ্টির সঙ্গে যে স্বাহার বিয়ে হবে সেটা যেন স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত একটা। এই শুভ পরিণয়ের কথা অনেকদিনই নাকি চারু বোষ্টুমী ভেবে রেখেছে। মেয়েটা নেহাতই ছোট ছিল বলে মনের কথা মনেই রেখেছে এতকাল। অবশ্য মণ্টির সঙ্গে বয়সের ফারাকটা বেশি হয়ে যাবে একটু। কিন্তু তাতে কি, বিনয়কেষ্টর সঙ্গে বাসনার বিয়ে হয়নি? তার তুলনায় তো মণ্টি নাবালক—পুরুষ মানুষের আবার বয়েস কি, যেমন গতর তেমন বয়েস। অতএব, সময় এলে চারু বোষ্টুমী নিজে এসে সেই শুভকার্যটি সম্পন্ন করে দিয়ে যাবে।

চারু বোষ্টুমী নয়া-দারোগা কেতুর মুখের ওপর একবার স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে গাত্রোত্থান করেছে।

নয়া ছোট দারোগার মুখখানা একটু শুকনোই বটে। স্বাহার সম্পর্কে সে মণ্টিদাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি কখনো। কিন্তু বিয়ে জিনিসটা যে একেবারে গঙ্গা-তুলসীর মত নির্জলা ব্যাপার! বয়সের জ্বালায় আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে এলেও তার বাপ বরদাস্ত করবে। কিন্তু বিয়ে করতে চাইলে সেই বাপ ছোট দারোগা বলে ছেলেকে খাতির করবে না—ছাল-চামড়া তুলে নেবে। না, মণ্টিদার মত বিয়ে করার স্বাধীনতা তার নেই।

অনুজ-প্রতিম বন্ধুর ভাবান্তরটা মণ্টিরও চোখে পড়ল না। কারণ সে-ও অন্যমনস্ক ছিল একটু। ওই আগুন-রঙা মেয়েটাকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছে বলেই এতদিন পর্যন্ত ভালো করে লক্ষ্য করেনি। তেমন চোখ চেয়ে দেখেওনি যেন। নন্দর বিচ্ছিরিভাবে গায়ে হাত দেবার অভিযোগ শুনে প্রথম লক্ষ্য করেছিল। দেখেছিল। তারপর সে-দিনের সেই দেখা। সেই দেখার পর থেকেই অন্যমনস্ক একটু। বোষ্টুমী মাসীর প্রস্তাব শুনে খুশি হবে কি হবে না তাও ঠিক পেয়ে উঠছে না। কোথায় যেন দ্বন্দ্ব।

চারু বোষ্টুমীর প্রাগ্-বিদায়ের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হয়নি তখন।

সেই রাতেই বিনয়কেষ্ট আর বাসনাকে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিল সে। এনে আর একপ্রস্থ চোখের জল ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর বিদায়ের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছে। বাসনার দুই হাত ধরে অনুনয় করেছে, নন্দকে নিজের ভাই বলে ভাবিস, একসঙ্গেই তো বড় হয়েছিল দুটিতে। ওই দস্যিদের কোপে পড়ে কোন্‌দিন প্রাণান্ত হবে ছেলেটার কে জানে। মণ্টি ছোঁড়াটা তোকেই যা একটু ভয় করে, সমীহ করে—তুই যা একটু সমঝে দিলে আমার ভয় কমে। প্রাণে বাঁচি।

বাসনা বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, তুমি গিয়েই তো ওর আরো আস্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছ, তোমাকে কে যেতে বলেছে? যেমন ছিলে তেমনি থাকো, আমি দেখছি কে কি করে।

না না না। আর না, ঢের হয়েছে। ছেলে নিয়ে চোখের আড়াল হতে পারলেই মঙ্গল এখন। আর, যেখানেই যাই তোদের ভরসাতেই যাব। শেষের আবেদন বিনয়কেষ্টর উদ্দেশে, তুই বাবা মাসিকে ভুলিস না, একটু খোঁজখবর দেখাশুনা করিস, নইলে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে হয়ত না খেয়ে মরতে হবে।

বিনয়কেষ্ট কথা দিয়েছিল দেখবে। সেই প্রতিশ্রুতি সে পালন করেও আসছে। মাসান্তে মুদী দোকানের এক লভ্যাংশ সেখানে যায়।

যাবার আগে চারু বোষ্টুমী আর একজনের সঙ্গেও দেখা করে গিয়েছিল। দাসী শ্রীচরণের সাক্ষাৎপ্রার্থী বলে তাঁকেও নিজের ঘরে ডেকে এনেছিল।

সূর্য হালদার। শরণাগতার আবেদনে তিনিও এসেছিলেন।

বয়েস এখন ষাটের ওপর। কিন্তু দেহের বাঁধুনীটি এখনো ঢিলে হয়নি। মোটা কাঠামোর ওপরকার চামড়া ঈষৎ খড়খড়ে হয়েছে, কুঁচকেছে একটু। তার বেশি কিছু নয়। লোকে বলে সূর্য হালদার গত জন্মে যৌবনের তপস্যা করেছিলেন। মজবুত দেহ-সৌষ্ঠব দেখলে খুব মিথ্যে মনে হয় না।

গত জন্মে যে তপস্যাই করুন, এই জন্মে যে রসের পূজারী তিনি, সেটা মুখে ব্যক্ত না করলেও সে-সম্বন্ধে সংশয় নেই কারো।

ভাঙা আসরেও তিনি নিয়মিত আগন্তুক। এখনো কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে তাঁরই পরোক্ষ উৎসাহ সব থেকে বেশি। পরোক্ষ অর্থাৎ মুখে বয়েসের কথা বলেন। বলেন, আমায় নিয়ে আবার টানাটানি কেন, তোমরা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করো, আমি পারি তো যাব'খন। তিনি পারেনও. আসেনও। আর, প্রয়োজনে মোটামুটি অর্থ সাহায্যও করেন। বাসনা ইদানীং আরো বেশি গম্ভীর হয়েছে। নইলে কিছুদিন আগেও বলেছে, দাদু, বয়েসটা তো তোমার অস্ত্র—ওপর ওপর বয়েসের কচুরী-পানা ছড়িয়ে রেখেছ, ভিতরে টলটলে জল।

সূর্য হালদার হা-হা করে হেসেছেন। নাতনীদের নিয়ে, বিশেষ করে বাসনাকে নিয়ে প্রকাশ্যেই রঙ্গরস করতেন তিনি। বাসনার টিপ্পনীর জবাব দিতেও ছাড়েন নি, তুই জানলি কি করে রে, অ্যাঁ? এই গোপন কথাটা তুই জানলি কেমন করে? ফাঁক পেলে দুই নাতনীকে দু'দিক থেকে প্রায় কোলের কাছেই টেনে নেন তিনি।

লোক থাকলে বাসনা চিমটি কেটে সরে যেত, না থাকলে ঝাঁঝিয়ে উঠত, হাত বেশি এগোলে আঁচড়ে রক্ত বার করে দেবো। সূর্য হালদার হাসতেন।

ওই মেয়েটা বেজায় গম্ভীর হয়ে গেছে এখন। বিশেষ করে বিয়ের পর থেকে। সূর্য হালদার ভেবে পান না, কেন। কিন্তু ছোট মেয়েটা ডবল ফাজিল হয়ে উঠেছে। সূর্য হালদারের সঙ্গেই বাজী ধরে আসরে সকলের সামনে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু পর্যন্ত খেয়ে বসেছিল একদিন। সূর্য হালদার নিজেই লজ্জা পেয়েছিলেন একটু। আর বাসনা উঠে এসে সকলের সামনেই কিলিয়ে বোনের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবার উপক্রম করেছিল।

মারধরের বা শাসনের পরোয়া না করলেও এখন আর অতটা করে না স্বাহা। কিন্তু দেখা হলে দূর থেকেই ঠাট্টা করে এখনো, দাদু, দিদিমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে, একবারটি নিয়ে যাবে?

আগে এই দুই নাতনীকে প্রায়ই দিদিমার কাছে নিয়ে যেতে চাইতেন সূর্য হালদার। মাঝে মধ্যে নিয়ে যেতেনও। কিন্তু দিদিমার ব্যবহার নাতনীদের খুব সদয় মনে হয়নি কখনো।

চারু বোষ্টুমীর ভিটে ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প শুনে সূর্য হালদার একবারও থেকে যাবার কথা বললেন না তাকে। বরং এখানে বসে সকলের জন্যে দুশ্চিন্তা ভোগ করা থেকে দূরে গিয়ে ছেলে আগলে বসে থাকা যে ভালো—সেই মন্তব্যই করলেন।

তিনি বাধা দেবেন না চারু বোষ্টুমী জানত। কিছু প্রাপ্তির আশায় তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল। যা আশা করেছিল তার থেকে বেশিই পেল। উপরন্তু সূর্য হালদার মাঝে মাঝে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

তারপর পাঁচ বছর কেটেছে।

কিন্তু চারু বোষ্টুমীর হিসেব মত দিন গেল না।

ভিটে ছাড়াই সার হল। পুরুষের প্রবৃত্তি জানত। জানত বলেই এত তাড়না এত উৎকণ্ঠা এত চেষ্টা। কিন্তু সবই নিরর্থক। ভিতরে ভিতরে পুরুষের বিরুদ্ধে বরাবরই একটা মানসিক বিরোধ ছিল তার। তাই ছেলেকে শুধু ছেলে বলেই আগলে রাখতে চেয়েছিল, তার মধ্যে পুরুষকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল।

তা হবার নয়।

ত্রিলোচন ঠাকুরের কঠোর শাসনের আওতা থেকে মায়ের কাছে আসতে পেরে নন্দ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। মায়ের কল্যাণে শিষ্যত্ব থাকল, শেকলটা ছিঁড়ল। বাসঘরের পাশে একটা ছাপরা ঘর তুলে কিছু পুরানো পাঁজি আর পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে পাকা-পোক্ত দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছে সে।

কিন্তু প্রবৃত্তি-দেবতাটিকে ওরই মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। চেষ্টাও করেনি। চারু বোষ্টুমীর সংকট দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। ছেলের মতিগতির সমস্যা নিয়ে

ত্রিলোচন ঠাকুরের দ্বারস্থ হওয়াও সম্ভব নয় আর। জানতে পারলে ছেলে এবারে জ্যান্ত পু্তবে। অন্যদিকে যে অভিশপ্ত ভিটে সে ছেড়ে এলো, অজগরের নিঃশ্বাসের মত আর অমোঘ নিয়তির মত তাই যেন ছেলেটাকে টানছে। আর টানছেই।

পরাণ চাটুজ্জের ভিটেতে বরং ছিল ভালো, চোখের অগোচর কিছু থাকত না। দেখা বিপদের থেকে অদেখা বিপদের ভয় বেশি। অদেখা বিপদের সঙ্গে যুঝবে কেমন করে চারু বোষ্টুমী ?

ত্রিলোচন ঠাকুরপো বলেছিলেন, মহা-বিষাদ রোগ হয়েছে চারু বোষ্টুমীর। তিনি ওষুধ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে ক'টি বছর সে বেঁচেছিল, এ রোগ সারেনি। সিঁদুরে মেঘে আগুন দেখে আঁতকে ওঠার মত পরাণ চাটুজ্জের ভিটের এক মেয়ের রূপে দিবা-রাত্র শুধু ধ্বংসের আগুন দেখত চারু বোষ্টুমী। সেই ত্রাস সেই ভয় আর ঘোচেনি। তারপর হঠাৎই একদিন চোখ বুজেছে। চোখ বোজেনি ঠিক, চোখ চেয়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। সেই চোখেও দিশেহারা ত্রাস পুঞ্জীভূত দেখা গিয়েছিল।

মৌসুমী কালে যার এত আদর এত কদর—অন্তিমে তার দিকে চেয়ে জগৎ উদাসীন।

চারু বোষ্টুমী গেল নিতান্ত নিঃস্ব একজনের মতই।

অনেকে বলাবলি করল, বোষ্টুমীটা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল।

এইটুকুই।

আপনজন-তুল্যের মধ্যে বিনয়কেষ্ট এসেছিল। আড়ালে আড়ালে সে চোখও মুছেছিল বারকতক।

আর তার সঙ্গে এসেছিল স্বাহা।

সে কাঁদেওনি, চোখও মোছেনি। মৃতা চারু বোষ্টুমীকে কেমন দেখায় তাই দেখতেই এসেছিল যেন।

স্বাহাকে দেখে নন্দ অবাক হয়েছিল। খুশি হয়েছিল। পাড়া-পড়শীদের কাছে মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে নিজের পূর্বাবগতির ব্যাখ্যা করেছিল সে। এই দিনেই এই সময়ে মা যে যাবে সে জানত। একটা কাগজে লিখেও রেখেছিল নাকি দিন তারিখ সময়। সেই কাগজ পড়শীদের দেখিয়েছে। পড়শীরা অভিভূত হয়ে শুনেছে।

স্বাহাকে দেখে তার উপলব্ধির ব্যাখ্যা বন্ধ হয়েছিল অবশ্য। এমন একটা মুহূর্ত নন্দ কল্পনা করেনি। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ সে। মৃত্যু দেখা শেষ করে স্বাহা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সামনে এসে নন্দ সানুনয়ে বলেছিল, এখনই যাচ্ছিস কেন, আর একটু থাক্ না।

স্বাহা দাঁড়িয়েছিল। দু-চার মুহূর্ত থেকেও ছিল আরো। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন, তোমার দুঃখু হয়েছে খুব ?

নন্দ বলেছে, দুঃখু করে আর কি হবে, আমি তো জানতুম মা আজ যাবে। লিখেও রেখেছিলাম।...দেখবি ?

ওদের দেখাও গে।

গুণমুগ্ধ পড়শীদের দেখিয়ে দিয়ে স্বাহা প্রস্থান করেছিল।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে সে কি করেছিল এক বাসনা আর বিনয়কেষ্ট জানে। বাসনা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বোনকে লক্ষ্য করেছিল, বিনয়কেষ্ট সামনাসামনি। ইঁদারায় চান করে তারপর ঘরে ঢুকেছে স্বাহা। তারপর সমস্ত দিন আর ঘর থেকে বেরোয়নি, কথা বলেনি, খায়নি। বাসনা বার বার এসে বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছে। আর বিনয়কেষ্ট হাত ধরে সাধতে গিয়ে তার চোখে চোখ পড়তে থমকে গেছে। রকম-সকম দেখে দু'জনেই তারা আবাক হয়েছিল বইকি। বেঁচে থেকে চারু বোষ্টুমী এত গঞ্জনা আর কাউকেই দেয়নি। সে মরে গেছে শুনে স্বাহা যদি ঠোঁট উল্টে বলত বেশ হয়েছে—তাতে হবাক হবার কিছু ছিল না। স্বাহা সেই রকমই মেয়ে।

কিন্তু তার দিকে চেয়ে এও শুধুই শোক মনে হয়নি বিনয়কেষ্টর। শোক হতেও পারে। কিন্তু তার থেকেও বেশি, ওর মুখে একটা কঠিন বিদ্বেষের ছাপ দেখেছে সে। সে-জন্যেই অমন স্থির দেখাচ্ছে ওকে। বিদ্বেষ কার প্রতি সেও বিনয়কেষ্ট অনুমান করতে পারে।

চারু বোষ্টুমীর মৃত্যুতে স্বাহার এই শোকের জাত আলাদা।

বোষ্টুমী মাসির মুখে কোনদিনই লাগাম ছিল না খুব। ছোট-বড় জ্ঞান ছিল না। যত বয়স বেড়েছে স্বাহার, ততো ও চক্ষুশূল হয়েছে বটে। কেন হয়েছে তাও জানে। কিন্তু সব দিন এক রকম যায়নি। ছেলেবেলায় এই বোষ্টুমী মাসির কাছেই অনেক দিন অনেক গল্প শুনেছে সে। মায়ের গল্প, বাবার গল্প, আর ওর নিজের গল্প। বাবা বা মায়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হতে পারে এমন করে কোনদিনই কিছু বলেনি চারু বোষ্টুমী। যে-ভাবে বলেছে, উল্টে বরং অবুঝ মনে তাঁদের প্রতি একটা বিতৃষ্ণাব ছাপই পড়েছে। বাবা মা বিশেষ করে মা কতভাবে স্বাহাকে অযত্ন অবহেলা করত সে-কথা বোষ্টুমী মাসি তাদের অনেকবার [illegible] ছ। বলেছে, কুকুর-বেড়ালও তাদের ছানাকে যতটুকু যত্ন-আত্তি করে তার সিকির সিকিও যদি করত! আর, এ-সবের থেকেও অনেক বেশি শুনিয়েছে, বোষ্টুমী মাসি না থাকলে স্বাহাকে যে আঁতুড়ে মরতে হত সেই কথা।

শুনে শুনে সেই ছোট-মনে যে ছাপ পড়েছিল সেটা চারু বোষ্টুমীর জানার কথা নয়। যে মা জন্মদাত্রী তার প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে কোনো এক মায়ের প্রতি লোভ ছিল স্বাহার। সেই মা যে কেউ হতে পারত। স্নেহ ভালবাসা নিয়ে যে

এগিয়ে আসত সেই হতে পারত। চারু বোষ্টুমীর হওয়া আরো সহজ ছিল। যাহার অগোচর-মনে হয়েও ছিল খানিকটা। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের প্রতি তার টান আর পক্ষপাতিত্ব দেখেই সেই ছোট মনে অনেক বিদ্রোহের সূত্রপাত। নন্দ যতটুকু পেত ততটুকু যাহা তারও প্রাপ্য ভাবত। পেত না বলে বিগড়াত। পরে চারু বোষ্টুমীর গঞ্জনায় সেই বিদ্রোহই আরো স্পষ্ট আকার নিয়েছিল। আরো প্রকাশ্য হয়ে উঠেছিল। গোড়ায় গোড়ায় অন্তত নন্দকে দখল করে যাহা অনেক সময়ে চারু বোষ্টুমীকেই জব্দ করতে চাইতো। ওর প্রতি বিমুখ এক-মা-কে।

তাই চারু বোষ্টুমীর মৃত্যুর ক্ষত-চিহ্ন শুধু একজনের বুকেই পড়েছে। শুধু যাহার মনে হয়েছে, যেমন মা হোক—মা চলে গেল।

কিন্তু যার জন্যে এত করে গেল, সেই নিজের ছেলের এমন নির্মম উদাসীনতা দেখে স্তব্ধ সে। এই একজনের জন্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস গেছে তার। নন্দ যদি মা হারিয়ে এই একটা দিনের জন্যও কাঁদত—যাহাও কাঁদত হয়ত।

চারু বোষ্টুমী মুছে গেল।

তার মাস কতক বাদে আর একজনও মুছে গেল।

পরাণ চাটুজ্জে।

চারু বোষ্টুমীর মত অমন নিঃশব্দে নয়, রীতিমত সাড়া জাগিয়ে, আর রীতিমত সকলকে চমকে দিয়ে। পরাণ চাটুজ্জে মুছে গেল বটে, কিন্তু কোথায় যে গেলো সেটা কেউ জানল না। জগতের সেরা বিস্ময় না-জানার বিস্ময়।

তখন বরষা কাল। অমন বরষা শিগ্‌গীর দেখেনি চুনিগাঁয়ের লোক। মরা সরস্বতীও নতুন যৌবনের আশ্বাসে ভরে ভরে উঠেছিল, ফুলে ফেঁপে উঠছিল।

সেই সময় গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে একটা ভয়ের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরাণ চাটুজ্জের ভিটের পিছনের ওই বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ বাগানে নাকি জীবন্ত প্রেতিনী দেখেছে। তার হাত পা নাক মুখ চোখ আলাদা করে দেখেনি কেউ, একটা মূর্তির মত দেখেছে শুধু। প্রায় উলঙ্গ, বীভৎস, চুলের জটে মুখ ঢাকা নারী মূর্তি। আমবনের ফাঁকে ফাঁকে, নিমবনের ফাঁকে ফাঁকে, ভিটের দিকের ফল বাগানে, পলাশ শিরীষের ধারে ধারে দেখা গেছে তাকে। দেখা যাক না যাক, তার রক্তজল করা কণ্ঠস্বর, তার উন্মাদ বিলাপ, তার হাড়-কাঁপানো হাসি শুনেছে অনেকে। গাঁয়ের লোকে দল বেঁধে লাঠি-সোঁটা নিয়ে জড়সড় হয়ে বনেও ঢুকেছে দিন দুই, কিন্তু কারো অস্তিত্বের চিহ্নও চোখে পড়েনি। প্রেতিনীর অস্তিত্ব চোখে পড়বে কেমন করে? অথচ রাত-বিরেতে বনের পাশ ঘেঁষে, সরস্বতীর ধার দিয়ে যেতে যেতে তার হাসি কান্না অনেকে শুনেছে।

পরাণ চাটুজ্জে কিছুই শোনেনি শুধু গুজবটা শুনেছিল।

শুনে এত কালের এত বছরের একটানা আফিমের নেশাটা যেন ছুটে গিয়েছিল। গাঁজা-খাওয়া সেই চোখের মত দু'চোখের শিরায় শিরায় আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়েছিল। রোগজীর্ণ মৃতপ্রায় দেহ আবার যেন প্রাণের ধারায় চনচনিয়ে উঠেছিল। ভাঙা মেরুদণ্ড ঋজু খাড়া সোজা হয়েছিল।

ভিটের পিছনেই বড় বটগাছের সামনে প্রায় অষ্টপ্রহর কান পেতে বসে থাকতে দেখা যেত তাকে। মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে বিনয়কেষ্ট, বাসনা বা স্বাহা গায়ের জোরে তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারত না। তারা হকচকিয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে বাসনা আর স্বাহা।

এক যুগেরও ওপরের একটা নির্জীব আধমরা মানুষ দুর্বোধ্য প্রাণের জোয়ারে রাতারাতি এমন উন্মত্ত-ক্ষ্যাপা হয়ে উঠতে পারে—দুই মেয়ের এক মেয়েও ভাবেনি। বিনয়কেষ্টও না। কেউ না। বাপের সঙ্গে সব থেকে রূঢ় ব্যবহার করত স্বাহা। নিজের হাতে তাকে নাওয়াতে খাওয়াতে হত, অনেক ধকলও সহ্য করতে হত। দরকার পড়লে নির্বিবাদে তাকে ধরে কড়া রকমের দুই একটা ঝাঁকুনি-টাকুনিও লাগিয়ে দিত সে। পরাণ চাটুজ্জে ছোট মেয়েকেই ভয় করত একটু। সব থেকে বেশি ভয় করত আফিম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায়। জামাই বরাদ্দর বেশি এক রতি বেশি আফিম এনে দিয়েছে জানতে পেলে বাপের সামনে, সকলের সামনেই ভগ্নিপতিকে বকুনির চোটে নাকাল করে ছাড়ত স্বাহা। কোনোদিন আবার রাগের মাথায় দিদিকে শাসাত, একদিন এই আফিমের ডেলা ঠিক আমি তোর ওই মানুষের মুখে ঠাসব দেখিস—

বাপের সামনে ফিরে বোনকেই বকত বাসনা। কারণ বাপ যেরকম করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত তার দিকে, বাসনার মায়াই হত। কি বাপ তাদের কি হয়েছে, সরাসরি না জানুক—এ বয়েস পর্যন্ত পাঁচ মুখে অনেক কথাই শুনেছে, অনেক আভাসই পেয়েছে। আড়ালে অবশ্য বাসনা বোনকেই সমর্থন করে। যে-কোনো ছলছুতোয় বিনয়কেষ্টকে গঞ্জনা দিতে পারলে দেবেই বাসনা। স্বাহারও তিনগুণ কটূক্তি করে ওঠে সে, শ্বশুরকে আফিম না গিলিয়ে নিজেই গেলো বেশ করে—তবু জানব অজ্ঞান অমানুষ নিয়ে ঘর করছি।

বিনয়কেষ্ট আমতা আমতা করে বলে, লোকটা মরে যাবে?

সত্যিই সেই অবস্থা। জগতে এর থেকে বেশি কাম্য-বস্তু পরাণ চাটুজ্জের আর কিছু ছিল না। দু ডেলা আফিমের লোভ দেখিয়ে এই জবুথবু লোককেও তিন ক্রোশ হাঁটানো যেত বোধ হয়। আফিমের মাত্রাই বাড়ছিল। আর জামাইয়ের চুপিচুপি সরবরাহ করাটাও। কিন্তু স্বাহার ভয়ে তাকে শ্বশুরের চাহিদা এড়িয়েও যেতে হত

অনেক সময়। পরাণ চাটুজ্জে অসহায় যাতনায় সেই সময় বড় মেয়ের কাছে আসত। আর কোনো সময় কোনো আব্দার সে করত না, কাতর চোখে এই বিস্মৃতির খোরাকটুকু চাইত শুধু।

কিন্তু পারতপক্ষে ছোট মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষত না সে।

সেই পরাণ চাটুজ্জে পিছনের জঙ্গলে প্রেতিনীর আবির্ভাব আর প্রেতিনীর হাসি-কান্নার গুজব শুনে রাতারাতি বদলে গেল। সহসা বাসনাই যেন দু'চোখের বিষ হয়ে উঠল তার। সে কাছে এলেই মরা-নির্জীব চোখ দুটো আগুনের গোলার মত ধক-ধকিয়ে উঠত। যেন চিরে চিরে, বিশ্লেষণ করে করে দেখত মেয়েকে।

কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠত বাসনার। শেষে এমন হল যে কাছে আসতে ভয় পেত। বাইরে সে কড়া মেজাজের কর্ত্রী। ভয় যে পেয়েছে সেটা বুঝতে দিত না। তবু স্বাহাকে জিজ্ঞাসা করত, কি হল রে? এবার তো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে দেখছি।

স্বাহাও ভেবে সারা, কি হল, কি হতে পারে। দিদিকে দেখে হঠাৎ অমন উগ্র খ্যাপার মত হয়ে ওঠে কেন বাবা, বুঝতে পারে না। আর স্বাহার প্রতিও তার ভয় ডর একেবারে উবে গেছে। তবু ওকে বরদাস্ত করে। ওর সঙ্গে কথা বলে। অনেক দুর্বোধ্য, অনেক অসংলগ্ন কথা।

এমনি অসংলগ্ন কথা থেকেই হঠাৎ সেদিন ভারি বিস্ময়কর কিছুরই আভাস পেল স্বাহা। কিন্তু দিদিকে জানাবার মত নয়, বরং সন্তর্পণে গোপন করার মত।

সেদিনও নিশুতি রাতে পিছনের জঙ্গলে প্রেতিনীর হাসি-কান্না শোনা গিয়েছিল নাকি। ভোর হতে দেখে বাবা পিছনের সেই বড় বট তলায় দাঁড়িয়ে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কাঁপছে থরথরিয়ে। কিন্তু কোনোরকম ভয় বা বিভীষিকার কাঁপুনি নয়, কিসের যে তাও বোঝেনি স্বাহা। বিনয়কেষ্টর সাহায্যে তাকে টেনে হিঁচড়ে তার ঘরে এনে বসানো হয়েছিল। বড় মেয়ের প্রতি বিরূপ হবার পর থেকে বিনয়কেষ্টকেও খুব সুনজরে দেখে না পরাণ চাটুজ্জে। স্বাহার জিম্মায় শ্বশুরকে ছেড়ে দিয়ে সে সরে গিয়েছিল।

উদ্‌ভ্রান্ত দুই চোখ স্বাহার মুখের ওপর খানিক ফেলে রেখে পরাণ চাটুজ্জে হঠাৎ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তোর মাকে দেখেছিস? কেমন দেখতে মনে আছে?

স্বাহা বিস্ময়ে নির্বাক। মাথা নেড়েছে শুধু, মনে নেই।

পরাণ চাটুজ্জে ঠিক তেমনি গলায় নিজেই জানিয়েছে কেমন দেখতে। বলেছে, ওই ওর মত—বাসনার মত—দেখ্‌গে যা। বুঝলি? ও তোর মায়ের আদল পেয়েছে…

দু'তিন দিন পরেই অদ্ভুত কাণ্ড একটা। ভরা দুপুর তখন, বিনয়কেষ্ট বাড়ি ছিল না। বাসনা নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। পাশের কুঠুরিতে স্বাহা। তার চোখেও তন্দ্রা নেমে এসেছিল। দিদির তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে দৌড়ে এলো। যে-দৃশ্য দেখল চক্ষু স্থির তার। দেওয়ালের একেবারে ধারে সরে গিয়ে দিদি ভয়ে কাঁপছে থরথর করে, কিন্তু বাবার সেদিকে হুঁস নেই, রক্ত-চক্ষু করে দিদিকে শুধু দেখছে চেয়ে চেয়ে—মুখ বুক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব যেন ফালা ফালা করে দেখছে। এমন দেখা আর স্বাহা জীবনে দেখেনি। সেও দিশা হারিয়ে বসেছিল যেন। পরে শুনেছে, দিদি ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হতে চোখ মেলে দেখে তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে অমনি ভয়াবহ চোখে বাবা চেয়ে আছে তার দিকে—দেখছে।

সেই রাতে উঠুন ডিঙিয়ে স্বাহা চুপি চুপি এক ফাঁকে এলো বাবার ঘরে। সমস্ত দিন কি ভেবেছে শুধু সে-ই জানে। এসে দেখে বাবা মেঝের ওপর স্থাণুর মত বসে আছে। মেয়েকে দেখল, কিন্তু খুব সজ্ঞানে নয়।

স্বাহা তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল খানিক। জ্ঞানাবধি এ-রকম কোনোদিন করেনি।

পরাণ চাটুজ্জে আবার ছোট মেয়েকে দেখল একটু, তারপর গভীর বিতৃষ্ণায় বিড়বিড় করে বলে উঠল, ও ওই মায়ের মত দেখতেই শুধু, মায়ের কাণাকড়িও পায়নি। ভয়-ডর কাকে বলে মা জানত না—যম দেখলেও টু-শব্দটা করত না মুখে। ওটা ভীতুর একশেষ, শুধু আদল পেয়েছে আর কিছু না···

পরাণ চাটুজ্জের চোখ থাকলে দেখত স্বাহাও খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখছে না তাকে। বাপের উন্মত্ততা আর মর্মান্তিক যাতনার সবটুকুই দুই চোখে উপলব্ধি করে নিতে চাইছে। তারপর হঠাৎ আরো একটু কাছে সরে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, বাবা আফিম নেবে?

প্রশ্নটা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না পরাণ চাটুজ্জে। ঠাওর করার মত স্নায়ুর অবস্থা নয়। নিরুত্তরে চেয়ে রইল শুধু।

স্বাহা আঁচলের আড়াল থেকে বড় একটা কৌটো বার করে তার সামনে ধরল। বাবা তবু তেমনি চেয়ে আছে দেখে কৌটোটা খুলে ফেলল। ভরতি আফিম। আবার বন্ধ করল।

নেবে?

পরাণ চাটুজ্জের মুহূর্তের জন্য স্মৃতিভ্রংশ হল যেন। লোভে চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল। এক যুগেরও ওপরের এই নেশার খোরাক বড় বেশি লোভনীয়। হাত বাড়িয়ে কৌটো নিল।

স্বাহা বলল, যখনই লাগবে আমাকে বোলো, আমি এনে দেব। ফুরোলেই পাবে। কেমন ?

পরাণ চাটুজ্জে ঘাড় নাড়ল।

স্বাহা চলে গেল। তারপর নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করল। যা করেছে ভেবেই করেছে। তার জন্যে একটুও খেদ নেই, অনুশোচনা নেই। আফিমের মাত্রা বাড়ুক, তিনগুণ হোক, চারগুণ হোক। তবু স্মৃতিভ্রংশ হোক আবার। অনড় জড় বস্তুর মত আগেরও তিনগুণ ঝিমোক চব্বিশ ঘণ্টা। এই নিরুদ্বেগ ঝিমুনির মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাক একদিন। এই যাতনা আর এই উন্মত্ততা আর এই বিভীষিকা থেকে সেও ভালো—সেও কাম্য।

কিন্তু তবু চোখে ঘুম নেই স্বাহার।

পরদিন সকালে একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল তার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বিনয়কেষ্টর গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে। কাদের যেন কি বলছে সে। স্রস্ত বেশ-বাসেই তাড়াতাড়ি উঠে এলো।

পরাণ চাটুজ্জে নিখোঁজ। তার ঘরে গতকালের আফিমের কৌটোটা স্বাহা যেমন দিয়ে এসেছিল তেমনি পড়ে আছে। ঘরের সব কিছুই ঠিক তেমনি পড়ে আছে।

বিনয়কেষ্ট অনেক লোক লাগিয়েছে, অনেক তল্লাস করেছে—কিন্তু আর সন্ধান মেলেনি তার। বন চষা হয়েছে আবারও কিন্তু পরাণ চাটুজ্জে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

লোকে বলাবলি করেছে, প্রেতিনী ডেকে নিয়ে গেছে তাকে, আর তার সন্ধান মিলবে কেমন করে। কারো ধারণা, প্রেতিনী তাকে ভুলিয়ে গোয়ালফেলানীর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে কোনো জলন্ত চুল্লীতে ফেলে জীবন্ত ভস্ম করেছে। কারো বিশ্বাস সরস্বতীর নতুন জোয়ার গ্রাস করেছে তাকে। প্রেতিনীর মায়ায় সরস্বতী তাকে খাবে বলেই এবারে এত জল, এত বরষা।

তাদের আরো বিশ্বাস সেই প্রেতিনী পরাণ চাটুজ্জের নিজের স্ত্রী। নন্দিনী।

ছয়

আর গাব খাব না, গাবতলা

দিয়ে যাবনা।

গাব খাব না খাব কি, গাবের

তুল্য আছে কি ?

নন্দকে দেখলে হেসে তুলে ইদানীং এই টিপ্পনী কাটত স্বাহা। তাৎপর্য কাকের গলায় গাব আটকেছিল, কাক প্রাণের দায়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনোদিন আর গাব খাবে না। কিন্তু গাবের আঁটি গলা থেকে উঠে আসতেই আবার সে গাব খাবার জন্যে নেচে উঠল।

টিপ্পনীটা নন্দর বেলায় প্রযোজ্য বটে।

ইদানীং মণ্টির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিবাদ আর ছোট দারোগা কেতুর সঙ্গে পরোক্ষ বিবাদটা দানা বেঁধে উঠেছিল। মণ্টির অত্যাচার নন্দ হয়ত সামলে উঠতে পারত, যুঝতে পারত। কিন্তু রাজশক্তি যার সহায় তার সঙ্গে নন্দ এঁটে উঠবে কেমন করে। মাস তিনেক আগেও কেতু তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে সিপাই দিয়ে ঝাঁকুনীর চোটে হাড়গোড় নড়িয়ে দিয়েছিল একদফা।

কেতুর নিজের আর স্বার্থ তেমন নেই, সে বিয়ে করেছে। বিয়ে ঠিক করেনি, বাপ বিয়ে দিয়েছে। যে-টুকু করে, মণ্টির স্বার্থে করে। স্বাহা কার ঘরনী হবে সেটা সেই যে চারু বোষ্টুমী তাকে শুনিয়ে রেখেছিল—এখনো সে তাই বিশ্বাস করে। স্বাহাকে দেখলে এখনো তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, লোভে দুচোখ চকচকিয়ে ওঠে। দারোগাগিরির ঝামেলায় দেখা অবশ্য কমই হয়, এদিকে আসার সময় তেমন হয়ই না—কিন্তু একদিন দেখলে দিনকতক আর ভুলতে পারে না। তার আশা মণ্টির সঙ্গে বিয়ে হলে ভবিষ্যতে একটু আধটু গান-বাজনা শোনা যাবে, চোখের ক্ষুধা অন্তত মাঝে মধ্যে মিটবে। তাই প্রয়োজনে নন্দকে কড়া শাসন করতে তার আর আপত্তি নেই।

নন্দ এই দুজনের একজনকে অন্তত ভবপারে পাঠাতে পারে একেবারে। শরীরের রক্ত তেমন ফুটলে ইচ্ছেও হয় এক-সময়। কিন্তু ফলাফল ভেবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আবার। যার জন্যে এত, তাকেই তো চিরকালের মত ছেড়ে যেতে হবে তাহলে। এই গাঁ থেকে তো পালাতেই হবে তখন। অতএব শেষ পর্যন্ত মুখ বুজেই অত্যাচার সহ্য করে সে। পীড়নের মাত্রা বাড়লে অথবা বে-কায়দায় পড়ে গেলে দোষ স্বীকার

করে, বলে, আর কখনো ভিটের ত্রি-সীমানা মাড়াবে না। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই দুর্নিবার আকর্ষণে আবার না এসে পারে না।

আসে। পীড়ন সয়। স্বাহার টিকা-টিপ্পনীও।

কিন্তু সদ্য বর্তমানে নন্দর গলা থেকে গাবের আঁটিটা যথার্থ ই যেন নেমেছে। তাই আবার ঘন ঘন তাকে দেখা যাচ্ছে এখানে। স্বাহার ছড়া কাটা আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপও বেড়েছে তেমনি।

নন্দর ভরসার কারণ বাসনা। চারু বোষ্টুমীর আকৃতি তার মনে ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু সে-ই হঠাৎ বেশ একটু সদয় যেন নন্দর ওপর। মন্টিকে অনেকদিনই সে ওর সঙ্গে লাগতে বারণ করে দিয়েছে। বাসনার সামনে মন্টির সর্ব দাপট ঠাণ্ডা। কিন্তু সে শুধু বাসনার সামনেই, আড়ালে নয়। বাসনার অনুশাসনের ফলেই আড়ালে সে বিষধর।

কিন্তু সেদিন বাসনা সত্যিই ক্ষেপে উঠেছিল মন্টির উপর। নন্দকে থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে শুনে রাগে কাঁপছিল সে। সেই রাগ দেখে মন্টি ছেড়ে নন্দও হতভম্ব। অপমানটা যেন বাসনারই। মন্টিকে ডেকে বাসনা ঝাল মিটিয়ে গালাগাল করেছে। আর বলেছে, আবার যদি তার নামে একটা নালিশ শোনা যায়, তাহলে এখানকার ভিটে থেকে দূর দূর করে বিদেয় করবে তাকে, লোক ভাড়া করে এনে ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে তাড়াবে।

সেই থেকে নন্দর গলার গাবের আঁটি নেমেছে।

চারু বোষ্টুমীর ঘরে কায়েমী বসবাস করছিল মন্টি। টাকা আছে বলে যারা তাকে সমীহ করে তাদের সে তেজ দেখাতে পারে। কিন্তু তার টাকার পারোয়া করে না যে তাকে সে টাকার গরম দেখাবে কেমন করে? আর গরম দেখালেও যে এই ভিটে ছাড়তে হয়। সেটা সইবে কেমন করে? আর কিছু না হোক, ওই মেয়েদুটোর সঙ্গে মাঝে মধ্যে একটু খোল বাজানোর সুযোগ যে পায় সেই লোভেই সে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এখানে। মাঝে মধ্যে কারণ, এখন আসর বসানোটা নির্ভর শুধু বাসনার মর্জি আর মেজাজের ওপর। সেই মর্জি বা মেজাজ কচিৎ কখনো হয়। এই একটুখানি আনন্দের জন্য মন্টি আর বিনয়কেষ্ট উন্মুখ হয়ে থাকে। বাসনা একলা গায়। বিনয়কেষ্ট বেশিরভাগ গায় স্বাহার সঙ্গে। ওদের দুজনের গান শুনতে শুনতেও কখনো আবার মেজাজ বিগড়য় বাসনার। গম্ভীর মুখে উঠে চলে যায়।

নন্দর প্রতি বাসনার স্নেহ-দৃষ্টির কারণ স্বাহাও সঠিক বুঝে ওঠে না। নন্দ নিজেও না। স্বাহার সঙ্গে যে নন্দর বিয়ে হতে পারে না প্রকারান্তরে তাকে সেটা বুঝিয়েই দিয়েছে বাসনা। বলেছে, নন্দ বামুনের ছেলে হলে বেশ হত, আপন জন

আরো আপন হতে পারত। মনে মনে নন্দ জাত জিনিসটাকে কটূক্তি করেছে, সেই সঙ্গে বাসনাকেও। কিন্তু মুখে প্রকাশ পায়নি। অন্তত চেষ্টা করেছে একটা উদগ্র অসহিষ্ণুতা গোপন করতে।

বাসনা তাকে চুপি চুপি হাত দেখায় অনেক সময়, গোপনে ভবিষ্যত সম্বন্ধে এটা-সেটা জিজ্ঞাসাও করে। কিন্তু তাও আবার গোপন থাকে না সব সময়। স্বাহা দেখে ফেলে বা শুনে ফেলে। দিদিকে ভয় একটু আধটু করলেও মুখ বুজে বসে থাকে না স্বাহা। যা মুখে আসে বলে ফেলে, তারপর তাড়া খেয়ে ছুটে পালায়। কখনো আবার দিদিকেই জড়িয়ে ধরে হি হি করে হেসে গড়ায়।

এমনি একদিন হাত দেখানো ধরে ফেলে স্বাহা গম্ভীর মুখে কাছে এসে নন্দকেই বলে বসল, দিদির ছেলেপুলে কবে হবে দেখো দেখি গণক ঠাকুর—

বাসনার মুখ থেকে যেন সব রক্ত সরে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর দ্বিগুণ লাল হল। সেদিনে হাত দেখা আর হল না, নন্দ নিজেই হকচকিয়ে গেছে। যেন মস্ত ঠাট্টার কথা, হাসতে হাসতে একটু বাদেই সে উঠে পালিয়েছে। স্বাহা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে মিটিমিটি।

আড়ষ্টভাব কাটিয়ে বাসনা তাকালো তার দিকে, দিনকে দিন বড় বেশি ফাজিল হয়ে উঠেছিস, কেমন ?

ফাজিল আবার কি, স্বাহা রাগ বিরাগের ধার ধারে না, ছ'বছর বিয়ে হয়েছে এখনো তোর একটা ছেলে পুলে হল না কেনরে দিদি !

একবারের ঘা সামলে ওঠার আগেই তার ওপর ফিরে ঘা পড়ল যেন আবার একটা। বাসনা ফ্যাল ফ্যাল করে আবারও বোনের দিকে চেয়ে রইল খানিক। আত্মস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। তাকে উঠতে দেখে ছোট মেয়ের মতই স্বাহা দৌড়ে পালালো ঘর থেকে।

স্বাহাকে নিয়ে আর যেন পেরেই ওঠে না বাসনা। আঠারো পেরুতে চলল, চলনে-বলনে দ্বাদশীর দুরন্ত চাঞ্চল্য। যত দিন যাচ্ছে ততো যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠছে। একটু ধীর স্থির না, একটু শান্ত না। বয়েসের ঘোষণা শুধু তনুতটে, আর কোথাও না। বাসনার যত রাগ গিয়ে পড়ে বিনয়কেষ্টর ওপর। পারতঃ এই কর্ত্রীটির কাছে ঘেঁষতে চায় না বিনয়কেষ্ট। উঠতে বসতে কটূক্তি-বাণে জর্জর অবস্থা তার। বাসনা বলে, শুধু তোমার জন্যেই, তোমার আস্কারা পেয়েই নির্লজ্জ বেহায়ার মত দিন দিন ধিঙ্গী হয়ে উঠছে ওটা।

স্বাহা দিদির বচন শোনে, আর আড়ে আড়ে ভগ্নিপতির অপরাধী মুখখানি দেখে। বিনয়কেষ্ট মুখোমুখি কোনো জবাব দেয় না, প্রতিবাদ তো করেই না। দিদি চলে

গেলে স্বাহাও চোখ রাঙায় তাকে।—এই করে আমার মাথাটা খাচ্ছ তুমি খ্যা? আমি কিছু বুঝতে পারি না বলে?

বিনয়কেষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, এদিকে আয় শাসন করি।

স্বাহা বলে, ভালো হবে না, দিদি মুখে বলছে, কাছে এলে আমি হাতে বলব।

বিনয়কেষ্টর কাতর জবাব, সে যে বড় মিষ্টি লাগবে গো!

স্বাহা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

তাই দেখে বিনয়কেষ্ট আর একটা ছদ্ম নিঃশ্বাস ফেলে, গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয় ধারা।

চিন্তায় ভাবনায় বাসনার চোখে ঘুম নেই সত্যি কথা। স্বাহার দিকে চেয়ে বুকের রক্ত নাকি তার জল হয়ে যায়। এমন সর্বনেশে রূপ কে দেখেছে? স্থির রূপ নয়, অস্থির রূপ—সর্বাঙ্গে অস্থির রূপের তরঙ্গ। এই বয়সের এই মেয়ে কে ঘরে জিইয়ে রাখে? ফলে বিনয়কেষ্টর ওপরেই গঞ্জনা বাড়ে। সেই গঞ্জনা এক-একসময়ে নিষ্ঠুরও হয়ে ওঠে। স্বাহা তখন ভগ্নিপতির হয়ে দিদির সঙ্গে তর্ক করে।

গুন্‌গুন্ গান লেগেই আছে দু'জনের মুখে—বিশেষ ক'রে বিনয়কেষ্টর মুখে। সেই গান যে রসের গান তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বাসনার কানে গেলেই জ্বলে ওঠে সে। আগে প্রকাশ্যে কিছু বলত না, এখন প্রকাশ্যেই বলে।

সেদিনও সেই একটা গান থেকেই তুমুল হয়ে গেল।

বাসনা রান্নায় ব্যস্ত ছিল। ঘরের মধ্যে দু'জনে বসে খুনসুড়ি করছে সেই থেকে, তার আভাস কানে যাচ্ছে। বাসনার একবার ইচ্ছে হচ্ছে, হাতের খুন্তি দিয়ে বোনের পিঠে দুই-এক ঘা বসিয়ে দিয়ে আসে। বিনয়কেষ্ট দুর্যোগ আসন্ন জানত না, মনের আনন্দে গান ধরে একটু চড়িয়েই বসেছিল:

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গি নীরে।
অধর সুরঙ্গিনী, অঙ্গ তরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে।

হাতের খুন্তি থেমে গিয়েছিল বাসনার। চুপচাপ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল দুজনের কেউ খেয়াল করেনি। স্বাহা সঙ্গীত-স্তুতির জবাবে বড় করে জিভ ভেঙাবার উপক্রম করেছিল। বার করা জিভ আর ভেতরে টেনে নেবার অবকাশ হল না। কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই চমকে উঠল।

—নব নব রঙ্গিনীকে তোমার নিজেরই সঙ্গিনী করার মতলব তাহলে? বাসনা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

বিনয়কেষ্টর স্ফূর্তিটা কেন জানি একটু বেশিই হয়েছিল সেদিন। জবাব না দিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে স্বাহার দিকে তাকালো। সে চাউনির তাৎপর্য, ধরা পড়ে গেলাম যে!

স্বাহা অতিকষ্টে হাসি চাপল।

বাসনা জলে উঠল আরো—বলি, অধর-সুরঙ্গিনী-অঙ্গ-তরঙ্গিনীর শোভা নিজেই দেখবে, না আর কারো খোঁজ করবে?

এই এক বচসা লেগে আছে। স্বাহার রাগই হয় এক-একসময়। কিন্তু দিদির রাগ দেখে নিজের রাগটুকু চেপেই রইল। ওদিকে আবার ভগ্নিপতির মুখের দিকে চোখ পড়তে হাসি সামলানো দায়। সে যে-ভাবে চেয়ে আছে স্ত্রীর দিকে তার করুণ মর্ম, আপত্তি তো ছিল না, কিন্তু তোমার যে মূর্তি দেখছি…

এবারে তাকেই খুস্তিপেটা করবে যেন বাসনা। আরো দু'পা এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, তুমি ওর জন্যে একটা ছেলে দেখবে কিনা আমি জানতে চাই? সাত দিনের মধ্যে আমি ওর বিয়ে দেব বলে রাখলাম, তা যদি না পারো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

মুখ বুজে না থেকে বিনয়কেষ্ট এবারে নিরীহ-মুখে বলে বসল, সাত দিনের কি দরকার, আজই তো হতে পারে, আমি…মানে আমার কিছু অসুবিধে নেই।

সামনাসামনি ভগ্নিপতির এই রসিকতার সাহস দেখে স্বাহাও অবাক হয়েছে একটু। বিনয়কেষ্টর মুখের ওপর বাসনা যেন নিঃশব্দে দুই চোখের আগুন ছড়ালো খানিকক্ষণ। তারপর অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে ফেটে পড়ল একেবারে।—খুব রস হয়েছে, কেমন? রসের কথা কইতে বড় ভালো লাগে, না? তুমি কি, সেটা তুমি নিজে জানো না? নির্লজ্জ বেহায়া বেইমান।

দিদির কটু কথা অনেক শুনেছে স্বাহা কিন্তু এমন আর শোনেনি। এত ঘৃণা আর কখনো দেখেনি। কি বলল, কেন বলল, সঠিক বোধগম্য হয়নি। আরো অবাক ভগ্নিপতির মুখের দিকে চেয়ে। বিবর্ণ পাংশু মরা মানুষের মুখ যেন। একটু আগের নিরীহ চপলতা নিশ্চিহ্ন। এক ফুঁয়ে কে যেন তার জীবনের আলোটুকুসুদ্ধ নিবিয়ে দিয়েছে।

বাসনা চলে যেতে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো স্বাহা। বিনয়কেষ্ট মুখ নিচু করে বসে। পিঠে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে স্বাহা বলল, কি গো রসরাজ, হল কি হঠাৎ। নিজে তুমি কি? নিজে কি জানো?

জবাব না দিয়ে বিনয়কেষ্ট নিঃশব্দ যাতনায় ঘর ছেড়ে চলে গেল।

স্বাহা হতভম্ব। লোকটার প্রতি করুণা হল তার, খুব একটা দুর্বল জায়গায়ই বড় রকমের ঘা বসিয়েছে দিদি। দিদির এই নির্যাতনের জন্যই মানুষটার ওপর সব সময় করুণা হয় স্বাহার। দিদির ওপর রাগ হয়। কিন্তু আজ শুধু রাগ নয়, কৌতূহলও। দিদি ও-সব কি বলে গেল আবার!

দিন তিনেক চুপচাপ কাটালো বিনয়কেষ্ট। তার কিছু বলার আছে। স্বাহার বিয়ে কার সঙ্গে হবে সেটা এক রকম স্থির হয়ে আছে বলেই তার ধারণা। হচ্ছে না কেন এখনো, সেটা অবশ্য অত তলিয়ে ভেবে দেখেনি। মেয়েটা সত্যি সত্যি গোটা মন জুড়ে আছে তার, যতদিন বিয়ে না হয়, কাছে কাছে চোখে চোখে থাকে, ততদিনই আনন্দ। তাই বলেনি কিছু, তাগিদও দেয়নি। অবশ্য বিয়ে হলেও চোখের কাছেই থাকবে—মন্টিতো আর বিয়ে করে বউ নিয়ে এখানকার বাস তুলে দিচ্ছে না, এখানেই থাকবে। তবু বিয়ে হয়ে গেলে এক, আর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আর এক।

স্বাহার বিয়ের জন্য পাত্র দেখার তাগিদ আগেও অবশ্য দিয়েছে বাসনা। কিন্তু সেই তাগিদটা তার মনের তাগিদ বলে ভাবেনি বিনয়কেষ্ট। বোনের প্রতি দরদে আরো ভালোর সন্ধান একটু-আধটু করতে চায় ভেবেছে। আসলে বিয়েটা মন্টির সঙ্গেই দেবে ধরে নিয়েছিল। তা না হলে মন্টিকে এত প্রশ্রয় কেন? সে আপন জনের মতই তো আছে এখানে। যেটুকু দ্বিধাভাব বাসনার মনে আছে, তাও বিনয়কেষ্ট একদিনেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাটিয়ে তুলতে পারবে বলে বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু সেদিন স্পষ্টই বোঝা গেল বাসনার সঙ্কল্পটা তার ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিক মিলছে না। এতদিনে স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করল বিনয়কেষ্ট। অনুকূল অবকাশের প্রতীক্ষায় দিন তিন-চার কেটে গেল। তারপর একদিন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মন্টির সঙ্গে স্বাহার বিয়ে দেবেই না ঠিক করেছ?

ভিতরের দাওয়ায় বসে আনাজ কুটছিল স্বাহা, কানে গেল। ভুরু কোঁচকালো। তারপর কান খাড়া করল।

বাসনা পা ছড়িয়ে বসে একটা ছেঁড়া আসন তালি দিচ্ছিল। থমকালো একটু, ঠাণ্ডা দুই চোখ বিনয়কেষ্টর মুখের ওপর আটকে গেল। সশ্লেষে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, কেন, দিলে তোমার রঙ্গ-রসে সুবিধে হয় বেশ?

স্ত্রীর মেজাজ এখনো প্রসন্ন নয় দেখে বিনয়কেষ্ট মনে মনে ঘাবড়ালেও অন্তরঙ্গ বিনয়েই জবাব দিল, আমার সুবিধে অসুবিধে দেখে তুমি তো আর বোনের বিয়ে দেবে না—আমি তো ভেবেছিলাম বিয়েটা মন্টির সঙ্গেই হবে।

তা ভাববে না কেন! রাগে বাসনার গলা চড়ে গেল, নিজে বুড়ো বয়সে বিয়ে

করেছ, যত সব বুড়ো হাবড়াই তো পছন্দ হবে তোমার। লজ্জাও করে না আবার মুখ নেড়ে কথা বলতে।

আসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাসনা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বিনয়কেষ্ট মুখ চুন করে বসে রইল। স্বাহার সঙ্গে মন্টির বয়েসের কিছু তফাত হয় বটে, কিন্তু সেটুকু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্তত তার সঙ্গে তুলনীয় তো নয়ই। শক্ত সমর্থ যোয়ান ছেলে মন্টি। কিন্তু আলোচনা দূরে থাক, বিনয়কেষ্টর মুখের ওপর আবারও যেন চাবুক বসিয়ে গেল বাসনা।

স্বাহা দস্তুরমত চটে গেল দিদির ওপর। মন্টির সঙ্গে বিয়ে দেবো না বলে নয়, ও মন্টি-ফন্টিকে বিয়ে সে করতেও চায় না। রাগ, নিরীহ ভালো মানুষটাকে উঠতে বসতে দিদি অত গঞ্জনা দেয় বলে। বছরের পর বছর দিদির এই নিষ্ঠুরতা দেখে আসছে। সেটা বাড়ছেই যেন ক্রমশ। লোকটার প্রতি মমতায় স্বাহার দুচোখ ছলছলিয়ে ওঠে এক-একদিন। ভেবে পায় না, দিদি এমন করে কেন। দিদিকে আক্কেল দেবার জন্য অন্তত আজ এই মুহূর্তে সে ওই মন্টিকেই বিয়ে করে বসতে পারে। স্বাহার বিশ্বাস, ও না থাকলে দিদি অনেক আগেই মানুষটাকে ঘর-ছাড়া করত।

বঁটি উল্টে রেখে স্বাহা নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল। বিনয়কেষ্ট বিষণ্ণ মুখে বসে আছে চুপচাপ। কাছে গিয়ে স্বাহা চিবুক ধরে মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে দিল। তারপর কলহের সুরে বলল, দিয়েছে তো ঝেঁটিয়ে ঠাণ্ডা করে, আরো যাও ঘটকালী করতে।

আঘাত পেয়ে পেয়ে আঘাত আবার সয়েও যায় কিছুটা। বিনয়কেষ্টর সেই অবস্থা। তাছাড়া এই মেয়েটা তরতাজা এক ঝলক আলোর মতই, কাছে এলে একরাশ গুমোট আঁধারও আড়ালে সেঁধোয়। ওর সামনে যেটুকু সময় মুখ ভার করে থাকা সেইটুকুই লোকসান। সশব্দে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিনয়কেষ্ট অপরাধটা স্বীকার করেই নিল। বলল, না আর যাব না ঘটকালী করতে, এবারে নিজের কাঁধেই ঝোলাব তোকে ভাবছি।

আ-হা, সেই ভালো। সেই ভালো। স্বাহা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল তার।

বিনয়কেষ্টর শোক তাপ জুড়িয়ে জল। আর কেউ না শোনে এমনি মৃদু গলায় গুন্‌গুনিয়ে উঠল,

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি।
গোকুলে আমার স্থিতি।

হাত বোলাবার ছলে পিঠে গোটাকতক চিমটি কাটল স্বাহা। বিরহ-তাপে জর্জরিত রাই-মুখ করে টেনে টেনে বলে উঠল, মরে যাই, এমন রূপের জোয়ারে মরে বাঁচিনে কেন! ডাইনে-বাঁয়ে এই পটল-চেরা চোখ কোন্ পটুয়া বানালে গো—ওরা শত্তুর যারা বলে ট্যারা চোখ। এমন বাঁশির মত নাক কোন্ কারিগর গড়লে গো—তারা শত্তুর যারা বলে খ্যাঁদা নাক। তারা তিন শত্তুর যারা বলে কালো রঙ, এর থেকে অনেক কালো তোমরা, অনেক কালো ভোমরা—

আরো খানিকটা বলার সাধ ছিল স্বাহার, কিন্তু মনের মত তেমন আর কিছু মনে এলো না বলে সখেদে থেমে গেল।

পরিহাসে বিনয়কেষ্টও কম যায় না। তার দুই চোখে নীরব অনুযোগ ঝরল খানিক। চাপা সুরের জবাব প্রস্তুত তত্ক্ষণে :

রাধা—কালো বলে গাল দিও না,
তুমি কালোর মায়া ভালো জানো।
রাধা—কালো বলে গাল দিও না,
(আগে) চোখের কালো-তারা মুছে ফেলো
(তোমার) কালো কেশ কেটে ফেলো
(ওই) কালো কাজল, কালো ভুরু কি হবে ?
রাধা—কালো বলে গাল দিও না,
(তুমি) কালো কাঁচুলী পর কেন,
(ওই) নীল বসনে ঘন কালো ধরো কেন ?
রাধা—এবার কালো যমুনা ছাড়ো তবে।

স্বাহা খিলখিল করে হেসে উঠল। এই মানুষের সঙ্গে খুনসুড়ি করতে এই জন্যই এত ভালো লাগে তার। দিদিটা সর্বক্ষণ এরই ওপর এমন জলে জলে ওঠে কি করে ভেবে পায় না। দিনে দিনে কি যে হচ্ছে ওটা, রাগের আগুন একবারে!

মন্টির মুখখানা আজকাল বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেমন।

আগের মত যখন-তখন অত আর আসে না। মাঝখানে একটা ঘরের পরেই তার ঘর। এখান থেকে ডাকলে শোনা যায়। কিন্তু ডাকতে হত না কখনো। আগে রাগই হত স্বাহার, ঘরের মধ্যে সময় নেই অসময় নেই, বাইরের একটা লোক বসে থাকলে অসুবিধে হয় না! দিদিকে বলত, লোকে কুকুর বেড়াল পোষে জানি, তুই আস্ত একটা মানুষ পুষলি!

ফাঁক পেলে দিদির বদলে জবাবটা দিত বিনয়কেষ্ট। বলত, বোনের জন্যে পুষছে, কবে যে জোড়া লাগবে সেই আশায় দিন গুনছি।

স্বাহা রেগে যেত। কখনো বা বলত, তাতে পোড়া বালুর মত তোমার বুকের ভেতরটা কড়কড় করবে না তো তখন?

সেই মন্টিবাবু আসা কমিয়েছে। শুকনো মুখে ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়েই কাটায় বেশিক্ষণ। কারো শুকনো মুখ দেখলেই ভিতরে ভিতরে মন খারাপ হয় স্বাহার, অস্বস্তি হয়।···আর একখানা শুকনো মুখও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয় সর্বদা।

নন্দর মুখ। অবশ্য স্বাহার সামনে বাবুর হম্বিতম্বি কমেনি একটুও। গনগনে মুখের দিকে তাকালেই ভিতরের জ্বলুনি বোঝা যায়। দুনিয়ায় তার সব থেকে বেশি রাগ আর বিদ্বেষ বোধহয় স্বাহার ওপরেই। পারলে জ্যান্ত পুঁতত ওকে। ···এই সেদিনও স্বাহার সঙ্গে গোপনে যেন শেষ বোঝাপড়া করতে এসেছিল একটা। বোঝাপড়া করতে এসে বোকার মত লোভ দেখিয়েছিল ওকে—চল্, আমরা কলকাতায় চলে যাই, জ্যোতিষীর আসল ঠাঁই কলকাতা, কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। সেখানে ঘর বাঁধব আমরা, রাণীর হালে রাখব তোকে। যাবি?

প্রস্তাব শুনে স্বাহা আনন্দে আটখানা একেবারে।—এক্ষুণি! দাঁড়াও, দিদিকে একবারটি বলে আসি।

যে-চোখে তাকিয়েছিল নন্দ, মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়েও হাসি চাপতে পারেনি স্বাহা। তারপর কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়েছে আবার। —ভাগ্যিস বামুন নও, এক্ষুণি ভস্ম হয়ে যেতুম তাহলে।

নন্দ এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি আর। অত রাগ সত্ত্বেও বুকের তলায় নন্দর শুকনো মুখখানাই খচখচিয়ে উঠছিল থেকে থেকে। এখনো ওঠে।

কিন্তু মন্টির শুকনো মুখ ঠিক সে-রকমের নয়। কেমন দ্বিধাগ্রস্ত, সচকিত ভাব একটা। কেন? ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে না দিদি বলে দিয়েছে? স্বাহা ভাবে, দেবে নাই বা কেন। বিয়ে সেও মন্টিকে করতে চায় না, কিন্তু দিদি দিতে চায় না কেন! বয়েস বেশি? কত আর বেশি? তাছাড়া, সব দিক ভেবেচিন্তে দেখতে গেলে বিয়েটা স্বাহার মন্টিকেই করা উচিত। মনের সায় থাকুক আর নাই-ই থাকুক, সে উচিত-অনুচিত বুঝবে না কেন? এখানে বিয়ে হলে তবু কাছেই থাকতে পারে, বলতে গেলে একসঙ্গেই থাকা। ও দূরে চলে গেলে নির্যাতনে নির্যাতনে নিরীহ ভগ্নিপতিটিকে হয়ত মেরেই ফেলবে দিদি। এমনিতেই তো আধমরা করে রেখেছে। লোকটার বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যাওয়াও বিচিত্র নয় এর পর।

দিদির ওপর শোধ নেবার জন্তেই মণ্টিকে ইদানীং একটু আস্কারা দিচ্ছে স্বাহা। বিনয়কেষ্টকে ধরে নিয়ে গান গাইতে বসে, ওকে বলে খোল বাজাতে। মাঝে মধ্যে মন্টির সঙ্গে ঘুরে আসে এখানে সেখানে। মণ্টি যায় অবশ্য, কিন্তু ভয়ে ভয়ে যায়। সেদিন তো দিব্বি রাত করেই ফিরল দুজনে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে এসেছে তার ওপর। মণ্টি ওকে দাওয়ার কাছে ছেড়ে দিয়েই কাপুরুষের মত পালিয়েছে। স্বাহা আরো সদর্পে ঘরে ঢুকেছে।

বাসনার গোটা মুখ থমথমে গম্ভীর। গম্ভীরই থাকে সব-সময়। কিন্তু সেদিন আর চুপ করে থাকেনি বাসনা। একেবারে ছাল-চামড়া তুলে নেবায় জন্তই এগিয়ে এলো যেন। তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

গোয়ালফেলানীর শ্মশান পর্যন্ত। সেই ছেলেবেলা একবার গিয়েছিলাম, আর এই—বাবাঃ, সে কি এখানে! কি নাম রে বাবা, গোয়ালফেলানী—

বাসনা চিৎকার করে উঠল, গিয়েছিলি যখন আবার ফিরলি কেন—একেবারে চিতেয় উঠে বসলি না কেন?

যা করছে স্বাহা দিদির ওপর আক্রোশেই করছে। আক্রোশ চেপে হালকা হেসে বলল, কার সঙ্গে রে! একাই?

বাসনা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আরো। পারলে চুলের ঝুঁটি ধরে ওর মুখটা মাটিতে থেঁতলে দেয়।—হারামজাদী মেয়ে, ধুমসি থিঙ্গীর মত হুট হুট করে নেচে বেড়াতে লজ্জা করে না তোর?

স্বাহার আগুন-বরণ মুখ আগুনের মতই পলকের জন্য ঝলসে উঠল একবার। তারপরই নির্বিকার, শান্ত।—গাল পাড়িস কেন? তুই নাচতে পারিস না বলেই তো এই অবস্থা তোর, তুইও নেচে বেড়া না, কে বারণ করছে?

দড়ি থেকে শুকনো শাড়ি টেনে নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

বিনয়কেষ্ট ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল এতক্ষণ, তাড়াতাড়ি অন্তদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

স্তব্ধ পাংশু মূর্তি বাসনার।

সেই স্তব্ধতার অবসান হয়নি। এরপর ক'টা দিনের মধ্যে কেউ আর গলা শোনেনি তার, একটা কথাও শোনেনি। ভিটের চারজন অপরিচিতের বাস যেন দুই বোন, বিনয়কেষ্ট, আর মণ্টি।

ব্যতিক্রমের মধ্যে দুপুরে পরপর দু'দিন নন্দকে আসতে দেখেছে স্বাহা তার কাছে নয়, দিদির কাছে। সে যতক্ষণ ছিল, স্বাহা ততক্ষণ বাইরের দাওয়ায় বসে কাটিয়েছে। পারতঃ দু'বোন ঘরে থাকেও না একসঙ্গে। দিদির গলা শোনেনি, কিন্তু সে-

হাত দেখাচ্ছে টের পেয়েছে। দিদি কোন্ ভবিতব্যের কথা জানতে চায় জানে না, স্বাহা নন্দর ফিসফিস গলা শুনেছে শুধু।

যাবার মুখে দু'দিনই নন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে তার। কথা একটাও হয়নি। নন্দর মুখে মন্টির মুখের মত সেই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য করেছে স্বাহা। দু'দিনই। ওর সঙ্গে দেখা না হলেই যেন নন্দ স্বস্তি বোধ করত।

গাঁয়ের সব খবর যেমন বাতাসে ছড়ায়, এই খবরটাও তেমনি ছড়ালো।

তার ওপর পরাণ চাটুজ্জের ভিটের খবর। গরম খবর। বাসনার খবর আর মন্টির খবর।

বাইরে থেকে অনেকেই এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। সর্বপ্রথম ভিতরে ঢুকলেন সূর্য হালদার।

জীবনে কাউকে আর মুখ দেখাতে না হলে বিনয়কেষ্ট বেঁচে যেত বোধহয়। কিন্তু শুভার্থীজনকে মুখ না দেখিয়েই বা পারবে কি করে। তারাই দেখে ছাড়বে।

সূর্য হালদার সরাসরি ঘরে এসে বসলেন। ভিতরের দাওয়ায় বসে স্বাহা আগন্তুকের সাড়া পেল। ক'টা দিন এক অদ্ভুত বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তার। কাটছে। বিনয়কেষ্টর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। একটি কথাও বলতে পারেনি। বোবা বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভণিতা ছেড়ে সূর্য হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, খোঁজ-খবর করেছ কিছু, না চুপচাপ বসেই আছ?

বিনয়কেষ্ট নিঃসাড় বিবর্ণ মুখে মাথা নাড়ল শুধু, করেনি।

সূর্য হালদার বললেন, আমি করেছিলাম। খোঁজ পেয়েছি।

স্বাহা চমকে উঠল। উৎকর্ণ হল।

সূর্য হালদার জানালেন, কেদুকে বলতে সে লোক লাগিয়েছিল। থানা-পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় আর যাবে। তিন গাঁ ছাড়িয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে তারা। বিনয়কেষ্ট থানায় একটা ডায়েরী করলে কেদু ধরে নিয়ে আসতে পারে তাদের।

বিনয়কেষ্ট আবারও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ, তার আর দরকার নেই।

সূর্য হালদার সায় দিলেন, কি দরকার, আর তো তাকে নিয়ে ঘর করতে পারছ না।...মন্টি ছোঁড়াটার টাকা আছে কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু সেই জন্যে এমন মতি হবে মেয়েটার কে জানত। যাই বলো, প্রশ্রয় তুমি বড় বেশি দিয়েছিলে ছোঁড়াটাকে,

ঘরের কোণে কালসাপ পুষেছিলে। গলা আরো খাটো করে বলেছেন, আমরা ভেবেছিলাম ঐ ছোট মেয়েটার সর্বনাশ করবে—এমনটা হবে ভাবিনি।

বিনয়কেষ্ট নিরুত্তর।

এদিক-ওদিক তাকিয়েছেন সূর্য হালদার, আর কাউকে দেখবেন আশা করেছিলেন। না দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন, স্বাহা কোথায়, কাঁদছে-টাঁদছে নাকি খুব?

ঘাড় নেড়ে বিনয়কেষ্ট শেষের জবাবটা দিল শুধু। কাঁদছে না।

আরো কিছু বলার ছিল হয়ত সূর্য হালদারের, আরো কিছু পরামর্শ দেবার ছিল। কিন্তু কি ভেবে বললেন না কিছু। সব কথারই সময় আছে একটা। সেই সময়ের প্রতীক্ষা করাটাই সমীচীন বোধ করলেন তিনি। আবার আসবেন জানিয়ে সেদিনের মত গাত্রোত্থান করলেন।

দিন সাতেক পরের দ্বিতীয় আগন্তুক নন্দ।

তাকে দেখামাত্র এতদিন কেন আসেনি সে-কথাটাই প্রথম মনে হল স্বাহার। মনে হল, এই না আসাটা ইচ্ছাকৃত। আর, আজও এসেছে যেন চোরের মত। অথচ এই ঘটনায় তারই সব থেকে বেশি আনন্দ হবার কথা, সব থেকে বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠার কথা।

মনে মনে অনেক কিছু সংকল্প এঁটে এসেছিল নন্দ। ভেবেছিল, বিনয়কেষ্টকে ভবিতব্যের তত্ত্বকথা শোনাবে কিছু। এটা আজকাল মন্দ পারে না নন্দ। আর, স্বাহাকে সান্ত্বনার কথা বলবে দু'চারটে। কিন্তু এসে দেখে বিনয়কেষ্ট ঘরে নেই।

খুব ভোরে উঠে বিনয়কেষ্ট দোকান দেখাশুনা করতে যাচ্ছে ক'দিন ধরে।

কিন্তু স্বাহার সামনাসামনি বসে একটা সান্ত্বনার কথাও মুখে জোগালো না নন্দর। আবোল-তাবোল দু'পাঁচ কথা বলে শেষে মনের তলার গোপন খবরটাই একসময়ে ব্যক্ত করে ফেলল সে। বাসনা নাকি একদিন বলেছিল, বৈষ্ণব মতে নন্দ স্বাহাকে বিয়ে করতে পারে, তার আপত্তি নেই।

স্বাহা তার কোন কথাই ঠিক শুনছিল না, উঠে যাচ্ছে না বলেই বরং মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। হঠাৎ শেষের এই প্রস্তাব কানে যেতে দু'চোখ ধারালো হয়ে উঠল। নন্দর মুখোমুখি ঘুরে বলল সে—কবে বলেছিল?

নন্দ বিড়বিড় করে জবাব দিল, যাবার দিন দুই আগে।

সে যে চলে যাবে এখান থেকে সে-কথাও বলেছিল তোমাকে?

নন্দ সজোরে মাথা নাড়ল।—আমাকে বলতে যাবে কেন, এ-সব কেউ কাউকে বলে নাকি!

স্বাহা নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে। দেখছে। নীরবে তার অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন।—না বললেও সে-যে যাবে তুমি বুঝেছিলে?

নন্দর মুখে অস্বস্তির ছাপটা বড় বেশি স্পষ্ট। প্রস্তাবের ফলে এমন জেরার মধ্যে পড়বে তা একবারও ভাবেনি। মাথা নাড়ল, সে কিছু জানত না, কিছু বোঝেওনি। বলল, হাত দেখে কি এত সব বোঝা যায়···

স্বাহা তবু অপেক্ষা করল একটু, তেমনি চেয়ে রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, এখন ওঠো তুমি—ঘরের অনেক কাজ পড়ে আছে।

স্বাহার মুখ থেকে প্রস্তাবের জবাবটা না শুনে নন্দর ওঠার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভাবগতিক দেখে জবাব চাইতে ভরসা পেল না। আপাতত ওর সামনে থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে সেও।···যাক দিন কতক, এখন আর তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুর্ভাবনার কাল অপগত।

মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল, কাল আসব?

স্বাহা বসেছিল, সটান উঠে দাঁড়াল। বলল, কাল না, পরশু না—কোনোদিন না। আর এসে কাজ নেই।

ঘর ছেড়ে সে-ই আগে রান্না ঘরের দাওয়ার দিকে চলে গেল।

নন্দ বাইরে এসে বড় করে নিঃশ্বাস নিল। সমস্ত মেয়ে জাতটার সম্বন্ধে অস্ফুট হালকা কটূক্তি করল একটা। স্বাহা যা-ই বলুক আর যত রাগ দেখাক, ও নিশ্চিন্ত মনে হাওয়ায় ভাসতে পারে এখন। নন্দ গাইতে পারে না, কিন্তু এই মুহূর্তে গুনগুনিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে তারও:

রাই—
আমি ছাড়া গতি নাই।

সেই দুপুরেই সূর্য হালদার এসে হাজির। আবাব আসবেন বলেই গিয়েছিলেন। দাওয়ায় উঠে হাঁক দিলেন, বিনয়কেষ্ট আছ নাকি হে?

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়কেষ্ট বিশ্রাম করছিল একটু। বিশ্রামের নামে মরার মত পড়েছিল। স্বাহা ভিতরের আঙিনায় বসে। মেঘলা আকাশে রোদ ছিল না, তাই দূর্বাঘাসের ওপর বসেছিল চুপচাপ। দিদি যাবার পর থেকে এতদিনের মধ্যে স্বাহা কটা কথা বলেছে ভগ্নিপতির সঙ্গে, হাতে গুণতে পারে। এত দুর্বল এত নিরীহ মানুষটা যে মুখের দিকে চাইলেও বুকের ভিতরটা টনটন করে। এক নারীর বিশ্বাস-ঘাতকতা যেন সমগ্র নারী জাতটার ওপর কলঙ্ক ছড়িয়েছে। স্বাহাও সেই নারীরই একজন।

সকালে নন্দ উঠে যাবার পর থেকেই সে কি একটা সঙ্কল্প আঁটছিল মনে মনে।

এভাবে ক'দিন চলতে পারে? চলে না, চলতে পারে না। চলতে দেবেও না স্বাহা? আজ আবার আগের মতই সে কথাবার্তা কইবে বিনয়কেষ্টর সঙ্গে।...আগের মত? আগের থেকে বেশি কিছু বলতেই বা বাধা কি!

কিন্তু বিনয়কেষ্ট দোকানের কাজ সেরে ঘরে পা দেবার পর সেটা আর কেন জানি পেরে ওঠেনি স্বাহা। মুখে কথা সরেনি। চুপচাপ হাত মুখ ধোবার জল এনে দিয়েছে, চুপচাপ খেতে দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের জন্য উঠোন পেরিয়ে মাঝের কুটিরে যাবে বলে পা বাড়িয়েছিল। সেখানেই শোয় সে। কিন্তু স্বাহা এই ঘরেই বিছানা পেতে রেখেছে তার জন্য। মুখের কথায়ও নয়, ইঙ্গিতে শুধু এইখানেই বিশ্রাম করতে বলে স্বাহা নিজে ভিতরের দূর্বা-আঙিনায় এসে বসেছে।

সূর্য হালদারের হাঁক শুনে বিনয়কেষ্ট ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল। বিভ্রান্ত ভাব, বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

ঘুমুচ্ছিলে নাকি? সূর্য হালদার এদিক ওদিক তাকালেন।

না, বসুন—। বিছানার এক কোণে সরে গেল সে।

সূর্য হালদার বসলেন। গলা চড়িয়ে বললেন, আসব বলেছিলাম কিন্তু ক'দিন শরীরটা তেমন ভালো ছিল না হে, আর ভালো থাকবেই বা কি করে, বয়েস তো হল।

বয়েসের ছাড়পত্র তাঁর আছে বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ ঠিক চোখে পড়ে না। বরং তাঁর থেকে অনেক বেশি অসুস্থ আর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে বিনয়কেষ্টকে।

সূর্য হালদার বললেন, না এসেও তো পারি না, মন পোড়ে যে—তোমাদের দিদিমাও তার ছোট নাতনীটার জন্যে ভেবে সারা। · তা, এখন কি ঠিক করলে বলো দেখি—

বিনয়কেষ্ট মাথা নাড়ল, ঠিক কিছুই করা হয়নি।

কিন্তু এভাবে তো চলে না ··আর ভালও দেখায় না। ওই বয়সের মেয়ে, এরই মধ্যে তো পাঁচজনে পাঁচরকম কানাকানি শুরু করেছে। আমার কানে আসতে অবশ্য ধমকে দিয়েছি, কত বড় বিপদ গেল বিনয়কেষ্টর, আগে ওকে সামলে উঠতে দাও একটু—।

প্রত্যাশীর মত তাঁর দিকে চেয়ে রইল বিনয়কেষ্ট, যেন তিনিই শেষ আশা-ভরসা।

সূর্য হালদার পরামর্শ দিলেন, আমি বলি কি, মেয়েটাকে দিন-কতকের জন্যে না হয় আমার ওখানেই পাঠিয়ে দাও, ওর দিদিমার কোলে গিয়ে জুড়োক দুটো দিন, তার পর ধীরেসুস্থে তুমি এদিকের ব্যবস্থা করো।

স্বাহাকে দিদিমার কাছে পাঠানোর পরামর্শটা বুঝল বিনয়কেষ্ট, কিন্তু তারপর

ধীরেসুস্থে এদিকের ব্যবস্থা কি করবে ঠিক বোধগম্য হল না তার। সেটা অনুমান করে সূর্য হালদার ব্যবস্থাটা স্পষ্ট করেই বিশ্লেষণ করলেন এবার। বললেন, যে গেছে সে তো গেছেই, সে তো আর ফিরে আসছে না—এবার এলেও তাকে নিয়ে তুমি আর ঘর করতে যাচ্ছ না। তাহলে যে আছে তাকে নিয়ে তোমার ঘর করতে বাধা কি।·· বিয়ের আগে অবশ্য দু'জনে এভাবে থাকাটা ঠিক না, স্বাহাকে আপাতত আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও, তার পর একেবারে বিয়ে করে ওকে ঘরে এনে তোলো তুমি—কেউ বা কাটতে পারবে না।

বিনয়কেষ্ট ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক, তার পর হঠাৎই সচেতন হয়ে ব্যাকুল উদ্বেগে বলে উঠল, না না না·· ও আর থাক্। স্বাহা রাজি হলে আপনি বরং তাকে আপনার কাছে নিয়ে যান আপাতত।

বিয়ের নামে কাউকে এমন ঘাবড়ে যেতে সূর্য হালদার আর বড় দেখেননি। কি বলবেন ভেবে পেলেন না হঠাৎ।

বলার অবকাশও হল না।

স্বাহা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসের মত। মুখখানা ঝকমক করছে। বলল, দাদু এতদিনে একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছে, তোমার আত্মত্যাগ দেখে আনন্দে কান্না পাচ্ছে। পরামর্শ দিয়েছে যখন, চটপট সেই ব্যবস্থাটা করে ফেলো দেখি—তবে দিদিমার কোলে-টোলে গিয়ে জুড়োতে পারব না, যে-কটা দিন বেঁচে আছ, ওই কোল তুমিই জুড়ে থাকো।

সূর্য হালদার এই মূর্তি দেখবেন ভাবেননি। মেয়ে নয়তো, যেন ডগডগে ছুরির ফলা একখানা। তাঁর হাসিভরা দুই চোখ স্বাহার সর্বাঙ্গে বিচরণ করে নিল একপ্রস্থ। তারপর একটু সরে চৌকি চাপড়ে বললেন, আয় বোস্ এখানে—।

এই সামনেই! মুখরা মেয়ের মত ইঙ্গিতে বিনয়কেষ্টকে দেখিয়ে হেসে উঠল স্বাহা।—মূর্তি দেখছ না, চোখ দেখছ না, চোখ উল্টে দিলে সামলাবে কে! তার চেয়ে চোখে যেটুকু হয় তাইতেই খুশি থাকো।

নাতনীর রসিকতায় সূর্য হালদার হেসে উঠলেন হা-হা করে। বললেন, বিনয়কেষ্টর ভাগ্যি দেখে আমার হিংসে হচ্ছে রে ছুঁড়ী! তা দিদিমার কাছে যাবি না কেন, দু'দিনও আর না দেখে থাকতে পারবি না?

স্বাহা তক্ষুনি জবাব দিল, কি করে পারব বলো, এখানে গরম নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ঘরের চালা জ্বলবে, আর ওদিকে দিদিমার চোখে বন্যা নামবে—অত ঝুঁকি নেবে কে!

এমন প্রগলভ পরিহাসের মধ্যে বসেও বিনয়কেষ্টর গোটা মুখে যেন এক বিন্দু

রক্ত নেই। ভয়ে দুশ্চিন্তায় পাংশু বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। তার দিকে চোখ পড়তে সূর্য হালদার বললেন, ব্যবস্থা করব কি করে, এ-তো তোকে নিতে চাইছে না।

স্বাহা বলল, জীবনভোর নিজে ভেক ধরেও ভেক চিনলে না দাদু, এই বুদ্ধি তোমার! এর নাম সামাজিক শোক। ও তোমাকে দেখতে হবে না, যা করার তাড়াতাড়ি করো, আজ হলে আমি কাল করতে রাজি নই।

অস্পষ্ট নির্জীব মুখে তবু বাধা দিতে চেষ্টা করল বিনয়কেষ্ট।

সে শুধু চেষ্টাই।

সূর্য হালদার চলে যেতে স্বাহা বিনয়কেষ্টর মুখোমুখি সামনে এসে দাঁড়ালো। বিনয়কেষ্ট বিড়বিড় করে বলল, এ-সব তুই কি বলে দিলি!

স্বাহা চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—যা বললাম নিজের কানেই তো শুনলে।···চোখ চেয়ে দেখোই না, লোকসান কি তোমার খুবই বেশি হয়েছে?

বিনয়কেষ্ট ফিরে তাকালো।

স্বাহা হাসছে। হাসতে হাসতেই ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

সেই হাসি দেখে বিনয়কেষ্ট আরো আড়ষ্ট।

বাইরে এসেও হাসতে চেষ্টা করছিল স্বাহা। কিন্তু হাসিটা তেমন আর আসছে না। সকালে নন্দ চলে যাবার পর যে সঙ্কল্প করেছিল সূর্য হালদার আসাতে সেটাই বড় সহজে সম্পন্ন হয়ে গেল। সব ভাবনা-চিন্তা, সব কিছুই ঝেড়ে ফেলার কথা এখন। যা সে করল এমন কিছু সহজ নয় সেটা। ও বলেই করল। ও বলেই করতে পারল। আর পিছন ফিরে তাকানো নয় এখন। আর মোহ নয়। মোহমুক্তি। মোহমুক্তির আনন্দ আস্বাদনের মুহূর্ত এটা।

তবু কি একটা অনুভূতি যেন একটুকরো শিকলের মত আটকে আছে। নড়তে চড়তে লাগে।

কিন্তু বিনয়কেষ্টর বিবর্ণ মুখ দেখে ক্রমেই অবাক হচ্ছে স্বাহা। তাকে যেন ধরে ফাঁসি দিচ্ছে কেউ। আত্মরক্ষার তাগিদে সে যেন দিবারাত্র এক অপরিসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছে।

নিজেকে মুকুরে দেখে রেখেছে স্বাহা। আজ নয়, অনেক—অনেকদিন আগেই সেই দেখা সারা। শিরীষ আর অশোক পলাশের মত সেও যখন সর্বাঙ্গে এক অভিনব আবির্ভাবের শিহরণ উপলব্ধি করেছিল—সেই দিন। তারপর দিনে দিনে

দেখেছে নিজেকে। নিজের চোখে দেখেছে, নন্দর চোখ দিয়ে দেখেছে—মণ্টি কেষ্টর চোখ দিয়ে দেখেছে। তার জোরটা কোথায় দেখে রেখেছে। সেই জোরের ওপর অসীম আস্থাও ছিল।

আস্থা আজও আছে। বিনয়কেষ্টর মত একজনকে লোভের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, সেই সংশয় একদিনও দেখা দেয়নি। কিন্তু লোকটার এত ভয়, আর এই বিবর্ণ নিষ্প্রাণতা দেখে স্বাহা মাঝে মাঝে অবাক হয় বটে।

বিনয়কেষ্ট এখনো মাথা নাড়ে, বলে না না—এ থাক্, এ ঠিক হবে না।

স্বাহার সেদিন রাগই হল একটু। —না না করছ কেন? আমার কারণে না রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে স্থিতি তোমার? দিনরাত গুন্‌গুন্ করতে কানের কাছে—সব রস শুকিয়ে গেল?

বিনয়কেষ্ট জবাব দিতে পারে না। দুই চোখে দুর্বোধ্য হতাশা শুধু। আতঙ্কগ্রস্ত বেদনার ছায়া।

অতএব, সহৃদয় চিকিৎসক যেমন রোগীর রোগের সঙ্গে যোঝে, স্বাহাও তেমনি লোভের জাল ফেলে বিষাদ-সন্তাপের গহ্বর থেকে বিনয়কেষ্টকে টেনে তুলল বলা যেতে পারে। যত সহজে সেটা সম্ভব হবে ভেবেছিল ততো সহজে হল না বটে, কিন্তু হল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এক-একসময় অবাক লাগত স্বাহার। যে দিদি দিবারাত্র এত নিষ্ঠুর গঞ্জনা দিত, তারই জন্য এমন দুর্বহ শোক খুব স্বাভাবিক মনে হত না। বিনয়কেষ্টর মুখে হাসি ছিল না, গলায় গান ছিল না। স্বাহা দু'জনের হাসি একা হেসেছে, দু'জনের গান একা গেয়েছে। তাকে বোবার মত শুয়ে বসে থাকতে দেখলে ঘটা করে গোটাকতক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুন্‌গুনিয়ে উঠেছে···

'আঙিনার মাঝে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

পরমুহূর্তেই হয়ত আবার হাসিতে উছলে উঠেছে, 'না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো···'

বিনয়কেষ্টর সামনেই কেশবিন্যাস করত, আর আয়নায় মানুষটাকে দেখত চেয়ে চেয়ে। কতক্ষণ আর সঙ্কোচে বিষণ্ণতায় ডুবে থাকবে। লোকটা একসময় উসখুস করছে টের পেত। আয়নার ভিতর দিয়েই দৃষ্টি বিনিময় হত। স্বাহা হেসে ফেলত, ভ্রূকুটি করে ঘুরেও দাঁড়াতো। কণ্ঠে সুরও উপছে উঠত সেই সঙ্গে:

এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতিকুল।

বিনয়কেষ্টর মুখের নির্বাক যাতনার ছাপটা মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখের বোবা ত্রাসের

ছায়াটা সরে যাচ্ছে। সেই মুখে সেই চোখে লোভের চমক জাগছে, প্রত্যাশার আলো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

সেদিন বেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল স্বাহা। নন্দ এসেছিল দুপুরে। বিনয়কেষ্ট ঘরে ছিল না। দরজা খোলা ছিল। দূর থেকে নন্দকে আসতে দেখে স্বাহা গম্ভীর মুখে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল সে আসছে। দেখছিল সে হাসছে। সেই পদক্ষেপে অসহিষ্ণুতা দেখছিল। আর সেই হাসির তলায় ক্ষোভ দেখছিল। স্বাহা ঘরণী হবে বিনয়কেষ্টর সেই গুজবটাই পদদলিত করতে করতে আসছে যেন। আর হেসে বোঝাতে চাইছে, এমন সব অসম্ভব গুজবে সে বিশ্বাস করে না।

বেড়া-ঘেরা আঙিনায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। রাগে অপমানে নন্দর সমস্ত মুখ কালো। সজোরে দরজায় আঘাত করল গোটা কতক।—স্বাহা দরজা খোল্, কথা আছে।

জবাব পেল না।

নন্দ শাসালো, দরজা খুলবি তো খোল্, নয়তো দরজা ভেঙে ফেলব।

এবারে জবাব পেল, ভেঙে দেখো কাঁধের ওপর মাথাটা থাকে কি না, বঁটি শানিয়ে রেখেছি।

তুই দরজা খুলবি কি না?

না।

খুলবি না?

না।

দরজা খুলেছে ঘণ্টা দুই বাদে, বিনয়কেষ্ট ফিরে আসতে।

মাথাটা কেমন গরম লাগছিল স্বাহার। বিকেল না পড়তেই চুল ভিজিয়ে চান করে এসেছে। মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল, কিন্তু আয়নায় কাউকে দেখছিল না। নিজেকেও না, অদূরের চৌকিতে বিনয়কেষ্টকেও না। নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে পিছনের মানুষটা তাকেই দেখছে তাও খেয়াল করেনি।

সমস্ত তন্ময়তা কেটে গেল হঠাৎ। চুলের বোঝার মধ্যে হাতের চিরুনি আটকে গেল। অনেকদিন বাদে বিনয়কেষ্টর রসাবিষ্ট পরিচিত গলায় গান উপচে উঠেছে আবার। আগের মতই প্রায়।

থির বিজুরী, বরণ গৌরী
পেখনু ঘাটের মূলে।
কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব-মল্লিকার মালে।

স্বাহা ঘুরে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্বাহার হেসে ওঠার কথা। ডগমগিয়ে ওঠার কথা। এইটুকুই চেয়েছিল। লোকটাকে ঠিক আগের মত করে তুলতে চাইছিল। তাই করেছে, তাই হয়েছে। কিন্তু 'থির বিজুরী'র মতই স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। তবে হেসেছিল বটে। একটু পরেই হেসেছিল। উচ্ছল প্রগলভ হাসি নয়। আয়ত চোখের তারায় আর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ছিল। এটুকুও না থাকলে স্বাহার এ-ক'দিনের নিজের ব্যবহারের যে কোন অর্থ হয় না। মোহগ্রস্ত আঁধার থেকে আলোয় টেনেছে লোকটাকে—হাসবে না? সাড় দেবে না?

কিন্তু বিনয়কেষ্টর মুগ্ধ হবার চোখ তখন। অতটা মুগ্ধ না হলে হয়ত তার মনে হত, স্বাহার এ হাসিটা নতুন। স্বাহা ঠিক এ রকম হাসে না।

পরের প্রথম তিথিতেই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। ব্যবস্থাই বা কি, ঘটা কিছু নেই। দু'হাত মিলবে বলে যে-টুকু দরকার সে-টুকুই শুধু। সূর্য হালদারকে কন্যা সম্প্রদান করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। এই বয়সে উপোসের ধকল সয় না। তবে বিধিবদ্ধভাবে অন্যের দ্বারা তিনিই সম্প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বিয়ের রাতেই একটা তুচ্ছ খবর স্বাহার কানে এসেছিল। এখানকার বাস তুলে দিয়ে সেই দিনই দুপুরের গাড়িতে চারু বোষ্টুমীর ছেলে নন্দ কলকাতায় চলে গেল। সেইখানেই জ্যোতিষীর পসার খুলে বসবে, তার ভবিতব্য আপাতত তাকে সেইখানেই টেনেছে।

গাঁয়ের কত লোক যায়। চারু বোষ্টুমীর ছেলে নন্দও গেছে।

বিয়ের মন্ত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছে স্বাহা।

সাত

দূরে গেলে ব্যবধান বাড়ে বটে, কিন্তু লোকবিশেষে আর পরিস্থিতি বিশেষে ব্যবধান ঘোচেও আবার।

নইলে কেন্দু অন্যথায় কেদার দারোগার সঙ্গে এক বছর বাদে এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে এতকালের বৈরীভাবটা এত সহজে দু'জনেই বিস্মৃত হল কেমন করে? অবশ্য পরিস্থিতিটা নন্দর অনুকূল ছিল। কেদার কলকাতায় এসেছিল এক সাক্ষির ব্যাপারে। সরকারী সনাক্তকরণের কাজে তলব পড়েছিল তার। সে কাজ একদিনেই মিটে গেছে। সরকারী খরচায় কলকাতা বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও এরপর দিন দুই থেকে দেখেশুনে যাবে না এমন নির্লিপ্ত লোক সে নয়। দারোগা হলেও চুনিগাঁয়ের দারোগা, কলকাতা তার কাছে বলতে গেলে আনকোরা বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের ঘোরেই পথ চলছিল সে।

আর নন্দ চলেছিল ঝকঝকে শৌখিন জুড়িগাড়ি চেপে। ঘোড়া সইস আর গাড়ি দেখলেই বোঝা যায় কোন বড় লোকের সম্পত্তি। বড় লোকের কোন গোলোযোগের মুশকিল-আসান করে দিতেই গিয়েছিল নন্দ। তাদের গাড়িতে গেছে, আর তাদের গাড়ি চেপেই ফিরছে। এ-ধরনের জুড়িগাড়ি তখন পথচারীরা সম্ভ্রমের চোখে ফিরে ফিরে দেখত, তার আরোহীকেও দেখত। সামনের কয়েকটা গরুর গাড়ির পাশ কাটাতে না পেরে গাড়িটা থেমেছিল। আর কেদার দারোগা তখন নিজের পদমর্যাদা ভুলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই জুড়িগাড়ির আরোহীকে দেখছিল।

প্রচারের কাজটা বুদ্ধিমানের মত করতে পারলে গাঁয়ের থেকে কলকাতাতেই দৈব-গণনার পসার বেশি, সেটা নন্দ যথার্থ অনুমান করেছিল। এখানে পয়সাও যেমন, পায়ে পায়ে জটিলতাও তেমনি। তা'বলে নন্দর খুব যে অবস্থা ফিরে গেছে এই এক বছরের মধ্যে তা নয়। এ ধরনের পেশায় চালাক-চতুর লোক হলে দু'পাঁচজন অবস্থাপন্ন খদ্দের জুটে এক-রকম যায়ই। নন্দরও জুটেছে। প্রথম প্রথম তারই মত আধা-নিঃসম্বল লোক নিয়ে কারবার করতে হত। কিন্তু নিঃসম্বল লোকেরও দুই একজন বিত্তবানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না এমন কোন কথা নেই। বরং থাকেই বেশিরভাগ। এদের মুগ্ধ করতে পারলে দুই একজন শাঁসালো মক্কেল এরাই জুটিয়ে দেয়। এমন কি নিজের অগোচরে সেই মক্কেলদের ঘরের-খবর বাইরের খবরও এরাই সরবরাহ করে।

নন্দ না?

অবিশ্বাস্ত লাগছিল কেদারের। নন্দর গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, গলায় জরির চাদর, কপালে মস্ত একটা তেল-সি ছুরের টিপ—আর এই জুড়িগাড়ি!

কেদারকে দেখে নন্দও অবাক তেমনি। এতকালের অভ্যাসে প্রথমেই বিরূপতার ছায়া পড়েছিল একটা। যত বড় জ্যোতিষীরই ভড়ংচড়ং দেখাক, বয়সে সে কেদারের থেকেও ছ'তিন বছরের ছোট। কিন্তু ওদিকে আবার পেশার দায়ে মুখের দিকে চেয়ে মন দেখার অভ্যাসটাও হয়ে গেছে তেমনি। কেদারের চোখে মুখে সম্ভ্রমসূচক বিমূঢ়তা লক্ষ্য করায় সঙ্গে সঙ্গে সহজাত অনুভূতিটা সামলে নিয়ে অন্তরঙ্গ বিস্ময় জ্ঞাপন করল সে-ও। কেতুদা তুমি! এই কচোয়ান, রোখো! রোখো!

উৎফুল্ল আপ্যায়নে কেদারকে জুড়িগাড়িতে তুলে নিল নন্দ। —কেতুদা তুমি এখানে··· কি আশ্চর্য!

কেতু এখানে কেন শুনল। কিন্তু সমাচার শোনার আগ্রহটা কেদারেরই বেশি। এই জুড়িগাড়ি আর জুড়িগাড়ির এই নন্দ তার চোখ ধাঁধিয়েছে। নন্দ সেটুকু বেশ উপলব্ধি করতে পারে। কাজেই আবাল্য চক্ষুশূল কেদার দারোগাকে সাদরে সে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কর্মব্যস্ততার যে সমাচার শোনালো তা ক্ষমতাগর্বী কেদারেরও প্রায় ঈর্ষার কারণ। কেদার একবর্ণও অবিশ্বাস করেনি। জুড়িগাড়ি পাঠিয়ে মক্কেল বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় তাকে, এ আর সে অবিশ্বাস করবে কি করে। নন্দ আদর অভ্যর্থনা আর জলযোগ-ব্যবস্থারও কোনো ত্রুটি রাখল না।

এরপর কেদারের মুখ থেকেই চুনিগাঁয়ের গোটাকতক খবর শুনেছে নন্দ।

মন্টি আর বাসনার কথা শুনেছে। কেদার বলেছে, খুব মজা লুটছে মন্টিদা, ভারি ফুর্তিতে আছে। মাস ছয় আগে একবার দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, কেদারকে একেবারে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। বাসনা তাকে রেঁধে খাইয়েছিল। মেয়েটা আর আগের মত গম্ভীরটম্ভীর নয় একটুও, যেমন হাসে তেমনি কথা বলে। গান গায়।

বাসনাকে ছেড়ে সহজেই স্বাহার প্রসঙ্গে এসে গেছে কেদার। বলেছে, বাসনা আর কি, দেখতে হয়েছে ওই ছোটটা—দেখিস নি তো শিগ্‌গীর! উঃ!

সেই রূপ স্মরণ-মাত্রে কেদারের দুই চোখে পিচ্ছিল কামনা উছলে উঠেছে। বলেছে, থান পরে তো এখন, কোরা থান—সেই থানের রঙ পর্যন্ত কালচে দেখায় অমন সোনা-দাগানো রঙের আঁচে—

থান পরে! নন্দ বিমূঢ়—স্বাহা থান পরে কেন?

স্বাহা থান পরে কেন সেই খবরটাই যে নন্দ জানে না এখনো, কেতুর খেয়াল ছিল না। জানার কথাও নয় বটে। অতএব এবারে খবরের মতই একটা খবর

পরিবেশনের জন্ম আঁটসাঁট হয়ে বসল সে।—তুই জানিস না! স্বাহা যে বিধবা রে—সেও সাত আট মাস হয়ে গেল। কেষ্টদা করেই তো পিছনের সেই বটগাছটায় ঝুলে খতম—আমিই তো তদন্তে গেছলাম।

নন্দ স্তব্ধ নির্বাক। ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না যেন। স্বাহা বিধবা, কেষ্টদা বটগাছে ঝুলে খতম…

বিনয়কেষ্টর আত্মহত্যার নিগূঢ় কারণটাও অতঃপর সোৎসাহে ব্যক্ত করেছে কেদার।—আত্মহত্যা না করে করবে কি, অমন একটা গন্‌গনে মেয়ে মুঠোর মধ্যে অথচ নিজের ওই অবস্থা, শেষের দিকে তো মাথায় গণ্ডগোলই দেখা গেছল, কারো আর জানতে বাকি ছিল না কিছু—কত ডাক্তার কত কবরেজের কাছে যে হন্তে হয়ে ঘুরেছে ঠিক নেই।

তবু নন্দকে হাঁদারামের মত হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে সানন্দে আরো একটু ঘন হয়ে বসেছে কেদার।—বুঝলি না? কেষ্টদার যে গোড়া থেকেই অসুখ ছিল রে, সেই বাসনাকে বিয়ে করার আগে থেকেই—আমি মন্টিদার মুখে শুনেছি। রসের গান করত তো, অমন গো-বেচারী ভালোমানুষটির মত থাকলে হবে কি—প্রথম বয়সে রসের জায়গায়ও ঘুরে মরেছে নিশ্চয়। তার ওপর টোটকা-টোটকি করতে গিয়ে আরো মরেছে—

অনেকক্ষণ বোবা মূর্তির মত বসে থেকে নন্দ জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে আবার বিয়ে করতে গেল কেন?

লোভ, লোভ—লোভ ছাড়া আর কি! কেদারের বিজ্ঞ-জনোচিত মন্তব্য, চোখের লোভ যাবে কোথায়, ভেবেছিল রসের গান গেয়েই ভাবে-ভাবে ভবের বাজী ভোর করে দেবে—

খবর? আরো খবর আছে বই কি। রয়েসয়ে সব খবরই দিয়েছে কেদার। স্বাহাকে সূর্য হালদার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন, দিদিমার আশ্রয়ে রেখেছেন। আ-হা, নাতনীর দুঃখে বুড়োর বুক ফেটে যায়। অশ্লীল একটা কটূক্তি করে সখেদে ফোঁস করে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলেছে সে, বুড়োটার বরাত বটে, চাঁদ-ধরা বরাত। গলা খাটো করে বলেছে, বাবার মুখে শুনেছি স্বাহার মা-টার ওপরেও নাকি অমনি চোখ ছিল বুড়োটার—

নন্দ আর কিছু শুনছিল না, আর কিছু তার কানে যাচ্ছিল না। তার এ ভাবান্তর কেদার একেবারে লক্ষ্য করেনি তা নয়। মনে মনে হেসেছে সে। কার দিকে যে চোখ যায়নি বুড়োর তাও জানে না—ওর মা চারু বোষ্টুমীকেই কি বাতিল করেছিল বুড়ো। তাই নিয়ে সে আর মন্টি নিজেদের মধ্যে কম রসালাপ

করেনি। আপাতত ছোঁড়াটা স্বাহার রূপের আঁচটাই বিভোর হয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে মনে হল তার। বসে সেই আঁচে আরো খানিকক্ষণ ধরে ইন্ধন যোগালে সে। তারপর একসময় বিদায় নিয়ে গেল।

নন্দ স্বাহার কথাই ভাবছিল বটে, কিন্তু কি যে ভাবছিল নিজেও জানে না। শুধু স্বাহা নয়, অসংলগ্ন কত কিছুই চোখের সামনে ভিড় করে আসছে তার।···কেষ্টদার অসুখ ছিল, কেষ্টদা আত্মহত্যা করেছে। বাসনার মেজাজ কেন এত বিগড়ে থাকত সর্বদা, কেন এত হাত দেখাতো—কেন ভবিষ্যত জানার জন্যে এত আগ্রহ তার, আজ সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে। মন্টির সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল যখন তখনো ভালো করে বোঝেনি। কোন্ ভবিষ্যত বেছে নেবে বাসনার মনে মনে সেটা ঠিকই ছিল। তারই ফলাফল ভালো করে জেনে নেবার আর বুঝে নেবার জন্যে অত আকুতি দেখেছিল তার!

যাবার আগে এই জন্যেই বোনের ব্যবস্থা একরকম করেই গিয়েছিল সে। তাকে লোভ দেখিয়েছিল, বৈষ্ণবমতে স্বাহাকে সে নিতে পারে এই আশ্বাস দিয়েছিল। সে সরে যাবার পর এই পরিণতিটাই একমাত্র সম্ভব ভেবেছিল।·· স্বাহা সেই বিনয়কেষ্টর হাতেই পড়বে আবার, ভাবেনি। ভাবতে পারার কথা নয় তার।

কিন্তু স্বাহা বিধবা শুনে নন্দর নিজের দুঃখ হয়েছে কি হয়নি, একটুও বুঝতে পারছিল না সে। খবরটা তাকে বোবা করে দিয়েছে শুধু। তার সব চেতনা আর সব অনুভূতি লুপ্ত করে দিয়েছে।··স্বাহা বিধবা, স্বাহা থান পরে, স্বাহাকে সূর্য হালদার নিয়ে গেছেন। এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারছে না নন্দ।

ভরা দুপুর তখন।

ঘাটে বসে স্বাহা একরাশ বাসন মাজছিল। সূর্য হালদারের অন্দরের ঘাট এটা। ঘাটের তিন দিকে আটিশ্বরী আর বিষকাটারির ঘন ঝোপ। ওপাশে আর একটা পুরুষ-ঘাটও আছে। স্বাহা বাসন মাজছে বটে, কিন্তু হাত তেমন চলছে না। একখানা দুখানা করে মাজছে, হাত থেমে যাচ্ছে, বসে থাকছে। অলস মন্থর। এই দুপুর যেন বিষাদে ভরা। এই দুপুরটা নয় শুধু, রোজকার সব ক'টা দুপুরই। স্বাহা বাসন মাজে। মাঝে মাঝে দুই একটা নিঃসঙ্গ কাকের ডাক আরো যেন রিক্ততা বাড়ায়। কিন্তু রোজই এই নিরিবিলি নির্জন মধ্যাহ্নের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে স্বাহা। কখন দুপুর হবে, ঘাটে এসে বসবে। এই রিক্ত দুপুরটা সমব্যথি ওর।

দিবারাত্র আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয় না স্বাহার। একা ওকে দিয়েই তিনটে ঝি-রাঁধুনীর কাজ করিয়ে নেন হালদার দিদিমা। সেই জন্ম দিদিমার প্রতি স্বাহা কৃতজ্ঞ বরং। নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ সে চায়ও না। সূর্য হালদার ওকে যখন নিয়ে এসেছেন, ওর তখন ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ছিল না কিছু। হাত ধরে তাকে নিয়ে এসেছেন, ও এসেছে। দিদিমাটি সূর্য হালদারের মত নন। পঞ্চান্ন-পঁচাত্তরের বার্ধক্য তাঁর। রসকষের ধার ধারেন না। উঠতে বসতে স্বাহাকে গালমন্দ করেন, গঞ্জনা দেন। কিন্তু উপকারও কিছু করেন। স্বাহাকে চোখে চোখে রাখেন—সেই উপকার। রাতে নিজের ঘরের মেঝেতে পায়ের কাছটিতে শুতে দেন ওকে, সেই উপকার। সূর্য হালদারের বা অন্য কারো সেখানে পদার্পণও নিষেধ। স্বাহা গঞ্জনা গায়ে মাখে না এখন, উপকারটুকুই স্মরণ করে।

এরই মধ্যে ফাঁক খুঁজে সূর্য হালদার সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন স্বাহাকে। বুড়ীটা এমন দজ্জাল হয়ে উঠবে ভাবেননি। তাঁর আশা ছিল, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে মেয়েটার শোক তাপ জুড়োবে, বাড়িতেই একটু-আধটু গান-বাজনা শুনতে পাবেন—সর্বদাই চোখের দেখা দেখতে পাবেন। তেমন সুযোগ সুবিধে পেলে গায়ে পিঠে হাত বোলাবেন একটু, আদর করবেন। এই বয়সে এটুকুই কাম্য। কিন্তু বুড়ীটা সব আশায় ছাই ঢেলেছে একেবারে। ছেলে ছেলের বউ নাতি নাতনীর ভরা-ভরতি সংসারে মেয়েটাকে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না আর। খুঁজতে গেলে বুড়ীর রসনার ঝাঁঝে পালাবার পথ খুঁজতে হয়, তারপর বুড়ীটাকে গলা টিপে শেষ করে দেবার বাসনা জাগে।

ভেবে চিন্তে অন্য সমাধানেরও চেষ্টা করেছিলেন সূর্য হালদার। স্বাহাকে বলেছেন, এখানে তোর বড় কষ্ট হচ্ছে রে নাতনী! মাগীটা—

রাগ সামলে প্রস্তাব করেছেন, তুই বরং তোর ঘরেই ফিরে যা, আমি বুড়ো শক্ত সমর্থ একজন লেঠেল চাকর রেখে দেব'খন—মেয়ের মত আগলাবে তোকে, ভালো থাকবি।

স্বাহা জবাব দেয়নি, পারতে জবাব দেয়ও না কোনো কথার। পরামর্শ শুনে বোবা ত্রাসে সমুখ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে সে। এ আশ্রয় ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে পারে না। দিদিমার আশ্রয় যে এত নিরাপদ আশ্রয় আগে কল্পনাও করেনি।

সূর্য হালদার বুড়ীকে এই পরামর্শই দিয়েছেন অন্য-ভাবে। বলেছেন, পরের মেয়ে নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কি, শোকের সময় দুদিনের জন্তে এনেছিলাম—এখন নিজের ঘরে গিয়ে থাকুক গে। আমরা চোখ বুজলে ওই মেয়ে নিয়ে শেষে একটা হাঙ্গামা হবে—

কিন্তু বুড়ী হাড়ে হাড়ে চেনেন পরামর্শদাতাটিকে। চোখ বোজার পর কি হবে সেই ভাবনা নেই তাঁর। ভাবনা চোখ বোজার আগেই। পরামর্শ দিতে গিয়ে সূর্য হালদার স্বাহার আশ্রয়টা আরো একটু পাকা করেছেন।

স্বাহা!

স্বাহা চমকে ফিরে তাকালো, হাতের ধাক্কায় একটা বাসন ঠনঠনিয়ে তিন সিঁড়ি গড়িয়ে গেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। শ্লথ থান-বসনের আঁচলটা নিজের অগোচরে ভালো করে গায়ে জড়ালো।

তুমি!

চোরের মত এদিক ওদিক চেয়ে নন্দ আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল। নির্নিমেষে দেখল খানিক। কেদার মিথ্যে বলেনি, পরনের শাড়িটায় পর্যন্ত যেন গায়ের রঙ লেগে আগুন ধরবে। আর এই নারী-তনু শাসনে রাখা ওই মোটা থানের সাধ্যের বাইরে যেন। বলল, হ্যাঁ আমি—বড় লোকের বাড়িতে থাকিস বলে চিনতেও কষ্ট হচ্ছে নাকি?

অনেক দিন বাদে স্বাহার চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠল আবার। দেখছে চুপচাপ।

সখ মিটেছে তো? নন্দর গলায় চাপা শ্লেষ।

মিটেছে। তুমি চোরের মত এখানে কেন?

তুই, কেমন রাণীর হালে আছিস দেখতে এলাম, সখ মিটে থাকে তো আমার সঙ্গে কলকাতায় চল্, যা হয়েছে—হয়েছে।

স্বাহা অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি দূর হও চোখের সমুখ থেকে।

ঝুঁকে বাসন ক'টা তুলতে যেতেই নন্দ শক্ত মুঠিতে খপ করে একখানা হাত ধরে ফেলল তার।—আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, তুই যাবি কি না বল্—

স্বাহার সমস্ত মুখ ঝলসে উঠল সেই মুহূর্তে। তার জীবনে যত ক্ষোভ যত হাহাকার, তার সবকিছুর জন্যে যে এই লোকটাই দায়ী। ঘৃণা আর বিদ্বেষভরা দুই চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একটু। নিঃশব্দে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ছাড়বে না লোক ডাকব?

লোক ডাকার ভয়ে নয়, ওর দিকে চেয়েই নন্দর হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল।

স্বাহা বলল, আবার এখানে এলে প্রাণের মায়া ছেড়ে এসো।

বাসন ঘাটে ফেলে রেখেই স্বাহা দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে। নন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলতে লাগল। নন্দ পতঙ্গ। আগুনে পুড়তে চায়। যে আগুনে পুড়তে চায়, একবছর বাদে সেই আগুনের বড় কাছে এসে গেছে। কিন্তু ওই আগুনের

চারিদিক ঘেরা তপ্ত-আবরণের মত তপ্ত বিষ সর্বদা। পতঙ্গের মত নন্দ তাতে মাথা খুঁড়ছে আর ধিকিধিকি পুড়ছে। সেই দাহ আগুনেরও বটে আবার নন্দর নিজের বুকেরও বটে।

আবারও এসেছে সে। প্রাণের মায়াও ছাড়তে পারেনি একেবারে। অত কাছে আসতে পারেনি। কিন্তু এসেছে। আসছে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। সব সময় আড়ালেও নয়। দৃষ্টি-লেহনে ওকে যেন গ্রাস করতে চায়। নিষ্ঠুর ক্রূরতায় নন্দর অন্তস্তলের তাড়না উদগ্র হতে থাকে। প্রেম নয়, স্নেহ মমতা ভালবাসা নয়, এখন অবশিষ্ট শুধু শ্বাপদের ক্ষুধা, বিদারণ বৃত্তি।

স্বাহা অনেকবার ভেবেছে হালদার দিদিমাকে বলবে অন্দরের ঘাটে বাইরের লোক আসে। বলবে এমন হলে সে ঘাটে যাবে কেমন করে। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি।

হলও না বলা।

নন্দ অন্দরের ঘাটেই নয়, অন্দরমহলেই প্রবেশ করেছে একেবারে। ছেলেবেলায় এখানে আনাগোনা তার ছিলই। পিছনের বাগানে আম জাম পেয়ারা জামরুলের লোভে দস্যুর মতই হানা দিত। সূর্য হালদার কিছু বলতেন না—চারু বোষ্টুমীর ছেলে, তাঁরও কম আদরের নয় তো। কিন্তু হালদার দিদিমা বকুনির চোটে তিন পুরুষের উদ্ধার করতেন।

সেই নন্দর খাতির যত্ন আদর অভ্যর্থনা দেখে স্বাহার দুই চক্ষু স্থির। খাতির যত্নটা সূর্য হালদারের থেকেও হালদারদিদিমা বেশি করলেন। তাঁর সমস্যাটা কি, বা কোন্ দৈব সমাধান তিনি চান—স্বাহার জানার কথা নয়, জানেও না। কিন্তু নন্দ এলেই দিদিমা দোতলায় একেবারে নিজের ঘরে ডেকে নেন তাকে। তাঁর হুকুমে নন্দর জলখাবারের ব্যবস্থা স্বাহাকেই করে দিতে হয়। দিয়ে আড়ালে সরে যায়। দিদিমার সঙ্গে ফিসফিস কথাবার্তা হয় টের পায়। কিন্তু কি কথা স্বাহা জানে না। কোনো দিন নন্দ গভীর মনোযোগে কোষ্ঠি দেখে আর পাঁজি দেখে আর শ্লেটে সব কি আঁকি-বুকি করে, হিসেব করে। দিদিমার হাতে আর গলায় নতুন দুই একটা তাবিজকবচও চোখে পড়েছে স্বাহার।

ভিতরে ভিতরে এক অনাগত দুর্যোগের ইঙ্গিত উপলব্ধি করে স্বাহা। চুনিগাঁয়ে নন্দর সব থেকে বেশি এবং সার্থক প্রচারের কার্যটি করেছে কেহু। কেদার দারোগা। নন্দর ভাগ্যোদয়ের গল্প সে চেনা জানা সকলের কাছেই করেছে। ঝকঝকে জুড়িগাড়ি চেপে মক্কেলের বাড়ি আনাগোনা যে কম কথা নয়, এটা সে দারোগা হয়েও স্বীকার না করে পারে না।—আমাদের নন্দ যে মস্ত জ্যোতিষী হয়ে বসেছে, কলকাতায়

নাম বললে সকলে চেনে, জুড়িগাড়ি ছাড়া এক পা নড়ে না—নিজের চোখে দেখে এলাম!

খবরটা এরপর লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। কেদার দারোগার কথা কম নয়।

গাঁয়ে পা দিয়েই নন্দ টের পেয়েছে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানকার। এই সমাদরের হেতুটা কি বুঝতে একটুও দেরি হয়নি নন্দর। আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেদারের সঙ্গে দেখা করে এসেছে সে। কেদার যোগ্য অভ্যর্থনাই জানিয়েছে তাকে। বাল্যস্মৃতি ভুলে দু'জনেই প্রীতিবদ্ধ তারা।

নন্দ এখনো মাঝে মধ্যে যায় তার ওখানে। ফাঁক পেলে কেদারও আসে এক-আধসময়। তার দু'পাঁচটা দৈব-সমস্যা নন্দই তাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আর দৈব-সমাধানের আশ্বাসও সে-ই দিয়েছে। না এসে যাবে কোথায়।

শুভার্থীজনেরা নন্দকে পরামর্শ দিয়েছে, এখানেই থেকে যাও, নিজের দেশ-গাঁ ছেড়ে আবার কলকাতা কেন! গুণের কদর সর্বত্র, গুণীর আদর সর্বত্র—গুণ থাকলে আবার পসারের ভাবনা! লক্ষ্মী এখানেই সোনা ঢালবে দেখো।

সোনা ঢালার লক্ষণ নন্দ ঠিকই দেখল। আসতে না আসতে পাঁচ ঘরের ডাক আসছে। সেই পাঁচ ঘর পাঁচ গাঁ হতে কতক্ষণ? তাছাড়া কলকাতার থেকেও এখানে সম্ভাব্য মক্কেলের ঘরের কথা জানা আরো সোজা। তুক-তাক সুবচনে এদের বিশ্বাসও বেশি। নন্দ যে তাড়নায় এসেছিল তার সঙ্গে একটা অনুপ্রেরণার যোগ হল। কিন্তু তা বলে এক কথায় পুরোপুরি রাজি হবার মত নির্বোধ নয় সে।

পরামর্শদাতাদের জানালো, এখানে থাকতে তার আপত্তি নেই, নিজের দেশ, নিজের গাঁ--এর কাছে স্বর্গই বা কি। কিন্তু তা বলে কলকাতা একেবারে ছাড়বে কি করে! কলকাতার শরণাগতরা তাকে ছাড়বে কেন, তারা অন্ধকার দেখবে না চোখে! অতএব মাসের মধ্যে হপ্তাখানেক কলকাতায় তাকে থাকতেই হবে।

জ্যোতিষীর এই ঠাটটাই নন্দ বজায় রাখল শেষ পর্যন্ত। মাসে এক-আধবার কলকাতা যায়। কলকাতা থেকে এক-আধখানা চিঠি এলে গাঁয়ের লোক জানতে পারে, কলকাতার ডাকে নন্দ চলল, সেখানে প্রাণের দায়ে কেউ ডাকছে তাকে। নন্দ ফিরে এলে কলকাতার সেই অপরিচিত লোকের প্রাণের দায় উদ্ধার হল কিনা সেই খবরও ছড়ায়। উদ্ধার হয়েছে বইকি, উদ্ধার হবে না মনে হলে কি গাঁ থেকে কলকাতায় ডেকে নিয়ে যায় কেউ কাউকে!

দিনে দিনে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করছে নন্দ।

হালদার-গৃহে এই নন্দর এত খাতির হবে সে আর বেশি কথা কি।

খাতির উত্তরোত্তর বাড়ছিল। খাতির শুধু হালদার দিদিমা করছিলেন না, হালদার মশাইও করছিলেন। গৃহিণীর খাতিরটা যে কারণে, কর্তার সে-কারণে নয়। দৈব গণনা ছাড়াও নন্দ টোটকা ওষুধে হালদার দিদিমার গোটাকতক পুরনো শারীরিক ক্লেশের কিছুটা উপশম ঘটাতে পেরেছে। এ জন্যে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে শহরের একাধিক ভালো কবিরাজের কাছে ধরনা দিতে হয়েছে তাকে। তাদের দেওয়া ওষুধ দৈব ওষুধ বলে চালিয়েছে। ওষুধের গুণাবলীর ব্যাখ্যা শুনেই হালদার দিদিমা মুগ্ধ—ফলে সেই অন্ধ বিশ্বাসের রসায়নেও ওষুধের কাজ হয়েছে খানিকটা।

তারপর দিদিমার আর এক খেদ, পোড়া চোখে ঘুম নেই। সেই খেদও নন্দ কিছুটা ঘুচিয়েছে। ওষুধে কি মেশালে ঘুম হতে পারে নন্দর সেটা ভালোই জানা আছে। কিন্তু দিদিমার বেশি ঘুম হোক সেটা সে চায় না। হালদারমশাইয়ের কথা ভেবেই দিদিমাকে সে সজাগ রাখতে চায়। তাই এ ওষুধ দেবার সময় বিশেষ করে সতর্ক করে দিয়েছে, দিবা-যামের ওষুধ এটা, দ্বিপ্রহরের ওধারে খেতে নেই—খেলে বিপরীত ফল।

বিপরীত ফলেব ভয়ে দ্বিপ্রহরের আগেই ওষুধ সেবন করেন দিদিমা। করে প্রথমে খানিক ঝিমোন, তারপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু এ ওষুধের খবরটা বাড়ির আর দ্বিতীয় কেউ জানে না। নন্দ বলে দিয়েছে, গোপনীয় ওষুধ, জানলে ফলের তারতম্য হতে পারে।

কিন্তু স্বাহা জানে। কারণ দিদিমাকে দিনে ঘুমুতে দেখে সে।

অনেক কিছুই জানছে স্বাহা, অনেক কিছুই দেখছে। তার মধ্যেও নীরব নিথর প্রস্তুতি চলেছে একটা। আবারও কিছু একটা বিপর্যয়ের আভাস পাচ্ছে। কোন্ পথ ধরে কেমন করে আসবে সেটা জানে না। কিন্তু আসবেই জানে। না এলে যে অদৃষ্টকারের এত চক্রান্ত সব ব্যর্থ। স্বাহা মুকুরে নিজের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে এখনো অনেক বাকি, দুপুরে ঘাটের নিস্তরঙ্গ কালো জলে নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারে আরো অনেক অনেক বড় দুর্যোগ থিতিয়ে আছে কোথাও।

ভিতরে ভিতরে সেটাই প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছে স্বাহার। স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে আর শক্তি সংগ্রহ করছে। কিন্তু তবু আচ্ছন্নভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না কিছুতে। দিদিমার এ আশ্রয় আর ক'দিনের···দিদিমা চোখ বুজলে কি হবে তাও ভেবেছে। ভেবে যখন পথ দেখেনি, দীঘির কালো জলই দেখেছে চেয়ে চেয়ে। ভাবতে চেষ্টা করেছে, আশ্রয় তো আছেই। কিন্তু সেটা চেষ্টাই শুধু। কেবলই মনে হয়েছে এমন অনাড়ম্বর নিষ্পত্তি তার কপালের লিখন নয়। এটা সাময়িক আচ্ছন্নতা

শুধু—এ কেটে যাবে। যাবেই। তারপর স্বর্গে অথবা নরকে এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে তাকে। মাঝামাঝি আর ঠাঁই নেই।

অবশ্য সূর্য হালদারের অবাঞ্ছিত সান্নিধ্য থেকে নন্দই তাকে আরো কিছুটা অব্যাহতি দিতে পেরেছে। সেটা স্বাহা জানেও না। ওই বৃদ্ধকে তার ভয় করার কিছু নেই। তবু সামনে এসে বসলেই অস্বস্তি লাগে, চাউনিটা ক্লেদাক্ত স্পর্শের মত মনে হয়। সেই বসাটা আর চাওয়াটা প্রায় ঘুচিয়ে এনেছে নন্দ। দিদিমাকে খুব গোপনে খুব সন্তর্পণে সতর্ক করে দিয়েছে। আর সাবধান করে দিয়েছে, সে-যে বলেছে কিছু এ-যেন হালদারমশাই একটু আভাসও না পান। পেলে অকল্যাণ হবে, অমঙ্গল হবে, অঘটন হবে। শুধু হালদারমশাইকে যেন চোখে চোখে রাখেন দিদিমা, স্বাহার ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেন।

দিদিমার কাছে এমন দূরদর্শী দৈবজ্ঞ আর কে আছে? ঘাটের মড়ার রসের খবর তিনি কি আর রাখেন না? নন্দর কথা শুনেই আর একপ্রস্থ বিষ ঝেড়ে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু অমঙ্গল আর অকল্যাণের ভয়েও যে গায়ে কাঁটা দেয় আবার।

অতএব দিদিমা শুধু চোখই রাখেন।

এদিকে হালদার মশাইয়ের কাছে নন্দর কদর বেড়েছে আর এক কারণে। নিজের গিন্নি আর গাঁয়ের আর দশজনের মত তিনিও যে একেবারে অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার, তা নয়। কিন্তু দুর্বলতা জিনিসটা মানুষের মজ্জাগত। মোটামুটি অবিশ্বাসে একেবারে ছেঁটে দিতে পারেন নি ছোঁড়াটাকে। তাই গোপন বাসনার একটু-আধটু আভাস তাকে দিয়েছেন। নিজের সন্তান যযাতির জরা নিয়েছিল—কলিতে তেমন সুসন্তান দুর্লভ। তাঁর জরা নেবে কে? জরা যে ধীরে সুস্থে দখল নেওয়া শুরু করেছে এটা আজকাল বেশ অনুভব করতে পারেন তিনি।

নন্দ তাকেও ওষুধ দিচ্ছে, আর তারও চারগুণ বেশি দিচ্ছে আশ্বাস।

কিন্তু সূর্য হালদার তো নির্বোধ নন আদৌ। ছোকরা যতবড় দৈবজ্ঞই সাজুক আর যত ওষুধই দিক, তাঁর অন্দরমহলে হানা দিয়েছে কোন্ তাড়নায়, সেটা তাঁর বুঝতে বাকি নেই। যেদিন প্রথম দেখেছেন সেই দিনই বুঝেছেন। গিন্নির কাছে এমন প্রতিপত্তি বাড়তে না দিয়ে সেই দিনই ভালো হাতে শিক্ষা দিয়ে বিদায় করতে পারতেন তাকে। হালদার মশাইয়ের বাড়িতে এখনো পাঁচটা জোয়ান খেটে খায়।

কিন্তু হালদারমশাই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ বলেই তিনি তা করেন নি।

করলে নন্দর কাছে পরের সঙ্কল্পটাও ব্যক্ত করা হত না। বলা বাহুল্য, সেটা স্বাহার প্রসঙ্গে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রীতি জানা আছে তাঁর। মেয়েটা দিনকে

দিন একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যেতে সঙ্গোপনে ইদানীং নন্দকে অনুযোগের ছলে প্রায়ই একটা পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

—দিন কে দিন মেয়েটা যে একেবারে পাথর হয়ে গেল, নন্দ কি চোখ চেয়ে দেখছে না? যে মেয়ের মুখে কথার আগে হাসি ঝরত, যেখান দিয়ে হেঁটে চলে যেত মাটি দুলত—সেই মেয়েটা কি হয়ে গেল—নন্দ কি ওই মেয়েটার ভবিষ্যত ভেবে দেখেছে? মেয়েটার সেই দুঃখ দেখতে না পেরে এখানে নিয়ে এসেছিলেন বলে হালদারমশাই নিজেই আজ মনস্তাপী। বুড়ীটা এভাবে গ্রাস করবে তাকে ভাবেন নি। তার পাল্লায় পড়ে মেয়েটাও যেন তিলে তিলে আত্মহত্যা করছে। সব দেখেও নন্দ এভাবে চুপ করে আছে কি করে তিনি ভেবে পান না। সখেদে স্বাহার অনেক দুর্দশার কথাও বলেছেন তিনি। বাড়িতে তো খাওয়া-দাওয়ার ধুম লেগে আছে তাঁর—ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে-কুলোতে পারে না কেউ। তার মধ্যে মেয়েটার বরাতে একবেলা এক-সেদ্ধর হবিষ্যি আর রাতে একটু সাবুদানা। কিছু বলতে গেলে বুড়ীটা খেঁকিয়ে উঠবে, বিধবার পিণ্ডি ঠাণ্ডা হওয়া নিয়ে কথা। এক বাড়ি ছেলে-পুলে নাতি-নাতনীর বাড়িতে এ-নিয়ে হালদারমশাই বেশি চেঁচামেচিই বা করেন কি করে। তাও পারতেন, মেয়েটা যদি না অমন বুড়ীর ছায়ায় ছায়ায় ঘুরত।

মেয়েটার মতিগতি ও-রকম না হলে হালদারমশাই খুব যে বুড়ীর পরোয়া করতেন না, নন্দ সেটা খুব ভালো করেই জানে। তবু তাঁর কথা শুনে নন্দ স্বাহার ওপরেই রাগে জ্বলেছে।

হালদারমশাই আরো বলেছেন।—একে ওই খাওয়া তার ওপর সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনি, বুড়ীটা আরো দশ বছর বাঁচলে মেয়েটার কি হাল হবে ভেবেছ?

নন্দ তা ভাবেনি অবশ্য। কারণ, একবেলা আতপান্ন আর হাড়-ভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও যেটুকু তার চোখে পড়ে তাতেই ধমনীর রক্তে আগুন ধরে। চোখে পড়তে দিতে স্বাহা চায় না, কিন্তু সে-সুযোগ নন্দ নিজেই করে নিতে পারে। দিদিমার কাছে এলেই নন্দর জল তেষ্টা পায়, এটা সেটা দরকার হয়। ফলে যতক্ষণ সে থাকে বার-কতক স্বাহার ডাক পড়ে। ডাক পড়লে এক ডাকে হাজির না হয়েও উপায় নেই। দিদিমার জিভ একবার নড়তে শুরু করলে থামে না চট করে।

সেই স্বল্প মুহূর্তে নন্দ দিদিমার চোখ এড়িয়ে যতটুকু দেখা সম্ভব দেখে। দেখার আওতায় ছেঁকে ধরে রাখতে চায় তাকে। দশ বছর পরের হাল নন্দ ভাববে কি করে, অত দুর্দৈবের মধ্যেও যৌবন যেন রেষারেষি করে নারী-অঙ্গে বন্যা নামিয়েছে।

হালদার মশাইয়ের পরামর্শটা অতঃপর আর অস্পষ্ট নয় একটুও।—এত কৃচ্ছ্র সাধনার দরকার কি, এত কি শোকের কারণ ঘটেছে তিনি ভেবে পান না। শোক নয়, স্বাহার

রোগ ওটা। মেয়েটাকে রোগে ধরেছে। নইলে যে বিয়ে হয়েছিল বিনয়কেষ্টর সঙ্গে সেই বিয়ের কি দাম? ওটা যে এতবড় অকাল কুষ্মাণ্ড কে জানত! লোভে পড়ে মেয়েটার সর্বনাশ করেছে বই তো নয়। ভগবান আছেন, উচিত সাজাই হয়েছে তার। তা'বলে অমন মেয়েটা এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে কেন! হালদার মশাইয়ের ধারণা, মেয়েটাকে আবার তার বাপের ভিটেয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। সুস্থ হবে স্বাভাবিক হবে—আগের মত হাসি খুশিতে ভরে উঠবে। একবার গান বাজনার দিকে মন ফিরিয়ে দিতে পারলেই সব ভুলবে। সব জ্বালা জুড়ুবে। ওর এই গানের গলায় বনের পশু পাখি পর্যন্ত বশ করার জাদু ছিল যে—নন্দ তো শোনেনি শেষের দিকে কি গান গাইত মেয়েটা –

হালদার মশাইয়ের পরামর্শটা নন্দর মনে ধরে নি। স্বাহাকে এখান থেকে সেও সরিয়ে নিতে চায়, কিন্তু তার বাপের ভিটেতে নয়। আগের মত সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, হাসিখুশিতে ভরে উঠুক, সেটা কাম্য। গান-বাজনার দিকে মন ফেরালেও আপত্তি নেই—কিন্তু বনের পশু পাখির প্রতি মায়া নেই নন্দর। নিজের তাড়নায় অস্থির সে, একটা করে দিন যায়, জীবন দুর্বহ লাগে। স্বাহাকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসতে পারলে তাকে নিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে কোন্ নিরিবিলিতে নিজের জগৎ সৃষ্টি করবে সে—তাই ভেবে ভেবে অনেক বিনিদ্র রাত ভোর করেছে। সেটা কোনরকমে সম্ভব হচ্ছে না দেখে ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। কামনার ওপর থেকে স্বপ্নের প্রলেপ ঘুচে গিয়ে এখন ধিকি ধিকি কামনাই জ্বলছে শুধু। এর মধ্যে পরামর্শটা দিয়ে হালদারমশাই একটা ইন্ধন জোগালেন ঠিকই। স্বাহাকে এখানকার এই বেষ্টনী থেকে টেনে আনার সঙ্কল্পটা মগজে একেবারে বসে গেল তার। আপাতত যদি স্বাহার বাপের ভিটেতেও হয় তাতেও আপত্তি নেই।

পরামর্শের ফলে মনের জোরও বাড়ল। দ্বিপ্রহরে সেদিন প্রায় বুক টান করেই অন্দরে ঢুকে গেল নন্দ। কেউ যদি দেখেও, ভাববে বাড়ির কর্ত্রীর আহ্বানে চলেছে। যেমন আশা করেছিল তেমনটিই দেখল। দোতলায় নিজের ঘরে দিবানিদ্রার ওষুধ সেবন করে বুড়ী ঘুমুচ্ছে। ঘরের ওধারের সরু ঢাকা বারান্দায় স্বাহা রেলিং-এ ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে আছে। পা টিপে ঘর ডিঙিয়ে নন্দ বারান্দায় চলে এলো।

তাকে দেখামাত্র এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে স্বাহা ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল। পারা গেল না। তার আগেই হাত ধরে ফেলে নন্দ হ্যাঁচকা টানে তাকে বারান্দার খানিকটা এধারে এনে ফেলে পথ আটকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে গেল যেন স্বাহার। চোখে মুখে সেই পুরনো আগুন। অস্ফুট স্বরে গর্জন করে উঠল, ছাড়ো বলছি, নইলে এক্ষুনি টের পাবে।

নন্দ বিড়বিড় করে বলল, কি করবি? চেঁচাবি? চেঁচা না, আমি বলব তুই ডেকেছিস আমাকে।

স্বাহা নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর শুষ্ক চোখে নন্দকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে খানিক। চাপা আক্রোশে বলেছে, দিদিমাকে আজই কি উদ্দেশে আস তুমি এখানে—

একটা দুরন্ত বাসনা সবলে দমন করে নন্দ তেমনি জবাব দিল, কেন আসি গোড়া থেকেই তো জানিস, এতদিন বলিস নি কেন?

স্বাহা ঝলসে উঠল, তুমি যাবে কিনা এখান থেকে?

তুই যাবি কি না বল। তুই কি করবি, সমস্ত জীবন ঝি-গিরি করবি এখানে?··· এই শেষবার বলছি, ভালো চাস তো চল্ আমার সঙ্গে, নইলে তোর কপালে আরো অনেক দুর্ভোগ আছে। আমার একটা মুখের কথায় ওই বুড়ী দূর দূর করে তোকে তাড়াবে এখান থেকে।

স্বাহা দেখছে নন্দকে। ঘৃণায় বিদ্বেষে সমস্ত মুখ রক্ত-বর্ণ। আবাল্য সঙ্গীর ওই দুই চোখে কামনার আঁচ অনেক দেখেছে। কিন্তু তার সঙ্গে বলিষ্ঠতাও ছিল একটু। মমতা-বোধ ছিল। কিন্তু এখনকার এই দৃষ্টি শুধু পিচ্ছিল, কামনাতুর। হিংস্র, নির্মম। এই মুহূর্তে যে তাকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে আসছে তার মত শত্রু ওর আর যেন কেউ নয়।

এক ধাক্কায় তাকে ঠেলে দিয়ে স্বাহা নিজেই ঘরে ঢোকার পথ করে নিল। ঘরের মধ্যে নিদ্রামগ্ন হালদার গিন্নির খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

পায়ে পায়ে নন্দও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। স্বাহা ওদিক ফিরে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নন্দ দৃষ্টি-ফলকে নারী-অঙ্গ ফালাফালা করল খানিক। তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সব বোঝাপড়া শেষ হয়েছে, এখন শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা।

আট

সুযোগ যে এই পথে আসবে, এতবড় দৈবজ্ঞ নন্দও কল্পনা করেনি।

মাস তিনেক পরের কথা।

চুনিগাঁয়ে আবার একটা মস্ত আলোড়ন উপস্থিত যা নিয়ে, সেটা একটা গলার হার।

হালদার গিন্নির হীরে-বসানো গলার হার। এই বয়সেও সোনা গয়নার প্রতি বিষম টান বুড়ীর।

বার মাস গায়ে সরষের তেল মেখে চান করেন হালদার গিন্নি। স্বাহাই মাখিয়ে দেয় এখন। তেল লাগার ভয়ে রোজই হারটা দেরাজের ওপর একটা কাঠের কৌটোর মধ্যে রেখে তেল মাখতে বসেন তিনি।

সেই হার চুরি।

তোলপাড়টা প্রথমে বাড়ির মধ্যেই হল। দাসদাসীর সংখ্যা কম নয়, নাতিরাও অনেকে লায়েক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার তো বাড়িতে আর কখনো হয়নি। একেবারে গিন্নির ঘরের দেরাজের ওপর থেকে চুরি—একি আর বাইরের লোকে এসেছে নিতে!

হালদার গিন্নি সকলকে ধরে ধরে শাসালেন। স্বাহাও বাদ গেল না। তার মুখ শুকনো, মরার মত বিবর্ণ। কারণ হাবভাবে মনে হয়, সূর্য হালদার তাকেই সন্দেহ করেন। আর সেই সন্দেহের আভাস তিনি হালদার দিদিমাকেও দিয়েছেন। নইলে দিদিমা সকলকেই শাসিয়েছেন, কিন্তু তাকে বলার সময় এমন রুক্ষমূর্তি কেন তাঁর!

কেউ বলল, কড়ি চালান দাও, কেউ বা পরামর্শ দিল, চাল-পড়া করো। হালদার গৃহিণী সবই জানেন, সবই করাতে পারেন। কিন্তু কিছুই না করে তিনি নন্দর জন্যে অপেক্ষা করলেন। অমন গুণী ছেলেটা থাকতে আর কারো কিছু করার দরকার কি, যা করার সেই করবে।

নন্দ কলকাতায় গিয়েছিল। পরদিনই ফেরার কথা।

ফিরল।

সব শুনে সে গুম হয়ে বসে রইল খানিক। তারপর চুপচাপ উঠে গেল। দিদিমাকে বলে গেল, যা করা দরকার দিন ক্ষণ তিথি দেখে করবে—কাল জানাবে।

নন্দ ভেবেছে বইকি। সমস্ত দিন সমস্ত রাত ভেবেছে। কেউ যেন ভিতর থেকে

বার বার নিষেধ করেছে তাকে, ভ্রুকুটি করেছে। আবার কার বিলোল হাতছানিতে সমস্ত নিষেধ ভ্রুকুটি ডুবে গেছে।

পরদিনই নন্দর কর্ম ব্যবস্থা রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

সে কাঁঠাল পাতা ঘোরাবে, তুলাদণ্ডে অপরাধী ধরে দেবে।

কাঁঠাল পাতা ঘোরানো! সে আবার কি?

পরের দিনটাই দৈবগণনার পক্ষে অনুকূল দিন। সেইদিনই জানতে পারবে সকলে, কাঁঠাল পাতা ঘোরানোটা কি ব্যাপার, তুলাদণ্ডটা কি জিনিস। হিন্দু শাস্ত্রের মন্ত্র নয় কিছু, মুসলমান পীরের দুর্লভ মন্ত্র। অমোঘ, অব্যর্থ একেবারে।

সকাল না হতে হালদার বাড়ির বাইরের বড় ঘরে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। মাঝখানে চিক টাঙানো হয়েছে। চিকের ওধারে মেয়েরা। নন্দর নির্দেশ সকলকেই থাকতে হবে। ফকিরের মন্ত্র সকলেরই কানে শুনতে হবে। অপরাধী তো যে কেউ হতে পারে।

চিকের এধারে এক পাঁজা কাঁঠাল পাতা সাজিয়ে বসেছে নন্দ। কাঁঠাল পাতা নরম বটে, কিন্তু হালকা পাতা নয়। সেই পাতার একদিকে বাড়ির প্রতিটি লোকের, স্ত্রীলোকের, দাসদাসীর নাম লিখে উল্টে রাখা হয়েছে। উল্টে রাখার ফলে কোন্ পাতায় কার নাম লেখা বোঝার উপায় নেই। তার ওপর উল্টো-পাতাগুলোকে মেশানো হয়েছে বার বার। যাতে করে ওপর নিচ সম্বন্ধে কারো কোনো সংশয় না থাকে। পাতাগুলো নিয়ে সকাল থেকেই হালদার দিদিমার পূজোর ঘরে বসে মন্ত্রপাঠ করেছে নন্দ। সবাই সেই মন্ত্রপূত কাঁঠাল পাতা দেখছে এখন।

অনুষ্ঠানের বাকি সরঞ্জামের মধ্যে একটা চামড়ার পুরনো চপ্পল, একটা গজাল আর খানিকটা সুতো। গজালটা ভারসাম্য বজায় রেখে চপ্পলের ঠিক মাঝামাঝি বিঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর শক্ত সুতোটার মাঝামাঝি গজালের ওপরের মাথাটা বাঁধা হয়েছে। দুদিকে সমান সুতো। নন্দ দু'জন দু'জন করে অনেককে ডেকে সুতোর দু'দিক ধরে গজাল-বাঁধা চপ্পলটা তুলতে বলল। তারা তুলল। সুতোর দুদিক টান করে ধরে রাখতে বলল, সুতোয় যাতে ঢিল না পড়ে। তারা তাই করল। সুতোর ওপর গজালে বেঁধা চপ্পল সমান হয়ে ঝুলছে। নন্দ নির্দেশ দিল, এবারে হাত ঘুরিয়ে গজালে-বেঁধা চপ্পলটা ঘোরান দেখি?

তারা হাত ঘোরালো। কিন্তু হাতই ঘুরল শুধু, চপ্পল ঘুরল না একটুও—চপ্পলের মাথা বা গোড়ালী একদিকেই রইল—তাদের দিক-বদল করা গেল না।

নন্দ বলল, তাহলে দেখেছেন, ইচ্ছে করলেই দিক-বদল করা যায় না?

সকলে একবাক্যে স্বীকার করল, যায় না বটে।

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করবে কি না, দু-মিনিটের জন্যে সেই শেষ সুযোগ দিয়ে নন্দ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘরের বাইরেও ভিড়। কেদার দারোগাও এসেছে একজন সিপাই নিয়ে। কি হয় কে জানে।

নন্দ একটি কথাও বলল না কারোর সঙ্গে। চুপচাপ ফাঁকায় এসে দাঁড়াল। সূর্য হালদার এগিয়ে এলেন। কানে কানে বললেন, বুঝতেই তো পারছ কে নিয়েছে, হীরে-বসানো হার সরানো তো ঝি চাকরের সাহসে কুলোবে না, ছেলে-মানুষ, লোভে পড়ে নিয়েছে। এত সব হাঙ্গামা না করে তোমার দিদিমাকে ডেকে চুপিচুপি বলে দাও না—তুমি বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

নন্দ অস্ফুট কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আপনিও তো নিয়ে থাকতে পারেন—কার নাম উঠবে কি করে জানলেন?

নন্দর মূর্তি দেখে সূর্য হালদাব অবাক। আর কিছু বলার আগেই নন্দ ভিতরে চলে এলো।

কেউ স্বীকার করল না দেখে কাজে বসে গেল সে। শেষ বারের মত কাঁঠাল পাতায় সকলের পৃথক পৃথক নামগুলো দেখিয়ে উল্টে রাখল। উল্টানো পাতাগুলো খিচুড়ির মত আবার মেলানো হল।

আগন্তুকদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে এসে সুতোর এক মাথা ধরে বসতে বলল নন্দ। অন্য মাথাটা নিজে ধরল। সুতোর মাঝে গজালে বেঁধা চপ্পলটা ঝুলতে লাগল। নন্দ একটা করে উল্টানো কাঁঠাল পাতা চপ্পলে রাখে আর মন্ত্র আওড়ায়। দুর্বোধ্য গুরুগম্ভীর মন্ত্র :

ঈষ্টাক ঈষ্টাক ঈষ্টাক
রাস্তে কুতুবা রাস্তে—

পীরের মন্ত্র অনুধাবন করা সহজ নয় কারো পক্ষে। কেবল কতগুলো শব্দ যেন গোঁ গোঁ করছে ঘরের মধ্যে। এতবড় ঘরটার বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ। টুঁ শব্দটি নেই।

চিকের ওধারে হালদার দিদিমার পায়ের কাছে বসে স্বাহা কাঁপছে থর থর করে।

চপ্পল ঘুরছে না।

নন্দ একটা করে উল্টানো কাঁঠাল পাতা চপ্পলে রাখে, একরাশ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়ায়। চপ্পল ঘুরল না দেখে সেই পাতা সরিয়ে আর একটা পাতা রাখে—আবার মন্ত্র পড়ে।

এই করে চার ভাগের তিন ভাগ কাঁঠাল পাতা বাতিল হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর সকলের বিস্ফারিত চোখের সামনে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুদিকের সুতোয়

ঝোলানো গজালে বেঁধা চপ্পল ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে মাথার দিক গোড়ালীর দিকে চলে এলো, গোড়ালীর দিক মাথার দিকে।

কার নাম? কার নাম কাঁঠাল পাতায়?

নন্দ সামনের লোকটিকেই পাতা উল্টে দেখতে বলল, কার নাম।

সে দেখল।

স্বাহার নাম!

একটা অস্ফুট সোরগোল পড়ে গেল। স্বাহা! স্বাহা! স্বাহা!

স্বাহার দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক ঝটকায় হালদার গৃহিণী চিকের আড়াল থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়েস যা, পুরুষের চোখের সামনে আসতে লজ্জা নেই। এসেই থাকেন।

কিন্তু নন্দ বলল, আর একবার দেখবে সে, যদি ভুল হয়ে থাকে।

ওলটানো কাঁঠাল পাতাগুলো আবার মেশানো হল, আবারও সেই একই অনুষ্ঠান, আবার সেই সুতোয়-বাঁধা চপ্পল একবারই ঘুরল মাত্র।

আবারও সেই এক নামই উঠল।

স্বাহা!

চিকের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে স্বাহা হালদার দিদিমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল একেবারে। এক-ঘর লোকের মধ্যেই আর্তনাদ করে উঠল সে, আমি নিই নি গো দিদিমা, আমি হার নিই নি—ও ইচ্ছে করে আমার নাম তুলেছে।

নিষ্ফল রোদন। নিষ্ফল আকুতি।

হালদার গৃহিণী পারলে মুখটা মাটিতে থেঁতলে দেন ওর।—হারামজাদী সর্বনাশী এই জন্যে দুধকলা দিয়ে পুষেছি তোকে, হার বার করবি তো কর, নয়ত কুচি কুচি করে কেটে নুন ছড়াব আমি!

নন্দ মাটির দিকে চেয়ে অন্যমনস্কের মত কাঁঠাল পাতাগুলো দুমড়ে ভাঙছে। সকলের উত্তেজনার অলক্ষ্যে এগুলো এখন ভাঙাই দরকার। সে কর্তব্য করেছে মাত্র। সেই কর্তব্যের অপ্রিয় ফল-ভারেই যেন মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকে আছে। বুড়ীর পায়ে মাথা কুটছে স্বাহা, বুড়ীর তর্জন-গর্জন বাড়ছে। ঘর-ভর্তি লোক হাঁ করে তাই দেখছে। শুধু নন্দ দেখতে পারছে না।

সকাল গেল, দুপুর গড়ালো, বিকেল হল।

কিছু অঘটন ঘটার আগে মনে যেমন অশুভ ছায়া পড়ে একটা, তেমনি ছায়াচ্ছন্ন

হয়ে আছে নন্দর ভিতরটা। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, এখন শুধু প্রতীক্ষা। কি ঘটে সেই প্রতীক্ষা।

স্বাহাকে কেদার থানায় নিয়ে গেছে।

নিদারুণ অস্বস্তিতে সমস্ত দিন ছটফটিয়ে কাটালো নন্দ। তার মত ছিল না। সূর্য হালদারেরও না। স্বীকার করাতে না পেরে হালদার বুড়ীই রাগে জলে পুড়ে স্বাহাকে এনে কেদারের হাতে দিয়েছেন। প্রস্তাবটা অবশ্য কেদারেরই। বুড়ীকে আড়ালে ডেকে বলেছে, থানায় নিয়ে গিয়ে দু-চারটে ধমক-ধামক করলেই ভয় পেয়ে হার বার করে দেবে—কিছু ভয় নেই, বিকেলের আগেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

হীরে বসানো হারের শোকে আর রাগের জ্বালায় হালদারগিন্নি তৎক্ষণাৎ চুলের ঝুঁটি ধরে স্বাহাকে টেনে কেদারের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

বিকেল হতেই সূর্য হালদার এসে হাজির নন্দর কাছে। তাঁরও মুখ পাংশু, বিবর্ণ। বললেন, মেয়েটাকে তো দিয়ে গেল না এখনো— তুমি না হয় একবার গিয়ে খোঁজ করে এসো।

নন্দ গেল। কিন্তু থানায় দারোগার মেজাজ কেদারের। তবে কেদার দুর্ব্যবহার করল না। গম্ভীর মুখে বলল, থানার একটা নিয়মকানুন আছে, ইচ্ছে করলেই কাউকে ছাড়া যায় না— জিনিসটা যে ও-ই নিয়েছে জানা কথাই, কিন্তু এমন গোঁ কিছুতে স্বীকার করবে না। একটা রাত থানার সুখ বুঝলেই ঠাণ্ডা হয়ে স্বীকার করবে। পরে নন্দকে একটু সান্ত্বনা দিয়েই ফিরিয়েছে সে, কিছু ভাবিস না, ওর জন্যে এখানে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাহা পরদিনও ছাড়া পায়নি। তার পরদিন পেয়েছে।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বক্ষণে তাকে ছাড়া হয়েছে। এই দু'দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নন্দ থানার সামনে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। আর, ক্ষোভে যাতনায় মাথার চুল টেনে ছিঁড়েছে নিজের।

স্বাহা বাইরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নন্দর মনে হল, যে সর্বনাশের আশঙ্কায় দু'দিন দু'রাত অহর্নিশি জ্বলেপুড়ে মরছে সে, তাই হয়েছে। কেদার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সেটা তার মুখের দিকে চেয়েই কেন জানি মনে হয়েছিল নন্দর।

টেনে হিঁচড়ে সরস্বতীর দিকে চলেছে স্বাহা।

নন্দ তস্করের মত আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে থানার দিকে পা বাড়াল সে। কেদার তাকে দেখেই

বলল, স্বাহাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তো, সে তো চলে গেছে। ভয়ানক জেদী মেয়ে, স্বীকার করলই না।

কেদার হাসতে লাগল হি হি করে। বলল, তুই ও-ভাবে চেয়ে আছিস কেন, এটা যে থানা তাও ভুলে গেলি নাকি! চোখ টিপে ইশারা করল, আর অসুবিধে হবে না, যেখানে গেছে যা এবার—

নন্দ চলে এলো।

কোথায় গেছে স্বাহা নন্দ অনুমান করতে পারে। নন্দও গিয়েছিল সেইখানে। পরাণ চাটুজ্জের ভিটেয়। স্বাহার নিজের ভিটেয়। জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে জায়গাটা। প্রথম ঘরটায় যে তালা ঝুলছিল সেই তালাটা নেই। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নন্দ সাহস করে আর এগোয়নি। দূর থেকে ফিরে এসেছে।

সূর্য হালদার খবর পেয়ে পরদিনই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দরজা তখনো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অনেক ডাকাডাকি করেও দরজা খোলাতে পারেন নি। দুপুরের দিকে লোক দিয়ে খাবার-দাবার আনাজপাতি পৌঁছে দিয়েছেন। নিজে গেলে স্বাহা দরজা খুলে বেরুবে না জানেন। তাঁর লোক সে-সব পৌঁছে দিতে পেরেছে। কিন্তু স্বাহা তার কিছু স্পর্শ করেছে কিনা তিনিও জানেন না, নন্দও না। সূর্য হালদার চুপি চুপি নন্দকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মেয়েটার ওপর কোনরকম অত্যাচার হয়নি তো?

নন্দ পাংশু মুখে ঘাড় নেড়েছে, জানে না।

আরো তিনটে দিন গেল। রাতের অন্ধকারে সরস্বতীর চড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল নন্দ। হঠাৎ মনে হল চড়া ধরে কে আসছে।

যে আসছিল সে-ই চমকে উঠল প্রথম। কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, কে ওখানে?

কেদারের গলা। সাড়া না পেয়ে কেদার একহাত প্রমাণ রিভলবারটি কোমর থেকে বার করে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। নন্দ স্থির দাঁড়িয়ে।

তাকে দেখে কেদার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। —তুই এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোকেও দরজা খুলে দিচ্ছে না? কেদার হাসছে।

নন্দ অস্ফুটস্বরে বলল, এই করলে শেষে?

কেদার সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল—কেন, তুই কি বিল্বপত্র দিয়ে পুজো করার জন্যে ওকে ঘর থেকে বার করতে চেয়েছিলি নাকি? থানায় নিয়ে গিয়েই বুঝেছি ও হার-টার নেয়নি, তোর ভুল হয়েছে, আর ভুলটা ইচ্ছে করেই করেছিস তুই।

কুৎসিতভাবে হাসতে লাগল কেদার। তারপর বলল, চল্ দেখি যাই একবার—কালও এসে ফিরে গেছি, আজ যদি দরজা না খোলে তো দরজা ভাঙবো। দুজনে হলে সুবিধে হবে, চল্—

নন্দ নীরবে অনুসরণ করল তাকে। কেদারের মুখে ফুর্তি ধরে না।

দরজা খোলাই ছিল। স্বাহা দূর থেকে আসতে দেখেছে তাদের। একখানি স্থির জলন্ত শিখার মত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। নিস্পলক দুই চোখ নন্দর মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। তারপর শান্তমুখে কেদারকে বলল, চোর ভালো তো বেকুব ভালো নয়, বেকুব সঙ্গে করে এনেছ কেন—ইচ্ছে হলে তুমি একা আসতে পার।

মনের আনন্দে কেদার একাই ঘরে ঢুকে গেছে। নন্দর মুখের ওপর স্বাহা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

এর পরদিনই সকলে জানল, নন্দ আবারও আগেকার মতই এখানকার বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় চলল। অনেকে অবাক হল, অনেকে কারণ জিজ্ঞাসা করল, অনেকে বাধাও দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু দু'কথার বেশি তিন কথার ফুরসত কারো হল না। কারণ কোনো অনুরোধের বা কোনো কথারই জবাব পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে। একটি কথাও বলেনি। অতএব, সে যাবে যে সেটা স্থির।

গেলও। ক'টা দিন না যেতে কলকাতার ঘরও তুলে দিল। নন্দ কাশী যাচ্ছে—সেখান থেকে আরো কোথায় কোথায় যাবে। কলকাতা ছাড়ার আগেই কি ভেবে হালদার মশাইকে চিঠি দিয়েছে একটা। অতঃপর যার সঙ্গেই দেখা, হালদারমশাই দুঃখ করে নন্দর সমাচার জানিয়েছেন তাকে। বলেছেন, ছেলেটা বিবাগী হয়ে গেল।

খবরটা শেষে স্বাহাকে জানাতে এসেছিলেন হালদারমশাই। বলেছেন। স্বাহা শুনেছে। কিন্তু শুনেছে বলে মনে হয়নি তাঁর। পাথরের মূর্তির মত বসে স্বাহা নিস্পলক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল। চেয়েই ছিল। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছেন হালদারমশাই। নন্দর হার চুরি ধরে দেওয়ার ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝতে বাকি নেই তাঁর। রাতেও যখন ছাড়া পায়নি থানা থেকে তখনই বুঝেছে। আর এখন তো একেবারে জলের মত স্পষ্ট সব।

হালদারমশাই উঠে পড়লেন। মেয়েটার মায়ের কি হয়েছিল মনে পড়ল, আর বাপটা তো ও-ই ছিল। এবও এটা বিকারের লক্ষণ কিনা বুঝছেন না। তাঁর মুখে সত্যিকার বেদনার ছায়া। বললেন, গিয়েই তিনি খুব বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দিচ্ছেন দু'জন। রাতে নিশ্চয় ভয় করে তার—

এ ক'দিনের সব ব্যবস্থাই হালদারমশাই করেছেন। আর রাতে থাকার জন্যে লোকও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাহা থাকতে দেয়নি তাদের, বিদায় করে দিয়েছে। আজ আবার এই প্রসঙ্গ উঠতে মূর্তির মধ্যে চেতনার আভাস মিলল। হালদার মশাইয়ের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে স্বাহা মাথা নাড়ল একটু। অর্থাৎ লোকের দরকার নেই।

আবারও খুব বিশ্বস্ত লোকের কথাটাই জোর দিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কি জানি কেন বলা গেল না। হালদারমশাই প্রস্থান করলেন।

ভয়? না স্বাহার আর ভয়ডর নেই কিছু। কেবল কাউকে দেখলে সে স্থির হয়ে যায় ওই রকম। নইলে এরই মধ্যে অনেক ভেবেছে। ভয়ের কথাও ভেবেছে। রাতের অন্ধকারে পিছনের ওই বটতলায় গিয়েও দাঁড়িয়েছে। মা-বাবার কথাও মনে হয়েছে তার। লোকে বলাবলি করেছে, মা তার প্রেতিনী হয়ে ওই জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করত বাবাকে নাকি সে-ই ডেকে নিয়ে গেছে। স্বাহার সব মনে পড়েছে, আবার মনে পড়ছে। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক শুনে উৎকর্ণ হয়েছে, জঙ্গলে ঢুকবে কিনা ভেবেছে। ঢুকলে মা-বাবার দেখা পাবে কিনা ভেবেছে। জঙ্গলের কথা ভেবেছে আর মরা সরস্বতীর কথা ভেবেছে আর গোয়ালফেলানীর শ্মশানের কথা ভেবেছে। ভেবে ভেবে শেষে ভিটেতেই বসে আছে। জঙ্গলে অত আঁধার নেই, মরা সরস্বতীতে অত জল নেই, গোয়ালফেলানীর শ্মশানে অত আগুন নেই।

ওকে অপেক্ষা করতে হবে। প্রতীক্ষা করতে হবে। কেউ আসবে। কিছু হবে। যে-রকমটি চাইছে তেমন আঁধারই ঘনাবে। তেমন প্লাবনই আসবে। তেমন আগুনই জ্বলবে।

স্বাহা অপেক্ষা করছে। প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু সেদিন সকালে ভিটেয় যার আবির্ভাব তার কথা অন্তত স্বাহা কোনোদিন ভাবেনি। যে এলো সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, ওর মন থেকে সে এরই মধ্যে একেবারে মুছে গিয়েছিল। তাই তাকে দেখে স্বাহা অবাক, চোখে পলক পড়ে না।

দিদি, তুই!

বাসনা মুখ টিপে হাসছিল আর বোনের বিস্ময় দেখছিল। বলল, হ্যাঁ রে ছুঁড়ী আমি, চিনতেও পারিস না নাকি!

স্বাহা ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। দিদির পিছনে আধ-বয়সী অপরিচিত একজন দাঁড়িয়ে। স্বাহার প্রথম বিস্ময়ের ঝোঁক কাটেনি তখনো। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তুই কোথা থেকে?

বাসনা হেসে উঠল, যমের বাড়ি থেকে। তারপরেই ছড়া কাটল:

নিম তিত নিসিন্দে তিত
তিত মাকাল ফল,
তার থেকে অধিক তিত
বোন সতীনের ঘর।

আবারও খিল খিল করে হেসে উঠল বাসনা, তুই তো সাক্ষাৎ সতীন বোন, দেখতে এলাম তিত কেমন।

হাসতে হাসতে ঘরে এসে বসল। সঙ্গের লোকটি দাওয়ার ওপর। এ যেন বাসনাই নয়। দু'চোখ টান করে চেয়েই আছে স্বাহা। না খুশি, না বিরক্ত। দেখছে। দিদির চোখের কোলে কালি, হাসিটা সুন্দর নয় মিষ্টি নয় একটুও।

—অমন হাঁ করে আছিস কেন, বাসনা হাত ধরে তাকে কাছে টেনে আনল, তুই তো দিদির একটা খবরও রাখিস না, অথচ আমি কোন্ খবরটা না রাখি তোর। সব জানি, সব খবর রাখি, বড় জ্বালায় জ্বলেছিস—আর তোর কিছু ভাবনা নেই। আর আমি তোকে ছেড়ে যাব না।

স্বাহার চোখের কোণ দুটো শিরশিরিয়ে উঠছিল। আর একটু প্রশ্রয় পেলেই বন্যা নামতে পারত। কিন্তু প্রশ্রয় দিল না। বন্যা আটকালো। ফলে কঠিন দেখালো মুখখানা। দাওয়ার লোকটাকে ভালো করে দেখে নিল এক নজর। পরনে আধ-ময়লা ধুতি, গায়ে আধ-ময়লা ফতুয়া, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় একবাশ কাঁচা-পাকা চুল। জোয়ান চেহারা, বলিষ্ঠ লোমশ বাহু, চওড়া কাঁধ। লোকটা বাইরে থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকেই দেখছিল। স্বাহা দিদির দিকে ফিরল, ও কে?

বাসনা মুচকি হেসে বলল, নতুন মানুষ। দেখিস'খন গুণী মানুষ। পরে নতুন মানুষ আর গুণী মানুষের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, আমার বোনকে দেখলে? এই স্বাহা। সত্যি সত্যি স্বাহা কিনা দেখো—চোখ দিও না আবার, জ্বলে পুড়ে খাক হবে তাহলে।

সেই থেকে চেয়েই ছিল লোকটা। দুই চোখে রূপ মাপছিল। বাসনার কথা শুনে দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

মন্টির কথা মনে হয়েছিল স্বাহার। সে কোথায় বা সে নেই কেন জিজ্ঞাসা করল না। নেই দেখতেই পাচ্ছে। নেই কেন তাও অনুমান করতে পারে। দিদির মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দিদি পুরুষের ভক্ত হয়েছে। মন্টি ছেলে মানুষ।

নয়

বাসনার যে কথা সেই কাজ। এবার নিশ্চিত সুখে রাখবে বোনকে। আনন্দের হাট বসাবে।

সাত দিনের মধ্যে পরাণ চাটুজ্জের ভিটের চেহারা সত্যিই বদলে গেল। আগাছা উপড়ে তকতকে করা হল গোটা এলাকা, পরের ঘর দুটোরও খড়-ছন নতুন করে দেওয়া হল। শেষের ঘরে, অর্থাৎ চারু বোষ্টুমী বা মন্টি যে-ঘরে থাকত সেই ঘরেই গান-বাজনার আসর বসল। অনেক বেশি ঘটা করে, অনেক বেশি জাঁকজমক করে।

গাঁয়ের রসিকজনেরা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবার। স্বয়ং হালদার এলেন। নায়েব আসরটাকে পাকা আসর করার জন্যে বাসনার হাতে গোপনে বেশ মোটা টাকাই দিলেন তিনি। দেবার সময় নাতনীর সঙ্গে রসিকতাও করলেন একটু। আসর বসলেই বাসনা স্বাহাকেও টেনে নিয়ে যায়। স্বাহা এখনো গান গায়নি একদিনও। চিত্রার্পিতের মত বসে থাকে সে, চেয়ে চেয়ে দেখে। বাসনাকে দুলে দুলে গাইতে দেখলে কেন জানি চারু বোষ্টুমীর কথা মনে হয় তার। গান গাইবার জন্য বাসনা স্বাহাকে জোর করে কিছু বলে না, এসে যে বসে—এইতেই সে খুশি আপাতত। বাসনার চোখ খুলেছে। স্বাহার বসাটুকুরই দাম কত, সেটা সে চারদিকে একবার চোখ চালিয়েই উপলব্ধি করতে পারে।

দিন যায়।

বাসনার নতুন মানুষটি যে সত্যিই গুণী তাতেও আর সন্দেহ নেই স্বাহার। কোথা থেকে যে অল্প বয়সী সুশ্রী মেয়ে আসছে আরো, ঠাওর করে উঠতে পারে না। বাসনা বলে, আখড়া পাকা করতে হলে যে অনেক মেয়ে চাই রে—আমি একা গাইলে হবে, না তুই একা গাইলে হবে? দেখলি না, একজন চোখ বুজলেই তো আখড়া জঙ্গল।

সেই সব মেয়েদের জন্যেও রাতারাতি ঘর করে দেওয়া হয়েছে একটা করে। পাশাপাশি লাগালাগি ঘর সব। আসরের ঘরটাকে চারগুণ বড় করা হয়েছে। বাসনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও গায়। সে-সব মেয়েদের কাছে অবশ্য বাসনা কড়া-মেজাজের কর্ত্রী কিন্তু তার থেকেও অনেক কড়া মেজাজের মানুষ বাসনার নতুন মানুষ। তারা ভয় করে তাকে। সমীহ করে। সে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে, দরকার হলে শাসনও একটু-আধটু করে। বাইরের পুরুষ মানুষ কোনো মেয়ের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে চাইলে বা নিরিবিলিতে গান শুনতে চাইলেও মাশুল গুনে

দিতে হয় বাসনার হাতে। আখড়ায় যত টাকা ওঠে তারও পাইপয়সা অবধি বাসনার হাতের মুঠোয়।

চুনি-গাঁয়ে রসের বান ডেকেছে। পাঁচ গাঁ ভেঙে লোক আসছে পরাণ চাটুজ্জের ভিটের আখড়ায়।

এমন হল মাত্র দুটি মাসের মধ্যেই।

তবু মন ওঠে না বাসনার নতুন মানুষের। তার চাপা ক্ষোভ চাপা থাকে না সব সময়। চাঁদের হাটে সব থেকে সেরা চাঁদটি দিনের পর দিন যদি আসরে গিয়ে শুধু বোকার মত বসেই কাটায় রসের আসরে উল্টে যে টান ধরে তাহলে। বিশেষ করে, প্রায় সবাই যেখানে জানে ওই মেয়ে গাইতে বসলে কোন্ বন্যার বাঁধ ভাঙে। বাসনার নতুন মানুষ সেটা অবশ্য দেখেও নি শোনেও নি। কিন্তু সে তো শুধু নতুন মানুষই নয়, গুণী মানুষ। সে অনুমান করতে পারে।

পারে বলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে দিনকে দিন। নাচতে নেমে ঘোমটা বরদাস্ত করার লোক নয় সে। লোকের আশার ওপর আর ধৈর্যের ওপর কত আর মাশুল চড়ানো যায়। তার ওপর সূর্য হালদার একাধিক দিন টিপে দিয়েছেন তাকে, মেয়েটাকে যে-করে হোক গানে বসিয়ে দাও, দেখবে আসরের ভোল বদলে যাবে। মেয়েটা অনেক দাগা খেয়েছে, ওই মুখ করে আসরে বসে থাকলে লোকের যে সে-কথা মনে পড়ে যায়—আনন্দের হাটে দুঃখের ছায়া পড়ে হে!

বলাই দাস, অর্থাৎ বাসনার নতুন মানুষটি শোক-দুঃখের মর্ম অতটা বোঝে না। মেয়ে মানুষ বিগড়লে কি করে তাকে শাসন করতে হয় স্ব-বশে আনতে হয় তার স্থূল রীতিটা ভালই জানা আছে। বিশেষ করে যে মেয়ে মানুষদের নিয়ে তার চাঁদের হাটের কারবার। শোকের বিলাস ঘুচিয়ে স্বাহাকেও রসের আসরে নামানো যায় কিনা সেই চেষ্টাটা সে করে দেখতে পারত। কিন্তু বাসনা রাজি হয় না। বললেই বলে, না না, ওকে জানো না, ও-ভাবে হবে না— যাক দুটো দিন।

দুটো দিন দুটো দিন করে অনেক দিনই গেল। বলাই দাসের অসহিষ্ণুতাও বাড়তেই লাগল। তাকে নিয়ে যে দিদির সঙ্গে একটা খিটির-মিটির চলছে লোকটার, স্বাহা সে আভাস পায়। তাকে দেখলেই লোকটার মুখটা রূঢ় হয়ে ওঠে কেমন। আর দিদিও এক একসময় তিক্ত হয়ে তার সামনেই ওকে বলে, আর কতকাল এভাবে কাটাবি বল তো? এত শোকের ঘটার কি হল তোর? সবাই যে বিরক্ত হয়ে উঠছে, কতদিন আর আমি তোকে এভাবে আগলাব!

আগলাতে খুব বেশি দিন হল না।

হঠাৎই একদিন আড়মোড়া দিয়ে ঘুম ভাঙল যেন স্বাহারও।

আরো মেয়ে এসেছে, আরো ঘর উঠেছে—কিন্তু ওর মত কে ? এত মেয়ে থাকতেও দিদি কেন ওকে ঠেলে নিয়ে যায় তা কি সে বোঝে না ? ও নিজে এমন ঝিমিয়ে কাটাচ্ছে কেন ! ও যদি আগুন, এই পুরুষ জাতটাকে দগ্ধাতে না পারলে কেমন আগুন সে ? এত রাগ স্বাহার আর কার ওপর ? স্বাহা জাগলে তবে তো আগুনের দাহিকা শক্তি !

সেই রাতের আসরে নতুন করে আনন্দের বান ডেকেছিল। চাঁদ ভেঙে পড়েছিল আর চাঁদনীর বৃষ্টি হয়েছিল। সূর্য হালদারের শিথিল দেহ ঘন ঘন দুলেছিল। রসিকজনের হৃৎপিণ্ডে দোলা লেগেছিল। বলাই দাসের দু'চোখ নীরব উল্লাসে চকচকিয়ে উঠেছিল। শুধু বাসনা ছাড়া আখড়ার আর সব মেয়েরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে কি নেই তাদের তাই উপলব্ধি করছিল।

গান গেয়ে স্বাহা নিজের ঘরে চলে এসেছিল। পরাণ চাটুজ্জের ওই প্রথম ঘরটায় স্বাহা একাই থাকে। বাসনা তার নতুন মানুষের সঙ্গে উঠোনের এধারে পরের ঘরটায় থাকে। স্বাহার পিছনে বাসনাও উঠে এসেছিল। ঘরে এসে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, পাগলের মত হেসেছিল হি-হি করে। আর তারপর মুখের দিকে চেয়ে তারও এক ঝলক আগুনের মতই মনে হয়েছিল স্বাহাকে।

চাঁদের হাটে জোয়ার লেগেছে। সেই জোয়ারে ডুবলে মরণ। না ডুবলে দ্বিগুণ মরণ।

স্বাহাকে এখন আর আগে ভাগে গাইতে দেয় না বাসনা। ওর গান হয়ে গেলে আর আসর জমে, না গান হয় ? বাসনা আর অন্য মেয়েরা আগে একটা দুটো পালা গেয়ে নেয়। তারপর স্বাহা আসে। আগে ভাগে এসে বসে থাকে না। সময় হলে তার ডাক পড়ে।

রসিকজনেরাও তাই চায়। আগে অন্য গান পরে স্বাহার গান। মধুরে সমাপ্তি।

বাসনাও অবাক হয় মাঝে মাঝে, এমন গান আর এমন ঢং স্বাহা শিখল কবে, শিখল কখন ! শিখেছে অবশ্য বিনয়কেষ্টর কাছে—সে-ই গানের গুরু তার। কিন্তু গানই তো সব নয়, গানের সঙ্গে ওই ভরা যৌবন যেন বেটে গুলে মিশিয়ে দিতে পারে মেয়েটা। স্বাহা গাইতে বসলে বয়সের দাবীতে একে ঠেলে ওকে সরিয়ে সকলের থেকে কাছে এসে বসেন সূর্য হালদার। দেখে হাসে সকলে, বুড়োর কাণ্ড দেখে কেউ কিছু মনে করে না। হাসে স্বাহাও। ভুরু কুঁচকে এক-একদিন যেন তারই উদ্দেশে গানের ডালি সমর্পণ করে সে :

কি ভরসায় আস হে কাছে,
না জানি মরমে কি ভাব আছে।

কি গুণ দেখিয়ে সঘনে চাও,
হাতে কি চাঁদের পরশ পাও ?

হা-হা করে হেসে ওঠে সকলে। তারিফ করে। তারপর সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করে। চাঁদের পরশের আশায় সূর্য হালদার হাত এক-একবার বাড়িয়েই ফেলেন। আবারও হাসির রোল ওঠে। স্বাহা যেন নিজের রহস্য ফাঁস করে দিয়ে নিরাশ করতে চায় তাঁকে :

আমি যাব দক্ষিণে, রব পশ্চিমে
পূর্বমুখে কথা কব গো।
আমি গোপন পীরিতি গোপনে রাখিব
কাটাব মনের সুখে গো ··

কিন্তু একলা যখন থাকে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে স্বাহা। দিদির কাছে তার জন্যে কত গোপন আবেদন নিবেদন আসে, সে টের পায়। দিদি নিজেই হাসতে হাসতে বলে। যেন কত অসম্ভব প্রস্তাব। কিন্তু সেই হাসির আড়ালে দিদির লোভের মূর্তিটা স্বাহা দেখতে পায়। তাকে উসকেও দেয় এক-একসময়, আমার কাছে পাঠিয়ে দিস, দেখব কত পয়সার মুরোদ।

দিদি ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, পয়সার দিকে কি তোর নজর আছে, পয়সা চাইলে নিজেকে সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে পারতিস এত দিনে। সে বুদ্ধি তোর থাকলে তো, আমিই শুধু ভেবে মরি।

দিদির প্রস্তাব যে আরো এগোবে স্বাহা সেটা সহজেই অনুমান করতে পারে। সে-জন্যে ভাবে না—এ যৌবনের ভোজে কেউ না কেউ তো এসেইছে, আরো কেউ আসবে, তার জন্যে ভাবনা কি। পুরুষ জাতটাকে দগ্ধাবে বলেই তো তার আসরে নামা। কিন্তু অন্যমনস্কতা সেই কারণে নয়।

সারি সারি ঘরগুলোর দিকে চেয়ে একটা অবাঞ্ছিত অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দেয় স্বাহার। গোটা পনের ঘর হয়েছে এখন। জনা পনের মেয়ে এসেছে কম করে। কিন্তু এটা কি এলাকা ? কি নাম এর ? চব্বিশ বছর বয়েস হতে চলল স্বাহার। এক অমোঘ আকর্ষণে আঠের বিশ বাইশ বছরের ছেলেগুলোও আখড়ার আশপাশে ঘুরে বেড়ায় সর্বদা। আসরের সময় বাইরে ভিড় করে। যার পয়সার জোর আছে সে ভিতরে আসে। পয়সা যার নেই সে-ও যেমন করে হোক পয়সা সংগ্রহ করে কাছে আসতে চায়।

স্বাহা দেখেছে। নিষ্পাপ চোখের পাতায় পাপের আগ্রহ দেখেছে।

এসব চিন্তা স্বাহা ঝেড়ে ফেলতে চায় মন থেকে, তবু সব-সময় পেরে ওঠে না।

ঘরের আসরে কুলোয় না এখন। ঘরে আর ক'জন ধরে? ভিড় আর ভিড়ের বিশৃঙ্খলা বাড়ছেই—বাড়ছেই। ঘর ভেঙে চাতাল করতে হল। বাইরের অর্ধেক লোকের অন্তত ভিতরে ঠাঁই হওয়া দরকার। বলাই দাসের পাকা হিসেব, পাকা পরামর্শ। বাসনা তার কথামত চলছে, চলে ঠকছে না।

আখড়ার অন্য মেয়েরা স্বাহার ধারে কাছে ঘেঁষতে ভরসা পেত না খুব। তাদের কড়া মেজাজের কর্ত্রীর এমন আদরের আর এমন গুণের বোনের দেমাক কেমন কে জানে। বেশ কিছুদিন তফাতে ছিল স্বাহা। কিন্তু শেষে সে-ই ডেকে ডেকে কথাবার্তা কইতে লাগল সকলের সঙ্গে। কোথা থেকে এলো তারা, কেমন করে এলো জানার আগ্রহ। তাদের ঘরের কথা মনের কথা শোনার আগ্রহ।

সবারই প্রায় এক অভিযোগ, তাদের পুরুষদের অত্যাচার আর অবিচার এই পথে ঠেলে দিয়েছে তাদের। কে কেমন করে ঘর ভেঙে এসেছে, কার পুরুষকে কে কতটা আক্কেল দিয়ে আসতে পেরেছে—সাগ্রহে সেই সমাচারও শুনিয়েছে তারা স্বাহাকে।

পুরুষ শত্রু, পুরুষকে পতঙ্গের মত পোড়াতে পারলে স্বাহার সব থেকে আনন্দ। প্রতি সন্ধ্যায় চাতাল ভেঙে যে পুরুষের দঙ্গল পুড়তে আসে, স্বাহা তাদের চেয়ে চেয়ে দেখে। পোড়ানোর মত্ততা দিনে দিনে বাড়ছে, দাহিকা শক্তি বাড়ছে। তবু যে-মেয়েগুলো ঘর ভেঙে এসেছে—আপন পুরুষ বর্জন করে এসেছে—তাদের কেন যে একটুও ভালো লাগে না স্বাহার, নিজেই বোঝে না। তাদের দেখলেও কেন জানি গা জ্বলে, বিতৃষ্ণায় মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করে।

এদেরই মধ্যে যে মেয়েটিকে ভালো লেগেছে স্বাহার, তার জীবন বৃত্তান্ত আবার বিপরীত। ভিতরে ভিতরে আজও সে এক পুরুষের জন্যেই কাঁদছে। নাম কমলা। মুখখানা যেমন মিষ্টি স্বভাবটিও তেমনি। গানও মন্দ করে না। স্বাহার সঙ্গে অবশ্য তুলনা হয় না, কিন্তু বাসনার পরেই গানের আসরে তার জায়গা। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস— আরো কম দেখায়।

বছর দুইয়ের একটি মেয়ে আছে। ফুটফুটে মেয়ে। সন্তান সহ এই একজনেরই এক আখড়ায় জায়গা হয়েছে। স্বাহার সঙ্গে কমলার বেশি ভাব হয়ে গেছে তার একরত্তি মেয়েটার জন্যেই। প্রায়ই মেয়েসুদ্ধ মাকে ঘরে ডেকে পাঠাতো সে।

পুরুষের ঘর ভেঙে আসার মত গর্ব করে বলার কিছু নেই কমলার। তাই ভরসা করে বলেওনি নিজে থেকে। স্বাহা কেমন করে জানি তার চাপা বেদনার দিকটা অনুমান করেছে। কথায় কথায় সে-ই সব কথা বার করে নিয়েছে।

রসিকদাসের নাতনী কমলা। মস্ত আখড়া ছিল রসিকদাসের। কত লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত, নাম শুনলে মাথা নোয়াতো। আখড়ায় অনেক লোক আসত, আর

তাদের মধ্যে অনেকেরই মন জানত কমলা। কিন্তু কমলার মনে ধরেছিল যাকে তার জাত গোত্র আলাদা। বামুনের ছেলে, বাঁশী বাজাত আর ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াত। রাত বিরেতে সেই বাঁশী শুনে মন পাগল হত কমলার। লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে এক-এক রাতে বেরিয়েও পড়ত সে।

ছেলেটাও তাকে ভালবাসত, ভালবাসার টানেই আখড়ায় আসত। কিন্তু কারো মনে সন্দেহের আঁচটি লাগেনি কোনদিন।

লাগল, কমলার এই মেয়েটা আসার সম্ভাবনা হতে। কমলা দাদুর কাছে গোপন করল না কিছু। দাদু স্তব্ধ হয়ে ভাবল দিনকতক, তারপর সেই বামুনের ছেলেকে ডেকে বলল, ঘর করার সাধ হয়েছে ভালো কথা, কিন্তু ঘর করার মুরোদ কেমন তাই আগে দেখাও। সংসারের রসদের ব্যবস্থাটি করে এসো, তারপর দু'হাত মিলিয়ে নিজে আমি নাতনীকে তোমার ঘরে দিয়ে আসব। ততদিন ও আমার জিম্মায় থাকুক। কিন্তু তার আগে আর এমুখো হয়ো না।

দাদু বুঝেছিল সে চোখ বুজলেই আর আখড়া থাকবে না। সেই জন্যই ও-রকম বলেছিল মনে হয়। বামুনের ছেলে রসদ সংগ্রহের আশায় শহরে চলে গেল। কমলাকে বলে গেল, ঘর করেই ঘরণী নিয়ে যাবে।

কিন্তু দাদুর আর তার নাতনীকে সেই ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল না, দু'হাত মেলানও হল না। তার আগেই চোখ বুজল সে, আর তার ক'দিনের মধ্যেই আখড়া ভেঙে ছত্রখান। কমলাকে আশ্রয় দিল আর খেতে পরতে দিল বলাই দাস। কোথা থেকে কেমন করে এসে উদয় হল সে, কমলা আজও ভালো করে জানে না। সদ্যজাত এই শিশু নিয়ে দিন চলা ভার হচ্ছিল। বলাই দাস তাকে এখানে সেখানে গান গাইতে নিয়ে যেত, টাকা দিত। কমলা একা নয়, আরো ক'টি মেয়ের ওপর কর্তৃত্ব করত বলাই দাস।

তারপর সেই বামুনের ছেলে একদিন সত্যিই এসেছিল। ঘরের রসদ সংগ্রহ করেই এসেছিল। কিন্তু বলাই দাস তাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছে। কমলাও যেতে চায়নি প্রথম। কি করে চাইবে? কোন্ মুখে চাইবে? ছলনা যে বোঝে না তার সঙ্গে ও ছলনা করবে কেমন করে?

রাতে আবার বাঁশী বাজতে শুরু করেছিল। আরো করুণ, আরো বিষাদে ভরা। শুনে কমলা পাগল হ'ত, ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্যে বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যেত। তবু যেতে পারেনি। কিন্তু একদুপুরে বামুনের ছেলেই এসেছিল আবার। কেন সাড়া দেয়নি কমলা সে বুঝেছিল। বুঝেও ডেকেছিল। বলেছিল, ঝড় উঠলে ফুলের গায়ে কাদা লাগবেই তো। কত বড় ঝড় গেল, কাদা একটু-আধটু লাগলেই বা। বলেছিল, এসো, আবার আমরা ঘর বাঁধি—সব কাদা ধুয়ে মুছে দেব।

বলাই দাসের দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল কমলা, তার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল। কি ভুল কি ভুল—কেন যে মেয়ে নিয়ে তক্ষুনি পালিয়ে গেল না কমলা, কেন যে অনুমতির দরকার হল তার। আর তো পালাবার সুযোগ পেল না সে। বামুনের ছেলেকে কেমন করে গাঁ-ছাড়া করলো বলাই দাস—তাও জানে না। কমলা অনেকবার চেষ্টা করেছে পালিয়ে যেতে, অবাধ্য হয়েছে বলাই দাসের। তার সাজাও পেয়েছে। পিঠের কাপড় সরিয়ে স্বাহাকে দেখিয়েছে সে। গোটাকতক শুকনো বীভৎস পোড়া দাগ দেখে স্বাহা শিউরে উঠেছিল।

এখানে এই নতুন আখড়ার তোড়জোড় হতে কমলা আশা করেছিল, এবারে হয়ত সে ছাড়া পাবে—মেয়ে সুদ্ধু এখানে হয়ত তার স্থান হবে না। এবারে হয়ত সে আবার সেই বামুনের ছেলের সন্ধানে বেরুতে পারবে। কারণ, কোথাও না কোথাও রাতের গভীরে আজও সে বাঁশী ডাকছেই তাকে। সেই বাঁশী যে কমলা ঘুমের মধ্যেও শোনে।

কিন্তু তাও হল না। মেয়ে সুদ্ধুই এখানে টেনে আনা হল তাকে। কেন আনা হল মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কমলা বুঝতে পারে এখন। ওটা মেয়ে বলে, ভবিষ্যতের আশা বলে। ছেলে হলে হয়ত ছাড়ান পেত। কমলার এক একসময় ইচ্ছে হয় মেয়েটার গলা টিপে মেরে রাখতে।

শোনার পর ক'টা রাত ঘুমুতে পারেনি স্বাহা। অস্থির যাতনায় ছটফট করেছে। দু'বছরের ফুলের মত মেয়েটার দিকে চোখ পড়লেই চোখে যেন কাঁটা বিঁধেছে তার। আবারও মনে হয়েছে, এই জায়গাটার নাম কি, লোকে কি বলে একে? পরাণ চাটুজ্জের ভিটে বলে না পরাণ চাটুজ্জের আখড়া বলে? নাকি আর কিছু বলে?

বলাই দাসের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছে হয়েছে কতবার। কিন্তু লোকটার ত্রাসে মেয়েগুলো সব কাঁপে। কমলা তার দু'হাত ধরে কি কাতর অনুনয়ই না করে গেছে, বলাই দাস যেন না শোনে, কর্ত্রী বাসনা যেন না শোনে। তাহলে তার পিঠের পোড়া ঘা আবার দগদগিয়ে উঠবে।

কিন্তু বলাই দাসের সঙ্গে স্বাহার নিজেরই যে একটা বোঝাপড়ার সময় ঘনিয়েছে জানত না। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করেই এক আধদিন আসরে অনুপস্থিত থাকত স্বাহা। যদিও খুব কম, কিন্তু তাতেই আগুন চড়ত বলাই দাসের মাথায়। এ-রকম অনিয়ম সে বরদাস্ত করতে চাইত না। বলতে গেলে আসরই মাটি সেদিন। ছেলে ছোকরাগুলো সেদিন আর চাতালের দিকে না ঘেঁষে এদিকেই ঘুরঘুর করত—যত রাত পর্যন্ত স্বাহার ঘরে আলো জ্বলে ততো রাত পর্যন্ত।

আসরের সব থেকে সেরা আকর্ষণ যে মেয়ে, তাকেই যে সব থেকে বেশি শাসনে

রাখা দরকার, বাসনাকে সেটা সে কিছুতে বুঝিয়ে উঠতে পারল না। বুঝলেও ভরসা করে শাসন ফলাতে দিতে রাজি হত না সে। কি জানি একটা অজ্ঞাত ভয় তার।

কিন্তু বলাই দাসের মাথায় আগুন জ্বলার আরো একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শহর থেকে অনেক হোমরাচোমরা রসিক ব্যক্তিও ওই এক মেয়ের গানের টানে আখড়ায় আসছে ইদানীং। তাদের অনেকেই অনেক রকম টোপ ফেলেছে বলাই দাসের সামনে। হাত থাকলে বলাই দাস সব-ক'টা টোপই গিলত। হাত নেই বলেই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সম্প্রতি এদেরই একজন একেবারে সোনার টোপ ফেলেছে তার সামনে। সপ্তাহে মাত্র একটা রাত কোনো বাগান বাড়িতে গানের বায়না নিতে হবে স্বাহাকে—তার বিনিময়ে যে টাকার অঙ্কটা নাচিয়ে দেওয়া হল তার চোখের সামনে—বলাই দাসের মাথা ঘুরে যাওয়ার দাখিল।

শুনে বাসনারও লোভের অন্ত নেই। বলাই দাসের তাড়া খেয়ে অনেকভাবেই সে প্রস্তাবটা করেছে বোনের কাছে, এমন কি সে নিজে সঙ্গে থাকবে সেই আশ্বাসও দিয়েছে। স্বাহা নেচে উঠেছে, যেন তক্ষুনি যাবে—কানে আঙুল দেবার মত অশ্লীল ঠাট্টা করেছে। কিন্তু বেশি তাগিদ দিলেও আবার দ্বিগুণ রেগেছে। সেই রাগের মুখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এত মনের জোর বাসনার নেই।

বলাই দাসের অসহ্য হওয়ারই কথা। এমন অবুঝকে এভাবে প্রশ্রয় দিলে কেমন লাগে? জ্বালার ওপর জ্বালা—দেমাকির দেমাকের জন্যেই এর ওপর আবার ছোট দারোগা মশাইয়ের শাসানি। কেদারও নিয়মিত আগন্তুক আসরের। দারোগা বলে বিশেষ যত্ন আত্তিই করে বলাই দাস। আর ছেলেবেলার সঙ্গীর সুতো আঁকড়ে তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক রাখার চেষ্টা বাসনারও। কিন্তু যার জন্যে আসা তারই আর পাত্তা নেই একটুও।

স্বাহা ফিরেও তাকায় না কেদারের দিকে। তাকে দেখলে অন্যের সঙ্গে একটু বেশি ফষ্টি-নষ্টি করে বরং। কথা আছে বলে কতদিন স্বাহার ঘরে এসে বসতে চেষ্টা করেছে কেদার দারোগা—কিন্তু প্রতিবারই স্বাহা তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কেদার দারোগা আড়ালে বলাই দাসকে ডেকে শাসিয়েছে, এমন হলে সে-ও চুপ করে থাকবে না—অনাচারের দায়ে আখড়া ঝাঁজরা করে দিতে তার সাত দিনও লাগবে না।

বলাই দাসকে সঙ্গে করেই বোনকে বোঝাতে এসেছিল বাসনা। শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাহার দুচোখ ধকধকিয়ে উঠেছে। তারপর আবার ঠাণ্ডা হয়েছে সে। ঠাণ্ডা হয়ে ওদের মুখের ওপরেও সশব্দে দরজা বন্ধ করেছে।

আর ওর এই দুঃসাহসের জন্য বলাই দাস বাসনাকেই দায়ী করেছে। রাগে গোটা মুখ কালীবর্ণ হয়েছে তার। বাসনার দুর্বলতার জন্যেই যে আখড়া উঠবে একদিন দাঁত কড়মড়িয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে।

অথচ, তার ওপর নির্ভর করলে সাত দিনের মধ্যে ভবিষ্যত নিরঙ্কুশ করে দিতে পারে বলাই দাস।

করতেও হল নির্ভর।

কিন্তু তার আগে বিচিত্র এক অঘটন ঘটে গেল চুনি-গাঁয়ে। চুনি-গাঁয়ের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল যেন।

এক সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই চুনি-গাঁয়ের ছেলে বুড়ো এমন কি ঘরের স্ত্রীলোকেরাও হকচকিয়ে গেল একেবারে। শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাবার মতই খবর।

সরস্বতীর চড়ায় একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

সেই মৃতদেহ কেদার দারোগার।

তার পরনে পুলিসের পোশাক। হাতের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রটাও পড়েছিল। আঘাতে আঘাতে কেউ তার মাথার খুলি চৌচির করে দিয়ে গেছে।

ক'টা দিন সমস্ত গাঁ তোলপাড় করল পুলিশ। ভয়ে জড়সড় সবাই। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়। কেউ ভেবে পেল না কার এমন দুঃসাহস হতে পারে, কার এত বুকের পাটা।

নিজের ঘরে বসে স্বাহাও শুনল সব। শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে-ও। বুঝতে সময় লেগেছে; ভাবতে সময় লেগেছে। তারপর হেসেছে। নিজের ঘরে একলা বসে বেদম হেসেছে। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার দাখিল। এত হাসি স্বাহা আর জীবনে হাসেনি।

তারপর প্রতীক্ষা করেছে কার। উদ্‌গ্রীব, কিন্তু চাপা প্রতীক্ষা। রাতে ঘুমের মধ্যেও ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে এক-একদিন। কেউ বুঝি ফিস ফিস গলায় ডাকছে তাকে, সন্তর্পণে দরজা ঠেলছে।

কেউ এলো না। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আসরে অনুপস্থিত সে। বাসনা তিনবার করে এসে খবর নিয়ে যায়, কি হল। স্বাহা বলে শরীর ভালো না। বলাই দাস চোখ লাল করে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু তার কাছে জবাবদিহি করার কোনো অভিরুচি নেই স্বাহার। সে ঘর থেকেই বেরোয় না।

শরীর অসুস্থ কেউ সেটা বিশ্বাস করে না। করার কথাও নয়। কিন্তু কি যে হয়েছে স্বাহা নিজেও ভালো করে বুঝে ওঠে না। কার পদার্পণ আশা করছে এখনো। কিন্তু নিস্পৃহতা সে কারণেও নয়। একজনের মর্মন্তুদ মৃত্যু-সংবাদ কানে

আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিনের সঞ্চিত একটা জিঘাংসু দাহ বেশ খানিকটা জুড়িয়ে গেছে যেন। পুরুষ জাতটাকে পতঙ্গের মত দগ্ধ করার আগুনও তেমন আর বুকের তলায় ধিকি ধিকি জ্বলছে না।

সন্ধ্যা না হতে ছেলে ছোকরাগুলো চাতাল ছেড়ে ওর ঘরের দিকটায় ঘুরঘুর করে আবার। ক'টা দিনের অদর্শনে তাদের ছটফটানি শুরু হয়েছে। এদিকে বলাই দাসের মুখের অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কেদার দারোগার ভয় চিরকালের মত ঘুচে গেছে, ফলে লোভের ইশারা আরো জলজলে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওদিকে সেই সোনার টোপ প্রায় হাত-ছাড়া হওয়ার দাখিল। তাছাড়াও কতজনের কত ইশারা। কিন্তু বলাই দাস বাইরের দিকে তাকাবে কি, ঘরের আসরই মাটি।

না, বাসনারও আর লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা রাখার শক্তি নেই। ইদানীং সে-ও একটু-আধটু ভয়ই করে বলাই দাসকে। সে কর্ত্রী হলেও আসল কর্তৃত্বটা কেমন করে আস্তে আস্তে যেন বলাই দাসের হাতে চলে গেছে। বাসনার সেটা কাম্য নয়। কিন্তু তার তুলনায় লোকটা অনেক বেশী প্রবল। তাছাড়া যা বলছে সে-ও ঠিক কিনা বুঝছে না, মেয়েটা যখন তখন এমন মর্জির ওপরে চললে চলে কি করে। তার ভালোর জন্যেই একটু কঠিন হওয়া দরকার বোধ হয়।

দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল তখন। চাতালের ওধারে অন্য মেয়েদের দিকে ছিল বাসনা। বলাই দাস কখন স্বাহার ঘরের দাওয়ায় এসে উঠেছে টের পায়নি। স্বাহা অন্যমনস্কের মত চুল আঁচড়াচ্ছিল বসে। ঘরের মধ্যে বলাই দাসকে দেখে ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখামাত্র দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠল।

রমণীর প্রসাধন দেখতে আসেনি বলাই দাস, রাগ অনুরাগও দেখতে আসেনি। নির্লিপ্ত মুখে কৈফিয়ত তলব করল, আসর কামাই যাচ্ছে কেন?

স্বাহার মুখে তপ্ত রক্ত উঠে এলো এক ঝলক। চিরুনি-সুদ্ধ হাত বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে দিল।—বাইরে। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বল।

তার দিকে চোখ রেখেই পিছনের দরজা দুটো ঠেলে দিল বলাই দাস। তারপর বলল, এখানে আমার ব্যবস্থাই আইন—সেটা জানাতে এলাম—একবার জানলেই সেটা সকলের মনে থাকে।

রাগে সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল স্বাহার, এগিয়ে এসে প্রায় চিৎকার করে উঠল, তুমি বেরুবে কিনা ঘর থেকে জানতে চাই—

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা লোহার খণ্ড তার একটা গালের ওপরকার চামড়া তুলে নিয়ে গেল যেন। তিন হাত দূরে ছিটকে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল স্বাহা। গালের ওপর আঙুলের দাগগুলো টকটকে লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠল। স্বাহার চোখের সামনে অন্ধকার সব।

বলাই দাসের অনুশাসনের রীতি আলাদা। যেটুকু করা দরকার করে, কর্তব্যের মত করে যায়। তবে গালে মুখে এ-রকম অনুশাসনের দাগ ফেলে না বড়। তাতে তার বেসাতের ক্ষতি। দুর্জয় ক্রোধেই মুখের ওপর আঘাত করে বসেছিল। স্বাহার চোখের অন্ধকার কেটে যাবার আগেই এগিয়ে এসে সাঁড়াশীর মত বাঁ হাতটা দিয়ে তার একখানা বাহু ধরল, অন্য হাতটা খানিকটা চুলসুদ্ধ স্বাহার কপালে। তারপর বার চারেক তার মাথার পিছন দিকটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিল।

ঘরের পুরনো দেয়াল কেঁপে কেঁপে উঠল, চাপড়া চাপড়া মাটি খসে পড়ল। তিন গুণ, দশ গুণ অন্ধকার। হাঁটু দুটো আপনিই ভেঙে গেল। দেয়াল ঘষটেই মাটিতে বসে পড়ল সে। ঘরটা দুলছে, সামনের লোকটা দুলছে, খাট পালঙ্ক দরজা মাটি সব ওলট-পালট হয়ে যচ্ছে।

কতক্ষণ বাদে চোখ মেলেছে জানে না। সামনে বলাই দাস দাঁড়িয়ে।

—আর দরকার হবে ?

আঘাত বড় হলে অনুভূতি কমে আসে। স্বাহা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। নিজের অগোচরে মাথা নাড়ল। আর দরকার হবে না।

বলাই দাস চলে গেল।

আধ-ঘণ্টা বাদে বাসনা এলো হন্তদন্ত হয়ে। অনুশাসনের আভাস পেয়েই ছুটে এসেছে।

স্বাহা মেঝেতে বসে তেমনি। সমস্ত মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটাও মাটি নিতে চাইছে। তবু বসেই আছে। এখনো গোলমেলে লাগছে সব কিছু।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাছে এসে তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল বাসনা।—কি রে, মারধর করেছে নাকি তোকে, অ্যাঁ ? গালের ওপর চোখ পড়তে চমকে উঠল, কি সর্বনাশ ! তাড়াতাড়ি উঠে ঘটিতে জল এনে চোখে মুখে জলের ছিটে দিল। জল দিয়ে ঘষে ঘষে গালের আঙুলের দাগ মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে, লোকটাকে যে সে মজা বুঝিয়ে ছাড়বে, আচ্ছা করে ধমকে দেবে, সেই সান্ত্বনাও দিল। শেষে খেদ, আর তুই-ই বা যখন-তখন এমন অবাধ্য হোস কেন বোন বল্ তো !

স্বাহা নির্বাক।

ঘুরে ফিরে আরো বার দুই-তিন এলো গেলো বাসনা। অনেক সান্ত্বনা দিল, অনেক গায়ে পিঠে হাত বোলালো। স্বাহার মুখে একটি কথা নেই।

সন্ধ্যার মুখে আর একবার এলো বাসনা। ঘরে আলো জেলে মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল, আসরে যাবি না ?

দিদির শঙ্কা-মেশানো দুরবস্থা দেখেই যেন এবারে স্বাহা হঠাৎ হাসল একটু। ঘাড়

ফিরিয়ে দেয়ালের চাপড়াগুলো দেখল—ওকেও দেখালো। বলল, তোর নতুন মানুষের আইন বড় কড়া আইন, আমার মাথা ঠুকে ঠুকে এগুলো ভেঙেছে।

বাসনার দুই চোখ বিস্ফারিত। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

স্বাহা আবার বলল, যাব, দুটো দিন যাক, মাথার ঘিলুগুলো নড়েচড়ে গেছে—ঠিক হোক।

থাক্ থাক্, দুটো দিন থাক। বাসনা প্রস্থান করে বাঁচল। দাওয়ার ওধারে ছেলে-ছোকরারা উন্মুখ, আসরের ভাগ্যবতী তারকাটি আজও আসবে কি আসবে না, গাইবে কি গাইবে না? বাসনা তাদের আশ্বাস দিল, ওর শরীরটা এখনো খারাপ যাচ্ছে, আর মাত্র দুটো দিন সবুর করো সব।

বলাই দাসের সামনাসামনি হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, আসবে না?

বাসনা হঠাৎ রেগেই গেল একটু।—কি ডাকাতে কাণ্ড করেছ তুমি অ্যাঁ?

বলাই দাস ধমকে উঠল, আসবে কি আসবে না?

বাসনা থতমত খেল। তারপর হাসি টেনে বলল, আসবে গো আসবে—প্রাণের মায়া থাকলে না এসে করবে কি? দুটো দিন সবুর করো, বলছে মাথার ঘিলু নড়েচড়ে গেছে—দুটো দিন চুপ করে থাকো, লক্ষ্মীটি—

বলাই দাস হাসল। ওষুধে যে কাজ হয়েছে বাসনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো গেল। বাসনা দেখলও বটে। বলাই দাস আসর তদারকে চলে গেল। বাসনা অন্যমনস্ক একটু। বোনের মতিগতি এবারে ফিরবে ভেবে হয়ত নিশ্চিত একটু। কিন্তু দরকার হলে বলাই দাসের ওই ওষুধটা যে তার ওপরেও এসে পড়বে, আজ সে সম্ভাবনাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সেই সন্ধ্যাতেই দৃষ্টি-পিপাসু অনুরাগী স্তাবকেরা স্বাহার দেখা পেয়েছিল। সে-খবর বাসনাও রাখে না, বলাই দাসও না।

সেদিন গেল। পরদিন গেল। তার পরদিনের বিকেল।

সরস্বতীর দিক থেকে একটা হৈ-চৈ গোলমাল ক্রমশ ভিটের দিকে এগিয়ে আসছে। স্বাহা নিজের ঘরে বসে। থমথমে গম্ভীর। চোখে পলক পড়ে না।

গোলমালটা একেবারে ভিটের কাছে এসে থামল। দূরে দূরে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, অবাক বিস্ময়ে দেখছে কি ব্যাপার। ভিটের মেয়েরা সব চোখ কপালে তুলে চাতালের দিকটায় এসে ভেঙে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে তারা। কম করে পঞ্চাশ-ষাট জন নানা বয়সের ছেলে যে লোকটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মৃতদেহের মত বহন করে নিয়ে আসছে—তাকে চেনা যায় না।

ঘরের মধ্যে স্বাহা পাথরের মূর্তির মত বসে।

বাসনা ত্রাসে আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।—ওলো সর্বনাশী, কি করেছিস তুই? ওরা মেরে ফেললে নাকি লোকটাকে!

স্বাহা বসে আছে স্থির শিখার মত। নড়লও না, উঠলও না। মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ, মেরে ফেলেনি বা ফেলবে না।

সাত-আটটি যোয়ান ছোকরা কাঁধের থেকে কাঠের বোঝা ফেলার মত ঘরের মধ্যে স্বাহার পায়ের কাছে দড়াম করে ফেললে বলাই দাসকে। মাটির সঙ্গে কপাল ঠুকে ঢপ করে শব্দ হল একটা। বাসনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

মেরে না ফেললেও প্রায় আধ-মরা করে আনা হয়েছে তাকে। পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত দড়ির বাঁধন মাংসল দেহে কেটে কেটে বসে গেছে। নাক মুখ চোখ আলাদা করে ভালো দেখা যায় না, সরস্বতীর কাদায় থেঁতলানো হয়েছে তাকে।

স্বাহা বিজয়িনীর মতই উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। মূর্তিটা দেখল খানিক। তারপর দরজার কাছে এসে ভক্তদের আদেশ দিল, তোমরা যাও এখন, সন্ধ্যায় এসো—আজ আসর হবে।

লোকটাকে এভাবে ওখানে ফেলে রেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাদের। কিন্তু এ আদেশও অমান্য করার নয় যেন। আঙিনার বাইরে দূরে দূরে অপেক্ষা করতে লাগল তারা।

স্বাহা বলাই দাসের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা নির্জীব নয় আদৌ। এতখানির পরেও জ্ঞান আছে। কিন্তু নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। দুই চোখে বাঁধন খুলে দেবার আর্ত আকুতি।

স্বাহা দেখল। আপাদমস্তক দেখল। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, এখানে কার আইন চলবে বলে মনে হয়, তোমার না আমার?

মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছে বলাই দাস। এখনো সামনে জলজলে মৃত্যু দেখছে যেন। ত্রাস-ভরা দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। ওধারে বাসনাও নিস্পন্দ কাঠ।

দেয়ালের তাক থেকে বড় একটা ছুরি নিয়ে এলো স্বাহা। ওই ছুরি লোকটার বুকে আমূল বিদ্ধ করাও একেবারে অসম্ভব নয় বুঝি। করলেও বাধা দেবার শক্তি নেই কারো।

একটা একটা করে বাঁধন কেটে দিল স্বাহা। গায়ের মাংস আলাদা হয়ে গেছে। হাত-পা নাড়ারও শক্তি নেই বলাই দাসের। হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গেছে যেন। সম্বিত ফিরতে বাসনা তাড়াতাড়ি এসে আঁচলে মুখ মুছে দিয়ে টেনে বসাতে চেষ্টা করল তাকে। পারা গেল না।

স্বাহা দেখছে। বলল, দিদির হাত-তোলা নতুন মানুষ হয়ে থাকতে পারো এখানে

—তার বেশি এগোলে এরপর ওরা আর বেঁধে-ছেঁদে এখানে নিয়ে আসবে না তোমাকে।

দোড়-গোড়ায় দাঁড়িয়ে অদূরে প্রতীক্ষারত ভক্তদের ইশারায় ডাকল কয়েকজনকে। তারা দৌড়ে আসতে হুকুম করল, ধরাধরি করে ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো—

সানন্দে আদেশ পালন করল তারা। ভীতি-বিমূঢ় যন্ত্রণা-কাতর বলাই দাসকে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পিছনে বাসনাও চলল। মার দেখে আর লোকটার প্রাণান্তকর দুর্দশা দেখে বিষম হকচকিয়ে গেছে সে। কদিন লাগবে সামলে উঠতে কে জানে। এমন হেনস্থাও মানুষ মানুষের করে। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল বাসনার সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই সঙ্গে একটু আনন্দও হচ্ছিল কেন জানি।

একটু বাদে কমলাকে ডেকে পাঠিয়েছে স্বাহা। মেয়ে কোলে করে ভয়ে ভয়ে কমলা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়ায় এমন কাণ্ডও যে সম্ভব সে ভাবতে পারে না।

স্বাহা বলল, তোর সেই বামুনের ছেলের খোঁজ যদি পাস—দেখ। আর তোকে কেউ আটকে রাখবে না।

কমলা চোখ বড় বড় করে শুনেছে। তারপর নিঃশব্দেই প্রস্থান করেছে। আজ অন্তত এই মেয়ের সামনে বসে আলাপচারির সাহস নেই।

সন্ধ্যার পর আসর বসেছে। জমাটি আসর। স্বাহা যেন এই ক'টা দিনের খেদ ভোলাতে বসেছিল সকলের। রূপ-রসিক আর হৃদয়-রসিক সুজনের কাছে তুলে তুলে সুরের সপ্ত-পথে মরমের মর্ম-কথাটি বিস্তার করছিল সে—আগে জানলে সে কদমতলায় যেত না। কালা অবলা রমণী ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে জানলে কিছুতে সে কদমতলায় যেত না। সেই ফাঁদের লোভে প্রাণ-পাখি আবার নেচে-নেচেও ওঠে যে! ওই প্রাণ-পাখির আজ নিশ্চিত মরণ, ফাঁদে পড়লেও মরণ, না পড়লেও মরণ। ওর ইচ্ছে নেই—কিন্তু প্রাণ-পাখি যে না-ছোড়, সে খালি বলছে, মরতেই যখন হবে কালার হাতেই প্রাণটা দেওয়া ভালো।

আসর মাতোয়ারা। অদূরে বসে গালে হাত দিয়ে বাসনা বোনকে দেখছে আর অবাক হচ্ছে। এই স্বাহাকেই খানিক আগে ঘরে দেখে এসেছিল।

কমলাও তাই ভাবছিল বোধহয়।

দশ

এক সন্ধ্যায়।

আসর বসেছে। স্বাহার দেখা নেই। সকলের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। কমলা গাইছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু আর একজনের আসার সময় উতরে যাচ্ছে দেখে সেই গানে কারো চোখ-মন বসছে না। সূর্য হালদারের ইচ্ছে, বাসনা আর একবার উঠে গিয়ে স্বাহাকে ডেকে নিয়ে আসে। আগে বলাই দাসের চোখ লাল হত, কিন্তু এখন যাই হোক, বাইরে থেকে একটুও বোঝা যায় না। এখানে কার আইন চলবে সেটা সে জন্মের শোধ বুঝে নিয়েছে।

বোনকে ডেকে আনার জন্য বাসনা উঠি উঠি করছিল। তার আগেই স্বাহা এলো।

পরনে পলাশ-রাঙা শাড়ি। আগুনে আগুন। কিন্তু স্বাহার মুখখানা গম্ভীর গম্ভীর দেখাচ্ছে কেমন। আসরে বসেও উসখুস করছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বহুজোড়া সতৃষ্ণ চোখ যে তারই তনু-বন্দনায় রত, রোজকার মত তাও খেয়াল নেই।

বাসনাই একফাঁকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে রে তোর ?

শরীর ভালো লাগছে না, মাথা ধরেছে। আমি ঘরে যাব এক্ষুনি।

বাসনা বাধা দেবার আগেই উঠে দাঁড়াল। একটি পয়সাঅলা ভিনগাঁয়ের বাবু ছোকরাকে ইশারায় আসতে বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ছেলেটা অনেকদিন ধরেই কাছে আসতে চেষ্টা করছে জানে। বাসনাও জানে। সকলের আশায় ছাই দিয়ে এভাবে উঠে পড়া কেন! আর, সকলের মাঝ থেকে ওই ছেলেটাকে ডেকে নেওয়া কেন ? এ আবার কেমন ধারা শরীর খারাপ! বাসনার খুশি হবার কথা, কিন্তু সভা-জনের মধ্যে এমন বেপরোয়া বেহায়াপনাটাও চক্ষুলজ্জার কারণ।

তিন-চারটে ঘর পেরিয়ে তরতরিয়ে স্বাহা নিজের ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। ছেলেটিরও বিড়ম্বিত উত্তেজনা কম নয়, হৃৎপিণ্ডটা হাতে করেই যেন পিছন পিছন এলো।

একটুও ভণিতা না করে স্বাহা বলল, তুমি নাগরটি তো বড় ভালো শুনেছি, একটু উপকার করবে ?

ছেলেটা হতভম্ব। দুচোখে নির্বাক প্রশ্ন।

একজন ভালো কবিরাজ ধরে নিয়ে এসো দেখি। এক্ষুনি। যেখান থেকে পারো,

যত ভালো পারো—যত টাকা চায় দেব। শিগ্‌গীর যাও, তোমার উপকার ভুলব না, দেরি কোরো না—

কাঁধে হাত দিয়ে ছেলেটাকে এক-রকম ঠেলেই দিল সে। অবাক বিস্ময়ে ছেলেটা অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেল।

স্বাহা দাঁড়ালো একটু। বড় করে দম নিল একটা। ঘরের দিকে তাকালো। ঘরে আলো জ্বলছে। আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ঘরের শয্যায় বিবর্ণ, মৃতপ্রায় একটি লোক শয়ান।

নন্দ।

আজই সন্ধ্যার আবছায়ে ডুলিতে চেপে এসেছে। ডুলির বাহকরাই তাকে ধরাধরি করে ভিতরে দিয়ে গেছে। স্বাহা একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। নিস্পন্দ কাঠ সে। মৃত্যুর থেকেও মর্মান্তিক এমন জীবন্ত মানুষ আর দেখেনি। উরু থেকে একটা গোটা পা পচে গেছে, সেই দুর্গন্ধও নাকে আসছিল।

যা বলার নন্দই বলেছে। বিকারগ্রস্তের মত কাঁদতে কাঁদতে বলেছে। কেদারের একটা গুলি উরুতে লেগেছিল। পুলিসের ভয়ে যে-চিকিৎসা দরকার ছিল, তা হয়নি। গোপনে যেটুকু করা সম্ভব তাই করেছিল। তাতে ফল হয়নি। পচন ধরেছে শেষ পর্যন্ত। একটু একটু করে গোটা পাটা পচে গেছে। গোটা দেহে তার বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবারে তার যাবার সময় ঘনিয়েছে বুঝতে পেরেছে, তাই একবারটি দেখতে এসেছে স্বাহাকে। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই জানে, তবু এই শেষ সময়ে না এসে পারেনি। একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছে। তার জন্য অনন্ত নরক অপেক্ষা করছে, কিন্তু স্বাহা কি ওকে কোনো একদিন ক্ষমা করবে? কোনো একদিন বিশ্বাস করবে, ওকে পাবার জন্য পাগল হয়ে এমন নারকীয় কাজ করেছিল সে? কোনদিন আর কোনো মেয়েকে এমন করে চায়নি সে—বিশ্বাস করবে স্বাহা?

স্বাহা জবাব দেয়নি। তড়িতাহতার মত দাঁড়িয়ে ছিল শুধু, চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এমন কান্নাও কাঁদতে পারে মানুষ, এত জলও থাকে চোখে? নির্বাক মূর্তির মত স্বাহা শুধু দেখেছে আর দেখেছে।

অনেকক্ষণ বাদে একটু শান্ত হয়ে নন্দ বলেছে, এবারে আমি যাই, আর আমি তোকে জ্বালাতে আসব না—পালকি বেহারাদের একটু ডেকে দে, আমাকে তুলে নিয়ে যাক।

স্বাহার হুঁস ফিরেছে তখন। কিছু না বলে বাইরে এসে পালকি বাহকদের বিদায় করে এসেছে।

বাসনা বোনের খবর করতে এলো ঘণ্টা তিনেক বাদে। কবিরাজ ততক্ষণে রোগী দেখে মুখ বিকৃত করে বিদায় নিয়ে গেছে। নন্দ আধা বেহুঁস তখন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই নাকে কাপড় চাপা দিয়েছে বাসনা। তারপর শয্যায় নন্দকে দেখেছে। এক নজরে চিনতে পারেনি। দিশা ফিরে পেয়ে একসময় বাইরে টেনে নিয়ে এসেছে স্বাহাকে। চাপা ঝাঁঝে জিজ্ঞাসা করেছে, ও এলো কোত্থেকে? এলো কেন? কি হয়েছে?

শান্তমুখে স্বাহা দু'কথায় বলল কি হয়েছে।

বোনের নির্বুদ্ধিতা দেখে রাগে গড়গড়িয়ে উঠল বাসনা, এই পচা ঘেয়ো মরা রোগীকে তুই ঘরে রাখবি এখন?

স্বাহা ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরলে পরে আর রাখব না, দুটো দিন সবুর কর, বেশি দেরি নেই।

ভাবগতিক সুবিধের নয় দেখে রাগ চেপে বাসনা অন্য রাস্তা ধরল।—এতবড় সর্বনাশ করেছে তোর, তারপরেও তুই ওকে ঘরে রাখবি, তাড়িয়ে দিবি না?

স্বাহা নির্বিকার জবাব দিল এবারও, সর্বনাশ করেছে বলে তোর তো অখুশির কারণ দেখি না। সর্বনাশ করেছে বলেই রাখব, চোখের সামনে একটু একটু করে মরতে দেখব।

বাসনা আর কিছু বলেনি। বলার কি-ই বা আছে।

নেভার আগে প্রদীপ-শিখার মতই বুকের ভিতরে জীবন শিখাটুকু জ্বলে উঠেছিল নন্দর। সেই আলোয় সে স্বাহাকে দেখেছে। দেখেছে আর পাগলের মত প্রলাপ বকেছে। দেখেছে আর অসহায় শিশুর মত কেঁদেছে। স্বাহা তার সেবা করতে গেছে, নন্দ শিউরে উঠেছে। স্বাহা হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে, আর্তত্রাসে নন্দ দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। এত ক্ষমাসুন্দর মূর্তি যদি না দেখত, তাহলেও বোধহয় নন্দ শান্তি পেত একটু।

দু'দিনের মধ্যেই এলাকার সব ঘরেই জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা। এ-রকম একটা রোগীকে নিয়ে স্বাহার প্রেমের পাগলামি দেখে তারা বিস্মিত, বিভ্রান্ত। এক বাসনা ছাড়া মুখে কেউ কিছু বলতেও সাহস পায় না। স্বাহাকে বাইরে ডেকে সে অনেক বুঝিয়েছে, বলেছে রাতের গানের আসরও কামাই করলে চলে কি করে।

জবাব না দিয়ে স্বাহা হেসেছে মিষ্টি।

রাগ ছেড়ে বাসনা টিপ্পনী কেটেছে, এ যে দেখি অবাক প্রেম রে তোর, কিন্তু প্রেম দিদি শেষে এই পাত্রে! সবাই যে এ-কথাই বলাবলি করছে!

জবাবে স্বাহা হাসিমুখে গুন্‌গুনিয়ে উঠেছিল :

সখি বলেছিল, পিরীতি সুখের হবে গো

আমি অমিয় কিনিয়া গরল খেলাম গো··· ।

বাসনা রাগ করে বলেছে, মর তুই মুখপুড়ী, গরলই খেয়েছিস ।

নন্দর বিকৃত উত্তেজনা আর আত্মনিগ্রহ বাড়ছে ক্রমশ। দিবারাত্র চোখের সামনে নরক দেখে সে। সেই নরকের কথাই স্বাহাকে বলে। বলে আর কাঁদে। আজন্ম সংস্কারবদ্ধ কল্পিত নরকের বিভীষিকা চোখের সামনে ভাসে তার, সেই নরক-নিপীড়নের ত্রাসে আর্তনাদ করে ওঠে থেকে থেকে। ভীত চকিত ব্যাকুলতায় স্বাহাকে ছ'হাতে আঁকড়ে ধরে, এক-একসময়। ভয়ের তরাসে শিশু যেমন করে মাকে আঁকড়ে ধরে, তেমনি।

স্বাহা তাও দেখে চেয়ে চেয়ে। সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টাও বৃথা। স্বাহা কিছুই বলতে পারে না। চুপ করে থাকে। দেখে।

কিন্তু সেদিন আর দেখল না। বলল। শান্ত ধমকের সুরেই বলল, কি আবোল-তাবোল বকছ, তোমার নরক হতে যাবে কেন, নরক তো হবে আমার। উচিত কাজ করলে কারো নরক ভোগ হয় ?

কথাটা এমনই কথা যে কানে গেল নন্দর। কানের ভিতর দিয়ে বুকে গিয়ে বিঁধল। চোখ টান করে স্বাহার দিকে তাকালো সে। মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে বুকের দিকেই চোখ পড়ল আগে। গলার হারটা বুকের ওপর জ্বলছে। হারটা নয়, হারের নিচের হীরেটা বুকের ওপর জ্বলছে। তবু যেন হুর্বোধ্য লাগছে নন্দর। বিমূঢ় মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি উচিত কাজ করেছি ! কি উচিত কাজ ?

হারের হীরেটা হাতে করে বার-কতক নাড়াচাড়া করল স্বাহা, তারপর বলল, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক আসল চোরকেই ধরিয়ে দিয়েছিলে তুমি, তার জন্যে তোমার নরক হতে যাবে কেন···।

অন্তিম রোগ-যাতনা ভুলে নন্দ চেতনাহত বিস্ময়ে তার দিকে চেয়েছিল খানিক। তারপরে হীরেটা দেখেছিল। তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল, হালদার গিন্নীর হার তুই নিয়েছিলি !

অভিমানাহত কণ্ঠে স্বাহা জবাব দিয়েছে, পুরনো কথা নিয়ে আবার দুঃখু দিচ্ছ কেন, তোমার যেন জানতে বাকি আছে কে নিয়েছিল।

আরো খানিকক্ষণ তেমনি চেয়ে থেকে নন্দ পাশ ফিরতে চেষ্টা করেছিল। পারেনি। নিজে পারেও না পাশ ফিরতে। ঘাড়টা, মাথাটা নিঃশব্দে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল শুধু। আর একটাও যাতনার শব্দ নির্গত হয়নি তার মুখ দিয়ে।

দু'দিন বাদে নন্দ চোখ বুজেছে, বরাবরকার মত। এর মধ্যে নরকের ভয়ে আর একবারও আর্তনাদ করেনি, একবার ত্রাসে শিউরে উঠেনি, একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। সেই যে মুখ বুজেছে, সেই মুখও আর খোলেনি। কিন্তু যে বোবা বিস্ময় আর বোবা বেদনা নিয়ে সে চোখ বুজেছে, তাও স্বাহা দেখেছে চেয়ে চেয়ে। এর থেকে ওই মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নরকের বিভীষিকাও অনেক বেশি বাঞ্ছিত ছিল যেন, অনেক বেশি সহনশীল ছিল। শেষ মুহূর্তেও জ্ঞান ছিল। স্বাহা জল দিতে গিয়েছিল মুখে। নন্দ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু তার চোখের স্থির তারায় নিষেধ ছিল। স্বাহা তবু দিয়েছিল। সে জল নেয়নি, সবটাই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

সেই সন্ধ্যায় আর আসর বসেনি। বাসনাই বাতিল করেছে সেদিনের আসর। দুপুরের দিকে নন্দর দেহ শ্মশানে পাঠাবার পরেও অনেক ধকল গেছে। মানসিক ধকলটাই বেশি। ঘর-দোর সব খুবলে পরিষ্কার করতে হয়েছে। যে-রোগী নিয়ে ক'টা দিন কাটালো ওই মুখপুড়ী ভাবতে গেলেও গা গুলোয়। তাছাড়া আখড়ার এলাকার মধ্যেই হতভাগা মরল যখন, সে-দিন আর গান হয় কি করে।

স্বাহা বাসনার নিষেধ ঠেলে শ্মশানে গিয়েছিল। গোয়ালফেলানীর শ্মশানে। চিতার আগুনে দেহ ছাই হতে দেখেছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলেবেলার একদিনের কথা মনে পড়েছিল তার। নন্দর হাত ধরে এখানে এসেছিল। সেদিনও চিতা জ্বলছিল একটা। সেই চিতা দেখে নন্দর লোভ হয়েছিল। এমনি চিতা জ্বেলে দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তাব করেছিল সে। স্বাহা জবাব দিয়েছিল, তুই আগে পড় ঝাঁপিয়ে, আমি দেখি—

আজ স্বাহা দেখছিল।

সন্ধ্যার পর দিদির ঘরে এলো। বাসনা সাদরে ডাকল, আয় আয়, বোস্—ক'টা দিন কি করেই না কাটালি, চোখ-মুখ কালি একেবারে। আপদ গেছে, আর ক'টা দিন বাঁচলে তোর মাথাটাই খারাপ হত।

স্বাহা হাসল। বলল, তাই হত বোধহয়। গলা থেকে হীরেবসানো হারটা খুলে ফেলল সে।—এই নে তোর হার। হারটা তার হাতে দিতে গিয়েও থমকালো একটু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই যেন প্রথম দেখল অলঙ্কারটা। উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা করল, হারটা তোকে কে দিলে রে দিদি?

বাসনা সত্য গোপন করল না। সহাস্যে বলল, হালদার বুড়ো দিয়েছে।

নাতনী নাতনী করে একেবারে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। স্বাহার মুখখানা দেখে নিল এক-নজর, তুই চাইলে তোকে এর থেকে অনেক ভালো জিনিস দেবে। বলব ?

স্বাহা হারটা তার কোলে ফেলে দিয়ে তেমনি হেসেই টিপ্পনী কাটল, থাক, কতবার আর তোর সতীন হব—

হাসতে হাসতেই নিজের ঘরে চলে এলো সে।

আবারও দিন যায় একটা ছুটো করে। স্বাহা আসরে যায়। হাসে। হেসে সকলের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করে। আসরে আগের মতই গান গায়। গেয়ে নিজেকে আড়াল করে। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যে আগের মতই বুড়ো সূর্য হালদারের উদ্দেশে গানের ডালি উবুড় করে দেয় সে :

কলঙ্কী বলে ডাকে সবে
তাতে দুঃখ নাই গো।
তোমার লাগি কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ গো।

সকলে হাসে। বাসনা হাসে। এমন কি বাসনার নতুন মানুষও হাসে। সূর্য হালদার হাসেন। তরুণ প্রৌঢ় সবাই হাসে।

স্বাহাও হাসে।

কিন্তু নিজের ঘরে একা থাকে যতক্ষণ, একটা নিঃসীম স্তব্ধতা যেন গ্রাস করে ফেলে ওকে। পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে। ভাবে কি। চোখের সামনে আসরের কামনাতুর মুখগুলি একে একে ভেসে ওঠে। সেদিন ঘরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, চৌদ্দ পনের বছরের একটা ছেলেকে তার বুড়ী দিদিমা না ঠাকুমা কব্জি হাতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে—আর অশ্রাব্য গালাগাল করছে তাদের উদ্দেশে। ঘরে ঘরে এমনি কত মা আর কত ঠাকুমা চোখের জল ফেলছে আর শাপমণ্যি করছে আর ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়ছে কে জানে। এখানে যত লোক আসে তাদের সকলের ঘরের কান্না স্বাহার কানের পরদায় অষ্টপ্রহর লেগেই আছে যেন।···আসরে বসেও দিদির অসহিষ্ণু বিরক্তি লক্ষ্য করেছিল সেদিন। কারণও জেনেছিল। কমলার মেয়েটা ঘরে জ্বরের ঘোরে ধুঁকছিল আর কেঁদে কেঁদে উঠছিল। বার বার উঠে বাসনাকে দেখে আসতে হচ্ছিল, জল বাতাস করে আসতে হচ্ছিল, বিরক্ত সেই কারণে। কমলা কি সেই জন্যে আসরে অনুপস্থিত নাকি ! না। মোটা বায়না নিয়ে কোনো রসিক-জনের গানের মজলিশে পাঠানো হয়েছে তাকে। মেয়ে মরুক বাঁচুক সকালের আগে তার ফেরা হবে না।

ওই মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার আর বড় করে তোলার আগ্রহ আছে দিদির আর

বলাই দাসের। মেয়ে বড় হলে মায়ের জায়গা নেবে। মায়ের থেকে অনেক বড় জায়গা। আজকের শিশুরা আর অনাগত শিশুরা পাপের আবর্তে মাথা খুঁড়তে খেয়ে আসবে। হঠাৎই দিদি আর বলাই দাসের ওপর রাগে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল স্বাহা। বলাই দাস সেই শাস্তি এরই মধ্যে ভুলে গেল! কিন্তু সেই রাগের ওপর চেতনার চাবুক পড়তেও সময় লাগেনি। বলাই দাসকে সে শাস্তি দিতে পেরেছিল কোন্ জোরে? নিজেরই ভিতর থেকে কে বুঝি ব্যঙ্গ করছে তাকে। কোন্ জোরে? চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে স্বাহা, কোন্ জোরে—কাদের জোরে। প্রত্যাশার নগ্ন উল্লাসে, ধকধক ধকধক করছে সারি সারি আদিম কামনাতুরের জলন্ত হৃৎপিণ্ড—নির্মম, নৃশংস, মাংসলোলুপ।

এই জায়গাটাকে চুনিগাঁয়ের লোকেরা এখন কি বলে? আর পাঁচ গাঁয়ের লোকেরা কি বলে? পরাণ চাটুজ্জের ভিটে বলে? পরাণ চাটুজ্জের আখড়া বলে? কি বলে?

স্বাহা কি পাগল হয়ে যাবে? চুনিগাঁয়ের গোটা আকাশটাই ছাল-চামড়া ওঠা একটা কুৎসিত ঘায়ের মত দগদগিয়ে ওঠে স্বাহার চোখের সামনে। চুনিগাঁয়ে সেদিন মানুষ থাকবে না। মানুষ পালাবে। যারা থাকবে, তারা প্রথম চোখ মেলেই পাপ দেখবে, পাপ চিনবে, চোখের তারায় তাদের পাপের নেশা জাগবে আর শিরায় শিরায় পাপ নাচবে। মজা সরস্বতীর ধার ধরে, পরাণ চাটুজ্জের ভিটে ছাড়িয়ে অনেক—অনেকদূর পর্যন্ত সেই পাপের বাসা ছড়াবে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে গোটা চুনিগাঁ গ্রাস করবে। সমস্ত গ্রামটাই তখন পরাণ চাটুজ্জের ভিটে হয়ে যাবে। কালের জরাতেও চুনিগাঁয়ের ঘায়ের দাগ ঘুচবে না।

অহর্নিশ মাথার মধ্যে আগুন জলছে স্বাহার। চোখের জ্যোতি বাড়ছে। কানের কাছে অবিরাম ফিসফিসানি কার।—আর কেন, প্রতীক্ষার তো শেষ হয়েছে। আর তো কেউ আসবে না। এখনো বসে বসে দিন গোনা কেন?

স্বাহার মাথার মধ্যে আগুন জলে, কানের পরদায় তপ্ত লোহার শলা বেঁধে, বুকের ভেতরটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে। নন্দর বোবা যাতনাভরা বিদায়ী মুখটা বার বার সামনে আসতে চায়। স্বাহা চেষ্টা করে ভুলতে, সব কিছু ভুলতে—সামনের এই নতুন নতুন ঘরগুলো, চাতাল···সব চোখের সমুখ থেকে মুছে দিতে। কিন্তু পেরে ওঠে না, কিছুতে চারপাশের এই নগ্ন কঙ্কালের জঠর থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে পারে না সে।

সেদিন পারল। শাস্তি। রাত তখন গভীর। অমাবস্যার আঁধার তার চোখের সমুখের সব অস্তিত্ব গ্রাস করেছিল। ঘরের মধ্যেও অন্ধকার। স্বাহা স্থাণুর মত মেঝেতে বসে। সেই দিন পারল। তার চোখের সামনে থেকে ওই চাতাল মুছে গেল, অতগুলো ঘরও নেই আর। একটা ছুটো ঘর। এই ঘরের এই নিভৃতি নিস্তব্ধতায়

কারা যেন এসেছে। এসে বসেছে। অনেকদিনের হারানো এক মেয়ে, তার নাম স্বাহা। সে আছে এখানে। আর তার দিদি আছে, তার নাম বাসনা। দিদি তাকে ভালবাসে, আদর করে আবার গুমগুম কিলও বসায় পিঠে। আর কাদের দেখছে? তার বাবা, চারু বোষ্টুমী, বিনয়কেষ্ট।···আর অজ্ঞান বয়সে হারানো তার সেই মা-ও।··· আর নন্দ।

সেই নন্দ। এই মুখ নয়, সেই মুখ—মিষ্টি কচি দুষ্টুমি ভরা। পিছনের জঙ্গলে গাছের মগডালে থোকা থোকা জামরুল পেকেছে—আর ভাব না করে পারা যায় কেমন করে?

···যাক, বাঁচা গেল। উঠোনে সে-ই বাখারি পুঁতেছে, সেধে ভাব করতে হবে না ···হাত ধরাধরি করে দুজনে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছে তারা, সরস্বতীর চড়ায় ঝাঁপাঝাঁপি করছে।···এ আবার কোন্ জায়গা? গোয়ালফেলানীর শ্মশান—স্বাহাই ধরে নিয়ে এসেছে নন্দকে। নন্দটা হাড় বজ্জাত, হাতের মধ্যে হাতটা চেপে আছে দেখ! স্বাহা যেন এখনো বুঝতে শেখেনি কিছু।···চিতা জ্বলছে একটা। স্বাহার ভালো লাগছে না দেখতে। তবু না দেখে পারছে না।

—স্বাহা মরবি? আগুন জেলে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা। আসবি?

অভিমানে অন্ধকারে মুখ ঘুরিয়ে নিল স্বাহা। মুরোদ কত বোঝা গেছে। আগুন জেলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিনা দেখছ না? আমাকে ঠেলে দিয়ে নিজে দিব্বি পালালে।

অন্ধকারের মধ্যে স্বাহার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আবার। নন্দর মিষ্টি কচি মুখে ও কিসের ছাপ পড়ছে? কিসের ছায়া পড়ছে? একটুও ভালো না, একটুও সুন্দর না। তারপর আরো কুৎসিত, আরো কদর্য। নিষ্ঠুর, লালসা-ভরা—এই চাতালে যারা আসছে যাচ্ছে, আর আঙিনার ওধারে ঘুর ঘুর করছে —ঠিক তাদের মত।···কিন্তু না, সব শেষে আবার সুন্দর হয়েছিল। শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার পরে নন্দর মুখখানা আবার সুন্দর হয়েছিল।

মাথায় আর আগুন জ্বলছে না স্বাহার। সব ঠাণ্ডা, সব শান্তি। আর কোনো খেদ নেই, কোনো তাপ নেই। স্বাহার ভালো লাগছে, ঘুমের মত লাগছে।

ভোর হল। দিন গড়ালো। বিকেল গেল। সন্ধ্যা এলো। আসর বসল। স্বাহা গান গাইল। কিন্তু তবু সব ঠাণ্ডা, সব শান্তি। আর জ্বালা নেই তার যাতনা নেই। এমন কি, কোন্ যাদুতে চাতালের এই রসিক-জনদেরও সকলকে সুন্দর দেখছে সে। ভারী সুন্দর। চুনিগাঁয়ের আকাশ থেকেও সেই ঘায়ের বিভীষিকার দাগ মুছে গেছে।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত।

এই রাতটার সঙ্গে পরাণ চাটুজ্জের ভিটের নাড়ির যোগ যেন। এই রাতে নন্দিনীকে ঘরে আনার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেছিল পরাণ চাটুজ্জে। এই রাতে শেষ প্রতিশোধ নিয়ে নন্দিনী ভিটে ছেড়ে গিয়েছিল। আবারও সেই রাত। চাঁদ যেন অফুরন্ত জ্যোৎস্না উবুড় করে ঢালছে। পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

মেলা বসেছে ওলাইচণ্ডীর মাঠ ঘিরে। সেই মেলাই বটে। কিন্তু তার থেকে অনেক, অনেক বড়। জাঁক-জমক আড়ম্বর অনেক বেশি। বিকি-কিনি অনেক বেশি। হৈ-চৈ ফুর্তিও অনেক বেশি। মেলার পরে এখন আবার নাটক হয় তিন রাত ধরে। রাত ভোর। তার জন্যে স্টেজ বাঁধা হয়, সিন-সিনারি ভাড়া করা হয়—নাটকের মহড়া শুরু হয়ে যায় দুমাস আগে থেকে।

গাঁয়ের আর অন্য আরো পাঁচ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ ভেঙ্গে পড়ে সেই নাটক দেখতে। কোজাগরী রাতে আলো জ্বালাতে হয়, আলো জ্বেলে জেগে থাকতে হয়। লক্ষ্মী বর দেন তাদের।

জেগেই থাকে গাঁয়ের লোক। আলো আর কি জ্বালবে, আকাশ থেকেই আলোর বন্যা নামে। আর, মেলায় এলেও আলোয় আলোয় একাকার। রাত জেগে পাশা খেলার কথা, তার বদলে তারা নাটক দেখে।

পরাণ চাটুজ্জের ভিটের মেয়েরাও সব দল বেঁধে নাটক দেখতে গেছে। তাদের সঙ্গে বাসনাও গেছে। বলাই দাস চলনদার।

যায়নি শুধু স্বাহা।

তার শরীরটা ভালো নয় বলেই যায়নি। কিন্তু হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছে বাসনাকে, সে-ও আলো জ্বালবে, রাত জাগবে, পুণ্যি করবে। সেই পুণ্যিতে ভিটের পুণ্যি। তারা সব গেলই বা নাটক দেখতে।

মেয়ের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ ওই রকমই হয়েছে ক'দিন ধরে। সব কথা বোঝা ভার। তাকে সাবধানে থাকতে বলে বাসনা নাটক দেখতে গেছে সকলকে নিয়ে।

স্বাহা বসে আছে চুপচাপ।

সে আলো জ্বালবে, রাত জাগবে, পুণ্যি করবে।

লক্ষ্মী এসে বলবেন, এই রাতে কে জেগে গো, তাকে বর দেব আমি।

"নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীভাষিণী—তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।"

লক্ষ্মী এসে বলবেন, আজকের এই রাতে কে জেগে আছে আর পাশা খেলছে—তাকে আমি বিত্ত দান করব।

স্বাহা জেগে আছে। জীবনের ছকে পাশার দান তো ফেলেই রেখেছে—এমন মর্মান্তিক খেলা কেউ কখনো খেলেছে? বিত্ত মিলবে না?

রাত এক প্রহর। পিছনের জঙ্গলে শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে স্বাহাও উঠল। ধীর স্থির শান্ত।

আলো জ্বালবে, রাত জাগবে, পুণ্যি করবে।

সেই পুণ্যিতে এই অভিশপ্ত ভিটের পুণ্যি।

পুবের আকাশ লালে লাল। দগদগে লাল। সেই লাল যেন মেলার সব আলো আর সব জ্যোৎস্নাটুকুও চেটেপুটে খাবার জন্য ছড়িয়ে ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

নাট্য-রসে বিভোর জনতা অন্যমনস্কের মত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রথম। হঠাৎই স্তব্ধ বিমূঢ় সকলে।

তাঁবুর পিছনের দিকে সোরগোল একটা।

তারপর বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা। মেয়ে পুরুষ সকলে। যারা অভিনয় করছিল আর যারা দেখছিল—সকলে।

ও কিসের লাল? এত লাল কেন?

লক্ষ্মী বর দিতে এলেন? বিত্ত দিতে এলেন?

আগুন! আগুন!

মা-গো! আকাশটাই যে পুড়ে গেল!

কোথায় আগুন? কোন্ দিকে?

সরস্বতীর দিকে।

দিশেহারা জনতা দিশেহারার মতই ছুটে চলল মজা সরস্বতীর দিকে।

কোথায় আগুন? কার ঘরে আগুন?

ওগো কোথায় আগুন গো?

পরাণ চাটুজ্জের ভিটেয় আগুন! গোটা আখড়ায় আগুন!

ভিটের কাছাকাছি এগোতে পারল না কেউ। সমস্ত ভিটের সব'কটা ঘর আর চাতাল জ্বলছে দাউ দাউ করে।

জনতা দেখছে। তাদের আর কিছু করার নেই।

ভিটের পিছনে তারস্বরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল।—স্বাহা! স্বাহা কোথায়?

ওগো স্বাহাকে তোমরা এনে দাও কেউ, আগুন লাগিয়ে হতভাগী যে জীবন্ত পুড়ে মরছে!

কার আর্তনাদ কার গলা ঠিক বোঝা গেল না। এবারও জনতার করার কিছু নেই। শুধু শুনল। আর বুঝল। শুধু ভিটে জ্বলছে না, শুধু ঘর পুড়ছে না, ওই আগুনে অগ্নি-সদৃশা একটা মেয়েও মুখ বুজে নিঃশব্দে আত্মাহুতি দিচ্ছে।

* * *

জিজ্ঞাসা করলে স্থানীয় বুড়োরা বলবে, উটি সতীনাশার থান বাবুমশায়রা।

